৫ × ৫ = পঁচিশ

মনোজ সেন



৫×৫=পঁচিশ

পাঁচমিশেলি সাহিত্য সংকলন

মনোজ সেন





5 x 5=25

Punch Mishali Galpo Sankalan

Written by

Manoj Sen

পেজ লে-আউট : প্রদীপ গরাই

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৮

পরিমার্জিত দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৮

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

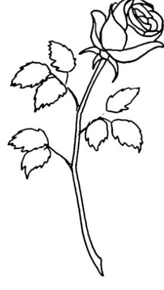
অলংকরণ : দিলীপ দাস

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক

৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত

চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯



আমার অতি আদরের নাতনি

ইশিকা সেন মুখার্জীকে

স্নেহাশীর্বাদ

দাদু

কৃতজ্ঞতা

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, সোনাল দাস,
সুমিত সেনগুপ্ত, দিলীপ দাস, নির্মলেন্দু মণ্ডল,
নিরুপম মজুমদার, সোহম ঘোষ (টিম 'ক্যামেরা জি')

সূচিপত্র

একটি প্রজাপতির অকালমৃত্যু

ডাক্তার গুপ্তের বরাত

আমার কথা

প্রথমেই এই বইটির নামকরণ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এখানে যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলিকে বিষয় অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রচ্ছদে সেই পাঁচটি বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে। এই নামগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে বিভাগগুলির বিষয় এতই পরস্পর সম্পর্কহীন যে তাদের একটি নামের আচ্ছাদনের তলায় আনা প্রায় অসম্ভব। কষ্টেসৃষ্টে ভিরভ্রিংগট্ট জাতীয় একটি নাম হয়তো দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু তার অর্থ কতজনের বোধগম্য হত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই, যতটা সম্ভব সরল ভাষায় এই নামকরণ করা হল যাতে গোড়াতেই এই বইয়ের চরিত্রটি অন্তত পাঠকের সামনে তুলে ধরা যায়।

এখন প্রশ্ন হল, কোন পাঠকদের কথা ভেবে এই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল? কচিকাঁচারা অবশ্যই নয়। বরং বলব, যারা কৈশোরের কিশলয় আর নেই অথচ যৌবনের শ্যামল গৌরবে এখনও পর্ণে পরিণত হয়নি, যাদের বড়োদের আড্ডায় ঢোকবার অধিকার নেই, পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলা আর ভালো দেখায় না, তারাই প্রধানত এই সংকলনের বাঞ্ছিত পাঠক-পাঠিকা। আরও আছে। যাঁরা সারাদিন ধরে নানারকম গুরুতর দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্যসিদ্ধান্ত নেবার ফাঁকে হাতের কাছে পেলে চট করে শিবরাম চক্রবর্তী বা সুকুমার কিংবা তারাপদ রায়ে চোখ বুলিয়ে নেন, হাঁদা-ভোঁদা পেলে পাতা না উলটিয়ে পারেন না, তাঁরাও আছেন। এঁদের অবশ্য কোনো বয়সের সীমায় বাঁধা যায় না।

কথা উঠতে পারে যে বইটি লেখা হল কেন বা এটা না লেখা হলে কার কী ক্ষতিবৃদ্ধি হত। ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম।

পাঁচ দশক ধরে, যাকে প্রান্তিক সাহিত্য বলা হয়, সেই রীতি বা পদ্ধতি অনুযায়ী 'রোমাঞ্চ', 'নবকল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকায় নানারকম গল্প বা রচনা লেখার পর আমার মনে হল যে তাদের একটি সংকলন প্রকাশ করা দরকার। তাহলে অন্তত আমার উত্তরসূরিদের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী কিছু একটা রেখে যেতে পারব। সেই আশায়, ২০০৮ সালে আমি নিজে দশটি গল্পের একটি বই প্রকাশ করেছিলুম। নাম ছিল *কালরাত্রি*। কিছুদিন বাদে সেই বইয়ের পরিবেশকদের কাছে জানা গেল যে তার একটি কপিও বিক্রি হয়নি। এই খবর শুনে আমি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলুম। আমার মনে হয়েছিল যে আমার লেখার কোনো ক্ষমতাই নেই। তাই, বই প্রকাশের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে, লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।

এর কিছুদিন পরে আমার কাছে এলেন শ্রীমান সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক। তিনি আমার কাছে লেখা চাইলেন। তাঁর কাছে জানা গেল যে তিনি ছাড়াও আরও কোনো কোনো পাঠক আমার লেখা পড়েছেন এবং পড়তে চান। আমার কাছে তখন কিছু অপ্রকাশিত লেখা ছিল, আমি সেগুলি তাঁকে দিয়ে দিলুম। সুমন্ত সেই লেখাগুলি কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। নতুন করে আবার আমার লেখনী সচল করতে হল।

এই সময় হঠাৎ আমার কাছে এলেন 'বুক ফার্ম'-এর কর্ণধার শ্রীশান্তনু ঘোষ। তিনি আমার সমস্ত লেখা বই আকারে প্রকাশ করবার প্রস্তাব দিলেন। আমি তো স্তম্ভিত। প্রথমে না বলেছিলুম। কিন্তু শান্তনু আমার কোনো কথাই শুনতে রাজি তো হলেনই না বরং

আমার সমস্ত শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। আমার ওপর এমন আস্থা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।

আমার সন্দেহ হয়েছিল যে একটি ছোটো, প্রায় সদ্যোজাত প্রকাশনা সংস্থা আমার মতো একজন স্বল্পপরিচিত লেখকের বই প্রকাশ করতে পারবে কি না। শান্তনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা কথা বোঝা গেল যে 'বুক ফার্ম'-এর নানা রকমের পরীক্ষানিরীক্ষায় কোনো আপত্তি তো নেইই, বরং উৎসাহই আছে। এদের কাজের আধুনিকতা, পদ্ধতি, সময়জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, সাহস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা অন্যান্য প্রকাশকদের থেকে অনেকটাই আলাদা। সবচেয়ে বড়ো কথা এরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছপা হয় না। কোথাও হয়তো ভুল করে, কিন্তু অগাধজলে ঝাঁপ দিয়ে কূল খুঁজে পাওয়ার প্রত্যয় এদের আছে। আজ মনে হচ্ছে, এদের ওপরে আস্থা রেখে আমি কিছুমাত্র ভুল করিনি। এতদিন বাদে 'বুক ফার্ম' আমার অন্তরের ইচ্ছা সফল করতে যাচ্ছে। আমি এদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

এই প্রসঙ্গে একজনের কথা এখানে বলা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি এই বইয়ের চিত্রকর শিল্পী শ্রীদিলীপ দাস। তিনি যে অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন তার প্রমাণ এই বইয়ের প্রত্যেক গল্পেই আছে। যা অন্তরালে রয়ে গেল, তা তাঁর বাঙালির মধ্যে দুর্লভ কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়জ্ঞান ও ভদ্র নম্র শান্ত ব্যবহার। আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এই বইটি আমি আমার নাতনিকে উৎসর্গ করেছি। তার কারণ তার ছেলেবেলায় দাদুর কাছে নিত্যনতুন গল্প শোনার নিরন্তর দাবি আমাকে ছোটোদের গল্প লেখায় উৎসাহিত করেছিল। আজ সে অনেক বড়ো হয়ে গেছে, বহুদিন বিদেশে প্রবাসী, অনভ্যাসে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছে। কিন্তু আমি জানি সে তার দাদুর লেখা পড়বার জন্য একদিন অবসর সময়ে বাংলা শিখে নেবে এবং আমার সঙ্গে আমার লেখা নিয়ে আলোচনা করবে, তর্ক করবে। অবশ্য, যদি তখনও আমার পায়ের চিহ্ন এই বাটে পড়ে।

মনোজ সেন



সীতা

সে অনেকদিন আগেকার কথা। শম্পা নদীর ধারে আনন্দনগর বলে একটা রাজ্য ছিল। সে একটা ভারি সুন্দর দেশ। আনন্দনগরের দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত ধান খেত, পশ্চিমে শম্পা নদী আর উত্তর ও পূর্বদিক ঘিরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা শ্রাবণী পর্বতমালা। সেখানে তখন প্রতাপ সিংহ রাজত্ব করতেন। তিনি খুব ভালো রাজা ছিলেন, তাঁকে সবাই ভক্তি করত, ভালোবাসত।

সেই রাজ্যে সীতা বলে একটি মেয়ে থাকত। তার বাবা-মা দিনমজুর, তাঁরা শহরে কাজ করতেন আর ছুটি পেলে বাড়িতে আসতেন। সীতা থাকত তার বুড়ি পিসিমার সঙ্গে জঙ্গলের ভেতরে শম্পার ধারে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরে। সকাল বেলা সে তার পিসির কাছে পড়াশুনো করত, আর বাকি দিনটা পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। সেখানকার যত পশুপাখি তার বন্ধু ছিল। সে নির্ভয়ে তাদের সঙ্গে খেলে বেড়াত।

সেদিন বিকেল বেলা দিনের পড়ন্ত আলোয় সীতা নদীর ধারে একটা পাথরের ওপরে বসে মালা গাঁথছিল আর গোটা ছয়েক টুনটুনি পাখি এধার-ওধার থেকে ফুল তুলে এনে ওর কোলের ওপর ফেলছিল। হঠাৎ ঝোপঝাড় ভেঙে একটা বাঘ হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর, হাঁপাতে হাঁপাতে হাউমাউ করে করুণভাবে কী যেন বলল ওকে।

সীতা নীচু হয়ে বাঘের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কোনো ভয় নেই তোমার, আমি থাকতে কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। তুমি এখানে চুপ করে বসে থাকো তো। বলে মুখ তুলে দেখল একটা গাছের নীচে তির-ধনুক হাতে একজন সদ্য গোঁফ গজানো ভারি সুদর্শন ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্বাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

সীতার চোখে চোখ পড়তেই ছেলেটি বলল— করছ কী তুমি? ওটা একটা বাঘ!

সীতা বলল— আমি জানি এটা একটা বাঘ। তুমি কে? তুমি এখানে কী করছ?

ছেলেটি কিছু বলবার আগেই বাঘটা গুরগুর করে কী যেন বলল। শুনে সীতা চোখ পাকিয়ে বলল— তুমি একে মারতে যাচ্ছিলে, না? কেন?

ছেলেটি আরও আশ্চর্য হয়ে বলল— কেন আবার কী? বাঘ মারব না?

—কেন মারবে? আমি তো সে কথাই জানতে চাইছি। ও তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি।

—না, তা করেনি। তবে, করতে তো পারে। সেইজন্যে বাঘ মারতে হয়, বুঝলে? তা ছাড়া, বাঘ মারতে না পারলে মৃগয়ায় খ্যাতি হবে কী করে?

—সে তো অনেক মানুষও তোমার ক্ষতি করতে পারে। যাও-না, তাদের মারো-না গিয়ে। স্রেফ নাম করার জন্য একটা জীবন্ত প্রাণীকে মেরে ফেলতে হবে? তার কথা, তার বাবা-মার কথা একবারও ভাববার দরকার নেই?

মাথা চুলকে ছেলেটি বলল— তা তো জানি না। তবে এমনই তো হয়।

—এ কখনো হতে পারে না। তুমি যাও-তো, বাড়ি যাও। এখানে এরকম খুনোখুনি করলে আমি কিন্তু মহারাজা প্রতাপ সিংহকে বলে দেব।

ছেলেটি যেন খুব ভয় পেয়েছে এমনিভাবে বলল— সর্বনাশ! তুমি মহারাজা প্রতাপ সিংহকে চেন না কি?

—না, চিনি না। তবে শুনেছি তিনি খুব ভালো লোক আর অন্যায়-অবিচারকে কক্ষনো প্রশ্রয় দেন না। কাজেই ভালো চাও তো এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে যাও।

ছেলেটি করুণ মুখে বলল— যাব-তো, কিন্তু আমি যে বাঘটাকে তাড়া করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আমাকে এই জঙ্গল থেকে বেরুবার রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে?

মাথা নেড়ে সীতা বলল— আমি এখন যেতে পারব না। এই লবাই তোমাকে নিয়ে যাবে। বলে বাঘটাকে দেখিয়ে দিল।

—এর নাম লবাই? তোমার পোষা বুঝি?

—পোষা আবার কী? ও আমার বন্ধু।

—পোষা নয়, সর্বনাশ! বুনো বাঘ, মাঝপথে ও যদি আমাকে খেয়ে ফেলে?

—খামোখা ও তোমাকে খেতে যাবে কেন? ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো যাও, কিচ্ছু হবে না। যদি ওর কোনোরকম ক্ষতি করতে চেষ্টা করো, তাহলে কিন্তু কী হবে তা আমি জানি না।

—ওরে বাবা! আর কি কেউ নেই যে আমাকে রাস্তা দেখাতে পারে?

বাঘটা গরগর করে শব্দ করল। সীতা বলল— ঠিক আছে। তুমি যাও, ডেকে নিয়ে এস। বলামাত্র বাঘটা উঠে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল।

ছেলেটি কপালের ঘাম মুছে ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। বলল— তোমার বন্ধু কাকে ডাকতে গেল?

সীতা মালা গাঁথতে গাঁথতে হাসতে হাসতে বলল— তোমাকে যে পথ দেখাবে অথচ খেয়ে ফেলবে না, তাকে। লবাই বুঝতে পেরেছে যে তুমি ওকে ভয় পাচ্ছ।

—বলো কী? তুমি বাঘের ভাষা বুঝতে পারো? কী করে?

—বাঃ, জন্ম থেকে এদের মধ্যে আছি আর এদের কথা বুঝতে পারব না? শুধু বাঘ কেন, আমি সব পশুপাখিরই ভাষা বুঝতে পারি। যদি না বুঝতুম তাহলে এরা কী আর আমার সঙ্গে খেলতে বা সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে রাজি হত?

বলতে না-বলতেই ধুপধাপ করতে করতে গাছের ডালাপালা সরিয়ে একটা বিশাল দাঁতাল হাতি এসে সীতার পাশে দাঁড়াল। সীতা বলল— দমদম, এ পথ হারিয়ে ফেলেছে। যাও তো, ওকে বনের বাইরে রেখে এস।

দমদম চোখের নিমেষে বিস্ময়বিমূঢ় ছেলেটিকে শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে নিল পিঠের ওপরে, তার তির-ধনুক পড়ে রইল মাটিতে। তারপর শম্পার ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ছেলেটির সন্ত্রস্ত হতচকিত মুখভঙ্গি দেখে সীতা হাসতে হাসতে পড়েই যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল— আমার নাম সীতা। তোমার নাম কী?

করুণ কণ্ঠে উত্তর এল, আমার নাম বিক্রম। তারপরেই দমদম গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল।

একটা দাঁড়কাক গাছের ডালে বসে ব্যাপারটা দেখছিল। সে এবার ঝুপ করে নেমে এসে সীতার সামনে ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সীতা তাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করে বলল— কী রে মসুরি, কিছু বলবি?

মসুরি খানিক ইতস্তত করে বলল— হ্যাঁ, বলার তো ছিল। কিন্তু সেটা উচিত হবে কি না ভাবছি।

—বেশ। ভাবা শেষ হলে তখন বলিস।

—মানে, কী জানিস? মানুষদের ব্যাপারে আমরা তো কখনো নাক গলাই না, সেটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। তাই ভাবছিলুম কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে কি না। আচ্ছা, এই যে ছেলেটি এখানে এসেছিল তাকে তুই চিনিস?

—না তো। কী করে চিনব? নাম তো বলে গেল বিক্রম।

—হ্যাঁ, মহারাজা প্রতাপ সিংহের ছেলে, আনন্দনগরের যুবরাজ।

—তা হতে পারে। একদম ক্যাবলা।

মোটেই না। দেখতে ছেলেমানুষ হলে কী হবে, ভীষণ বীর। ওর বীরত্বের কথা সবার মুখে মুখে ফেরে। ভয়ডর নেই। ইচ্ছে করে তোর সামনে ক্যাবলামি করছিল। বুঝিস না, প্রচণ্ড দুঃসাহসী না-হলে কেউ পায়ে হেঁটে বাঘের পেছনে তাড়া করে? ওর তোকে খুব ভালো লেগেছে। ওর কিন্তু ভীষণ বিপদ।

—বিপদ? কীসের বিপদ?

—আমরা শহরের কাকেদের কাছে খবর পেয়েছি যে ওর মামা, যাকে প্রতাপ সিংহ আশ্রয় দিয়েছিলেন, মহারাজাকে মেরে আর বিক্রম সিংহকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজে রাজা হয়ে বসবার ষড়যন্ত্র করছে। এর জন্যে সে গুপ্তঘাতক নিয়োগ করবারও ব্যবস্থা প্রায় ঠিক করে ফেলেছে। এরকম নীচতা আর অন্নদাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কেবল মানুষের মধ্যেই দেখা যায় রে, আর কোথাও নয়।

সীতা চোখ পাকিয়ে বলল— চুপ কর। সব মানুষই এরকম নয়, বুঝলি? কিন্তু, এ তো ভালো কথা নয়। এসব তো বন্ধ করা দরকার। তবে, এত দূর থেকে আমরা করবই-বা কী? এবার বোধ হয় আমার ভাবার পালা। কিংবা আমাদের দু-জনের।

—আমি অত ভাবতে-টাবতে পারিনে। এক কাজ করি। সড়সড়িকে ডেকে আনি? সে-ই এই সমস্ত বনের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

সীতা বলল— হ্যাঁ, সেই ভালো। যা, ডেকে আন। কাছেই কোথাও আছে। তাড়াতাড়ি যাবি। সন্ধে হয়ে আসছে, মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে বলে মসুরি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। ফিরে এল একটু বাদেই। তার পেছনে পেছনে এল একটা বুড়ো শকুন। বিরাট ডানা গুটিয়ে সে যখন আকাশ থেকে নেমে সীতার পাশে বসল, তাকে দেখাল ঠিক একটা টাকমাথা কালো চাদরমুড়ি দেওয়া বৃদ্ধের মতো।

সড়সড়ি থেমে থেমে বলল— মসুরি আমাকে সবকথা বলেছে। প্রতাপ সিংহকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে তোমাকে এই ষড়যন্ত্রের কথা তাঁকে জানাতে হবে। কিন্তু ষড়যন্ত্র হচ্ছে, শুধু এইটুকু জানালেই তো চলবে না। রাজা তাঁর শালাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, বিশ্বাস করেন। তাঁকে অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে। নইলে তিনি তোমার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না।

মসুরি বলল— অকাট্য প্রমাণ পাব কী করে?

—শহরের সব কাক আর প্যাঁচাদের বলে দে, যেন তারা রাজশ্যালক বিরুপাক্ষের ওপর দিনরাত নজর রাখে। সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে কথা বলছে, কী কথা বলছে, সব খবর আমার চাই। রোজকার রোজ খবর আনবি। তারপরে কী করতে হবে, আমি বলে দেব।

কিছুদিন পরেকার কথা। সকাল বেলা মহারাজা প্রতাপ সিংহ বসেছেন রাজসভায়। পাশে যুবরাজ বিক্রম। চারদিকে পাত্র-মিত্র, সেপাই-সান্ত্রী আর প্রজাদের ভিড়। রাজকার্য চলছে। মহামন্ত্রী কী যেন বলছিলেন, হঠাৎ একটা পায়রা সভাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকে ফটফট করে উড়ে এসে রাজার সিংহাসনের হাতলের ওপর বসল। তার মুখে একটা তালপাতা। সেটা রাজার কোলের ওপর ফেলে দিয়েই সে উড়ে গিয়ে ঘুলঘুলির ওপরে বসল, কিন্তু বেরিয়ে গেল না।

রাজামশাই বিরক্ত হয়ে পাতাটা ফেলে দিতে গিয়ে দেখেন তার ওপরে ভুসোকালি দিয়ে কী যেন লেখা রয়েছে। সেটা পড়তে পড়তে তাঁর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। তিনি পাতাটা বিক্রমের হাতে দিয়ে বললেন— পড়ে দ্যাখো। পরে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

বলে মুখ তুলে পায়রাটার দিকে তাকাতেই সে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে উড়ে চলে গেল, যেন পাতাটা রাজা পড়লেন কিনা সেটুকু দেখবার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

মহামন্ত্রী ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। বললেন— কী ওটা?

প্রতাপ সিংহ বললেন— ও কিছু নয়। কোত্থেকে কী তুলে এনেছে পায়রাটা। আপনি যা বলছিলেন, বলুন।

সেদিন রাজসভা শেষ হলে প্রতাপ সিংহ ছেলেকে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকলেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেখানে আর কারুর ঢোকবার অধিকার নেই। বললেন— চিঠিটা পড়লে? আগামীকাল আমাকে প্রাতর্ভ্রমণ করতে বারণ করা হয়েছে কারণ উদ্যানে নাকি চারজন গুপ্তঘাতক থাকবে আমাকে হত্যা করবার জন্য। তারা আবার নাকি বিরুপাক্ষের দলে। এ কখনো সম্ভব? সে আমার সবচেয়ে অনুগত বিশ্বাসভাজন লোক। আমি একসময় তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম। সে কখনো আমার পেছনে গুপ্তঘাতক লাগাতে পারে?

বিক্রম বলল— পারে। গুরুগৃহে থাকার সময় শুক্রনীতিসার আর অর্থশাস্ত্রে যেটুকু রাষ্ট্রনীতি পড়েছি তাতে তো মনে হয় সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকের পক্ষেই বিশ্বাসঘাতকতা করা কেবল সম্ভব নয়, স্বাভাবিক।

—শাস্ত্রে যাই লেখা থাক না কেন, মানুষের সততায় বিশ্বাস হারানো কোনো কাজের কথা নয়। আসলে, আমার মনে হয় কোনো শত্রু রাজ্য আমাদের পরিবারের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। হাতের লেখাটা অপরিণত। বোধ হয় কোনো বাচ্চাকে দিয়ে চিঠিটা লেখানো হয়েছে। লক্ষ করে দেখো, বিরূপাক্ষ যখন তীর্থযাত্রায় গেছেন, ঠিক তখনই এই চিঠি এসে উপস্থিত। যাহোক, আমি কাল রোজকার মতো প্রাতর্ভ্রমণে যাব। চারজন গুপ্তঘাতক যদি থাকেও, তাদের ব্যবস্থা আমি করতে পারব।

—তা যান, তবে সশস্ত্র হয়ে যাবেন।

—কক্ষনো না। এরকম একটা উড়ো চিঠির অবাস্তব বক্তব্য পড়ে আমি ভয়ের চোটে তলোয়ার বগলে প্রাতর্ভ্রমণে যাব, এ তো হতে পারে না।

পরের দিন রাজসভায় হুলুস্থুল। সবাই প্রতাপ সিংহের কুশল জিজ্ঞাসা করার জন্য ব্যস্ত। রাজা বললেন— আপনারা চিন্তা করবেন না। আজ খুব ভোরে যখন আমি বাগানে হাঁটতে গিয়েছিলুম তখন জনাচারেক উন্মাদ ব্যক্তি আমাকে আক্রমণ করেছিল। সৌভাগ্যবশত, যুবরাজ হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি, আহত অবস্থায় অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। কোটাল তাদের খুঁজতে গেছেন। তারা মুখ ঢেকে রেখেছিল তাই তাদের চেনা যায়নি। তবে অবিলম্বে ধরা পড়বে বলে মনে করি। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা দু-জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

সেদিনের মতো রাজকার্য চুলোয় গেল। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শুধু এই আলোচনাই চলল। বিকেল বেলা বিক্রম আবার একটা তালপাতায় লেখা চিঠি এনে রাজাকে দিল। বলল— পড়ে দেখুন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন— কোথায় পেলে?

—আমার শোবার ঘরে, বিছানার ওপর। মনে হচ্ছে আবার কোনো পায়রাই এনে ফেলেছে।

রাজা বিরক্তভাবে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। যখন শেষ করলেন তখন তাঁর মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়। বললেন— একী আশ্চর্য ব্যাপার! শ্রাবণী পাহাড়ের জঙ্গলে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দিরের ভগ্নাবশেষের কাছে গেলে ওই চারজন গুপ্তঘাতকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এর মানে কী? এখুনি কোটালকে সংবাদ দাও। সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওখানে যাক আর তাদের ধরে নিয়ে আসুক। অবশ্য যদি তারা সত্যি-সত্যিই ওখানে থাকে। আমি তো এর মধ্যে কেমন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি।

—মহারাজ, ষড়যন্ত্র আছে তো বটেই। তবে, আমার কেমন একটা অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে। কোটালকে পাঠাবেন না, তিনি কস্মিনকালেও শ্রাবণী পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে মহাদেব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাবেন না। তবে, আমি জানি সেটা কোথায়।

—আমিও মোটামুটি জানি ওই জায়গাটা কোথায়। ছেলেবেলায় শিকারে বেরিয়ে একবার ওখানে গিয়ে পড়েছিলুম। আজ অবশ্য খুঁজে পাব কি না সন্দেহ আছে।

—তবে চলুন, আমরা দু-জনে যাই। কাল সক্কালবেলা অশ্বারোহণে বেরোলে, দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাব। মহামন্ত্রীমশাই না-হয় একদিন রাজসভার কাজ একাই সামলাবেন।

—সে ঠিক আছে। কিন্তু ওখানে আমাদের শত্রুরা অপেক্ষায় থাকতে পারে।

—তা পারে। তবে আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয়, সেরকম কিছু হবে না। তবুও, আপনার যখন অন্যরকম মনে হচ্ছে তখন আমরা কোটাল আর তার সান্ত্রীদের নিয়ে যাব। তারা জঙ্গলের বাইরে অপেক্ষা করবে। আমরা দু-জন গভীর বনে ঢুকব। শম্পার ধারে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে চুপিসাড়ে মন্দিরের কাছে যাব। শত্রুরা যদি থাকে, আমাদের আচমকা আক্রমণ করতে পারবে না। উলটে, আমরাই তাদের চমকে দিতে পারব। যদি বিপদ গুরুতর হয়, তখন না-হয় কোটালকে খবর দেওয়া যাবে।

—উত্তম প্রস্তাব। তাই হবে। বেশ একটা উত্তেজনাপূর্ণ অভিযান হবে বটে। আর, যদি লোকগুলোকে ধরতে পারি, তাহলে ষড়যন্ত্রের নায়কটি যে কে, তা ওদের পেট থেকে টেনে বের করতে অসুবিধে হবে না।

নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরটা আগে থেকে জানা না থাকলে খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। ঘন জঙ্গলের ভেতরে একটা ছোট্ট খোলা জায়গা। সেখানে অতি প্রাচীন মন্দিরটার ধ্বংসাবশেষ নিঃসঙ্গভাবে যেন তার শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। মূল মন্দিরটাই শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার নাটমন্দির আর চারপাশের বারান্দা ভেঙে পড়ে গেছে। মন্দিরের দরজা-টরজা কিচ্ছু নেই, ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

প্রতাপ সিংহ আর বিক্রম নিঃশব্দে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চারদিক দেখে প্রতাপ ফিসফিস করে বললেন— খুব সাবধান বিক্রম, একটু আগেই এখানে একপাল হাতি এসেছিল। আমার মনে হচ্ছে যে তারা এখনও কাছাকাছিই আছে।

কথাগুলো খুবই নীচু গলায় বললেন বটে কিন্তু ওই নির্জন জায়গায় তা যথেষ্ট নীচু হল না। তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র অন্ধকার মন্দিরের ভেতর থেকে কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এল, বাইরে কে রয়েছেন? আমাদের বাঁচান। একপাল পাগলা হাতি আমাদের এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আর মারবার জন্য বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের সঙ্গে আবার দুটো বাঘও রয়েছে। কেন যে জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে এসেছিলুম!

বিক্রম চেঁচিয়ে বলল— তোমরা কারা? বাইরে এসো।

বলামাত্র চারটে লোক ঠেলাঠেলি করতে করতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাজা আর বিক্রমকে দেখে 'ওরে বাবারে' বলে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। বিক্রম বলল— অ্যাই, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? বললুম না বাইরে আসতে? ভেতরে ঢুকে পার পাবে ভেবেছ? রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা কত বড়ো অপরাধ তা জানো? তার শাস্তি এড়ানো এত সহজ নয়, বুঝেছ?

লোকগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বোকামতন দেখতে, সে বলল— বাঃ, আমরা যে রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছি তা আপনি কী করে জানলেন? আমাদের তো মুখ ঢাকা ছিল।

—কী করে যে জানলুম তা আর তোমাদের বুঝে কাজ নেই। এখন চলো, তোমাদের শূলে চড়াবার সব ব্যবস্থাই প্রস্তুত।

বলতেই চারজন হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে প্রতাপ সিংহের পায়ে এসে পড়ল। সমস্বরে বলল— আমাদের ক্ষমা করুন, রাজামশাই। আমরা আপনার পাশের রাজ্যের সামান্য সৈনিক। ভীষণ গরিব, দু-বেলা খেতে পাইনে। আপনাকে হত্যা করতে পারলে আমাদের রাজা প্রধর্ষ আর বিরূপাক্ষ বলে একজন লোক আমাদের এত অর্থ দেবে বলেছেন যে, আমরা লোভ সামলাতে পারিনি। আর কখনো এমন কাজ করব না, রাজামশাই।

রাজার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো হয়ে উঠল। বললেন— তোমরা এই বিরুপাক্ষকে দেখেছ? তাকে চিনিয়ে নিতে পারবে?

—পারব, রাজামশাই। আপনি যা বলবেন, তাই করব। দয়া করে আমাদের শূলে চড়াবেন না।

—সেটা যথাসময়ে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু বিক্রম, এই চারজনকে রাজধানীতে নিয়ে যাই কী করে বলো তো? আমাদের সঙ্গে তো মোটে দুটো ঘোড়া।

—বিক্রম বলল, এই বনের হাতিরা ওদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বলতে বলতে সীতা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তারপরেই জিভ কেটে বলল, ওই যাঃ, ভুলে গিয়েছিলুম। মহারাজের জয় হোক।

প্রতাপ সিংহ স্তম্ভিত হয়ে ঘটনাটা দেখছিলেন। জয়োচ্চারণ শুনে অট্টহাসি হেসে বললেন— জয় তো হলই। কিন্তু, তুমি কে মা? এই ঘন বনের ভেতরে এমন নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? কার মেয়ে তুমি? না, না, আমি বুঝেছি। এমন রূপ তোমার। তুমি নিশ্চয়ই বনদেবী।

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সীতা বলল— না, না, আমার নাম বনদেবী নয়, আমি সীতা। এই বনেই আমার বাড়ি। আর আমার তো এখানে কোনো ভয় নেই। এখানে সবাই আমার বন্ধু। আর তুমি তো এখন আমার সঙ্গে আছ, রাজামশাই। তোমারও কোনো ভয় নেই।

হাতজোড় করে প্রতাপ সহাস্যে বললেন— তোমার এই অভয়বাণীতে বড়োই নিশ্চিন্ত হলুম, মা। কিন্তু আমাদের যে খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দেবে না?

—হ্যাঁ, এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলে মুখ তুলে সীতা বলল— যা তো মসুরি, লাখুটিকে খাবার আনতে বল। সাতজনের জন্য। ওই চারটে পাজিরও ক্ষিদে পেয়েছে। কাল থেকে খায়নি তো কিছু।

মসুরি অমনি সাঁ করে উড়ে চলে গেল। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— মসুরি, লাখুটি, এরা সব কারা?

—ওই দাঁড়কাকটা, ওর নাম মসুরি। আর লাখুটি হচ্ছে এই বনের সব হনুমানদের দলপতি।

—হনুমান? সত্যিকারের হনুমান?

—তা নয়তো কী? মিথ্যে হনুমান আবার হয় নাকি?

—না, তা হয় না। মানে, আমি ভাবছিলুম তুমি হয়তো এই বনের শবর বা কিরাতদের কথা বলছ।

—এ মা, রাজামশাই, তুমি কিচ্ছু জানো না। শবর বা কিরাতরা তো বনের ধারে থাকে। এমন ঘন বনের ভেতরে তারা আসে না তো। আচ্ছা, তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বসো না ওই পাথর দুটোর ওপরে। না, না, দাঁড়াও, আগে ও দুটো পরিষ্কার করে দিই। যা ধুলো পড়েছে! দমদম, পাথর দুটো পরিষ্কার করে দেবে?

মন্দিরের পেছন থেকে বিশালকায় দমদম বেরিয়ে এসে শুঁড় দিয়ে ফুঁ দিয়ে পাথর দুটোর ওপরের সব ধুলোবালি উড়িয়ে দিল। রাজামশাইকে আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে হল না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে ধপ করে বসে পড়লেন। বিড়বিড় করে বললেন— এ সব আমি কী দেখছি?

ওঁর পাশে বসে বিক্রম বলল— আমি যেটুকু জানি, আপনাকে বলছি। বলে রাজার কানে কানে ওর আগের দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলল। রাজামশাই শোনেন আর বলেন, কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত!

এই কথার মধ্যে একপাল পাকানো পাকানো লম্বা ল্যাজওলা হনুমান হুপ হুপ করে গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে নামল। তাদের কারুর হাতে বড়ো বড়ো পদ্মপাতায় কলা, আম, কাঁঠালের কোয়া ইত্যাদি, কেউ এনেছে ওইরকম পদ্মপাতায় জল।

রাজা আর এখন আশ্চর্য হচ্ছেন না। বেশ স্বচ্ছন্দে হনুমানদের হাত থেকে একটা পদ্মপাতা নিয়ে বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে শুরু করলেন।

খেতে খেতে বিক্রম বলল— সীতা, আমাদের খাওয়া শেষ হলে দমদম যেন বন্দিদের জঙ্গলের বাইরে রেখে আসে। ওখানে কোটাল অপেক্ষা করছেন। তোমরা পায়রা দূতকে দিয়ে তাঁকে অগ্রিম খবরটা পাঠিয়ে দিও। যে চিঠিটা লিখবে তাতে একটা সংকেতবার্তা দেবে যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে সেটা মহারাজের আদেশ। সেই সংকেতবার্তাটা আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

রাজা বললেন— সীতা এ কাজ করতে পারবে?

—পারবে, মহারাজ। আপনার রাজকর্মচারীদের থেকে অনেক ভালো পারবে। দেখলেন না ও কীভাবে আপনার প্রাণ বাঁচাল আর গুপ্তঘাতকদের ধরিয়ে দিল?

দমদম আর তার দলবল বন্দিদের নিয়ে চলে যাবার পর সীতা বলল— তুমি কি ওদের সত্যি সত্যি শূলে চড়াবে, রাজামশাই? মেরে ফেলবে?

রাজা সহাস্যে বললেন— তুমি কী পাগল নাকি? জানো না, আমাদের রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড নেই। কোনো শূলই নেই তো চড়াব কোথায়? বিক্রম ওদের মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিল। তবে ওদের শাস্তি হবে। ওসব কথা ছাড়। এখন বলো তো তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? তুমি তো দিব্যি লেখাপড়া জানো। কার কাছে পড়ো?



সীতা তার সবকথা বলল। তারপরে জিজ্ঞাসা করল— জানো তো রাজামশাই, পিসিমা আমাকে অঙ্কও শেখায়? পঁচিশকে পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয়, বলো তো?

—কত হয়?

—জানো না? ছ-শো পঁচিশ। কী অদ্ভুত, তাই না?

—সত্যিই অদ্ভুত। আচ্ছা সীতা, তুমি আমাকে তোমার বাড়ি দেখাবে না?

—হ্যাঁ, দেখাব। এসো আমার সঙ্গে।

হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে রাজাকে তার নানা রকমের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল সীতা। রাজা মুগ্ধ বিস্ময়ে সেইসব কাহিনি শুনলেন। একবারও বাধা দিলেন না।

শম্পা নদীর কাছে এসে সীতা বলল— ওই দ্যাখো, আমাদের পাতার কুঁড়েঘর। কী সুন্দর, তাই না? রাজামশাই, তোমার বাড়িটা এর চেয়েও বড়ো? আরও সুন্দর?

মহারাজের চোখে জল এল। বললেন— হ্যাঁ রে মা। আমার বাড়িটা তোর ওই বাড়ির চেয়ে বড়ো, কিন্তু ভীষণ বিচ্ছিরি। সেখানে কোনো সৌন্দর্য নেই। সেখানে সবসময় অন্ধকার, তার কোণায় কোণায় ভয় আর অবিশ্বাস জমাট হয়ে আছে। সেখানে কেউ হাসে না, সবাই ভুরু কুঁচকে গোমড়ামুখে ঘুরে বেড়ায় আর যত রাজ্যের নোংরা ঘাঁটে। তোদের বাড়ির একটা টুকরো যদি তুলে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার ঘরেও আলো জ্বলে উঠবে, সবাই হাসবে, মনের আনন্দে গান গাইবে।

—সেই ভালো। থেকো-না অমন বাড়িতে। আমার বাবা তো ঘর বানায়। বাবাকে বলব তোমাকে আমাদের মতো একটা ঘর তৈরি করে দেবে। তাহলে আর তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না।

—ঠিক বলবি তো? আমিও বলব। আমি হলুম গিয়ে রাজামশাই, আমার কথা তোর বাবা ঠেলতে পারবেন না।

হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে সীতা বলল— আরে! দাওয়ার ওপরে বাবার লাঠিটা। তাহলে বাবা-মা নিশ্চয়ই এসেছে। তুমি এখানে বসো, আমি ভেতর থেকে ওদের ডেকে নিয়ে আসছি।

দাওয়ায় বসে বিক্রম আর রাজা শুনতে পেলেন সীতা তার মার কাছে বকুনি খাচ্ছে, কোথায় থাকিস বল তো সারাদিন? ডেকে ডেকে পাই না।

সীতা বলল— শোনো-না মা, কী হয়েছে? বাবা তুমিও শোনো। তারপরে ঝড়ের বেগে সে কী সব বলে গেল। একটু পরেই ওর বাবা আর মা হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন আর 'মহারাজের জয় হোক' বলে দু-জনে রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

সীতার বাবা বললেন— মহারাজ, আমার এই পর্ণকুটিরে এসেছেন। আমি কী করে আপনার আপ্যায়ন করব?

রাজা বললেন— তোমার এই মেয়ে আমাদের যা আপ্যায়ন করেছে তা কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের পক্ষেও সম্ভব হত না। শুধু কী আপ্যায়ন? সে দু-দু-বার আমার প্রাণরক্ষা করেছে। এক বার আততায়ীর হাত থেকে আর এক বার প্রবল ক্ষুধার থেকে।

জোড়হাত করে সীতার বাবা বললেন— নিজের মেয়ে বলছি না মহারাজ, সীতা কিন্তু সত্যিই অসাধারণ।

—তা আমি বুঝতে পেরেছি। ভেতরে চলো, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষে চাইবার আছে।

সীতার বাবা-মা আর রাজা প্রতাপ সিংহ ঘরের ভেতরে চলে গেলে, সীতা বিক্রমের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল— মহারাজ আমার বাবার কাছে কী ভিক্ষা চাইছে, বলো তো? আমাদের তো দেবার মতো কিছুই নেই।

বিক্রম মৃদু হেসে বলল— উনি নিশ্চয়ই তোমার বাবার কাছে অত্যন্ত মহার্ঘ কিছু দেখেছেন। তাই চাইছেন।

—অত্যন্ত মহার্ঘ কিছু? বাবার কাছে? সেটা আবার কী?

উত্তরটা ভেবে বের করবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে রাজার গলা শোনা গেল— হ্যাঁরে সীতা, একটা কথা বল তো। আমার বাড়িতে একটা ল্যাজকাটা হনুমান আছে। সেটা বেজায় দুষ্টু। কারুর কথা শোনে না, কেবল লাফিয়ে বেড়ায়। তুই তার ভার নিয়ে তাকে সামলাতে পারবি?

সীতা বলল— কেন পারব না? হনুমান যত দুষ্টুই হোক, আমার কাছে তার কোনোরকম জারিজুরি চলবে না।

বলামাত্র ঘরের ভেতরে রাজা অট্টহাসি হেসে উঠলেন আর তার পরেই একটা শঙ্খের গম্ভীর শব্দ ছড়িয়ে গেল সমস্ত বনভূমিতে।



অনেক অনেকদিন আগে লতাবাগান গ্রামে পণ্ডিত হরনাথ তর্কতীর্থ টোল চালাতেন। আশেপাশের দশটা গ্রামের লোক তাঁর নাম জানত। সে যে শুধু তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাই নয়, প্রচণ্ড সত্যবাদী বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সবাই জানত, হরনাথ তর্কতীর্থ মরে যাবেন তবুও মিথ্যে কথা বলবেন না। ঘোর বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি কখনো অসত্য কথা বলেননি। এইসব কারণে পণ্ডিতমশায়ের বয়েস খুব বেশি না হলেও সবাই তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। সে দেশের রাজা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনিও তাঁকে গভীর সম্মান করতেন। তাঁর টোল চালাবার জন্য সিধে পাঠাতেন।

তর্কতীর্থের কুঁড়েঘরটা ছিল লতাবাগানের একটেরে। সেখানেই টোল। বাড়িতে থাকতেন পণ্ডিতমশাই আর তাঁর স্ত্রী সরস্বতী। দু-চারজন গরিব ছাত্রও তাঁর বাড়িতে থাকত। তর্কতীর্থ তাদের নিজের ছেলের মতো দেখতেন। তাঁর বাড়ির পরেই ফাঁকা জমি আর তার পরে জঙ্গল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ চোর-ডাকাতের ভয় করতেন না। ভয় ছিল বন্য জন্তুর। সেজন্য, তাঁর বাড়ি আর উঠোন ঘিরে কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া ছিল আর সন্ধের পর বেড়ার ঝাঁপ বন্ধ করে সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ঘরের দাওয়ায় বসে তর্কতীর্থ প্রদীপের আলোয় একটা পুঁথি পড়ছিলেন। সকলে তখন শুয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে একটা নিশাচর পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া চারদিক নিস্তব্ধ। পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর কানে এল বেড়ার ওপাশে কিছু ভারী পায়ের শব্দ। জন্তুজানোয়ার নয়, মানুষ। এত রাতে কারা এল দেখবার জন্য পণ্ডিতমশাই আসন ছেড়ে উঠতে যাচ্ছেন, শুনলেন বেড়ার দরজা খুলে কেউ তাঁর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে তাঁর দিকে আসছে।

পণ্ডিতমশাই আবার আসনে বসে পড়লেন আর অন্ধকারের মধ্যে কে আসছে সেটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে লোকটা তাঁর দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল, প্রদীপের আলোয় তাকে দেখে পণ্ডিতমশায়ের তো চক্ষুস্থির!

মাঝবয়সি লোকটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আর প্রকাণ্ড ষণ্ডা জোয়ান। তার হাতে একটা লম্বা লোহার সড়কি, সারা গায়ে তেল মাখা, পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধুতি, খালি গা, কুতকুতে

চোখ, মুখে একজোড়া বিরাট গোঁফ আর মাথার বাবরি চুলের ওপরে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা।

লোকটা মোটা গলায় বলল— পেন্নাম হই, পণ্ডিতমশাই। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

পণ্ডিতমশাই নির্বিকার মুখে বললেন— তুমি একজন ডাকাত, সেটা বুঝতে পারছি। তার বেশি পরিচয় আমার জানা নেই।

ডাকাত বুক ফুলিয়ে বলল— আমার নাম নগেন গায়েন। এই তল্লাটে সবাই আমাকে নগা ডাকাত বলে জানে।

—তা হতে পারে। তবে, তুমি তো দেখছি ডাকাতি করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছ। সেক্ষেত্রে, আমার বাড়িতে তোমার আবির্ভাবের কারণটা তো ঠিক বুঝতে পারলুম না, বাপু। তোমার কি ধারণা হয়েছে যে আমার বাড়িতে সোনাদানা বস্তাবন্দি করে রাখা রয়েছে?

—আজ্ঞে না, পণ্ডিতমশাই। আপনার বাড়িতে যা আছে তা পঞ্চাশ বার লুট করলেও আমার যে পড়তায় পোষাবে না, তা আমি ভালো করেই জানি। আমি এসেছি অন্য কারণে। আপনার কাছে আমার একটা খবরের দরকার আছে।

—কী খবর চাও?

—দেখুন, পণ্ডিতমশাই, আপনি তো আমাদের রাজামশায়ের গুরু এবং কুলপুরোহিত। এবার বলুন তো, রাজবাড়ির কোষাগারে ঢোকার গুপ্তপথের সন্ধান জানেন নাকি একমাত্র রাজামশাই আর আপনি। রানিমা বা তাঁর ছেলেপুলেরাও জানেন না, এ কথাটা কি ঠিক?

ভয়ানক গম্ভীর মুখে পণ্ডিতমশাই বললেন— হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তুমি জানলে কী করে?

—খুব সহজে। রাজামশায়ের খাজাঞ্চি উদ্ধব রায়কে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাঁশ দিয়ে ডললুম আর সে গড়গড় করে বলে দিলে।

—কী সর্বনাশ! তোমার কাছে দেখছি কোনো কুকর্মই অসাধ্য নয়।

—ঠিক কথা। তাহলে, এবার ওই গুপ্তপথে ঢোকার উপায়টা আমাকে বলে দিন। ওটা আমার জানা খুব দরকার।

—তোমার যদি দরকার থাকে তো তুমি নিজে খুঁজে নাওগে যাও। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমি তোমাকে বলব না। আর, সেই জন্য তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও তো মেরে ফেলতে পারো। তুমি বোধ হয় জানো না যে আমার মৃত্যুভয় বলে কিছু নেই।

একগাদা এবড়ো-খেবড়ো হলদে দাঁত বের করে হাসল নগা। বলল— আপনাকে মারতে যাব কোন দুঃখে? আপনার মতো একটা শুঁটকো পণ্ডিতকে মেরে খালি হাতে বাড়ি ফেরার জন্য তো আর এতটা পথ আসিনি। কোষাগারে ঢোকার পথটা না-জেনে ফিরি কী করে, বলুন? তবে, নেহাতই যদি না বলেন, তাহলে অবশ্য যাওয়ার আগে আপনার গিন্নি আর ছাত্রগুলোকে মেরে এই টোল আর বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে রেখে যাব। নগা ডাকাতের হুংকার শুনলে এ গাঁয়ের একটি লোকও আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। একা আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবেন।

—বটে? আচ্ছা, ধরো আমি তোমাকে বললুম। কিন্তু আমি তো তোমাকে ভুলপথে পাঠাতে পারি। তুমি বুঝবে কী করে?

মাথা নেড়ে নগা বলল— তা আপনি করবেন না। আমরা জানি যে, কোনো অবস্থাতেই আপনি মিথ্যেকথা বলতে পারেন না।

নগার কথা শুনে পণ্ডিতমশাই কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন— বেশ, গুপ্তপথের সন্ধান আমি তোমাকে দেব। কিন্তু, একটা শর্ত আছে।

—কী শর্ত?

—শর্তটা হল যে আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বাধ্য করবে না। যদি করো, তাহলে রাজামশাই ঠিকই জানতে পারবেন। তখন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমাকে শূলে চড়াবেন আর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবেন। তোমাকে কিছু যদি না-বলি, তাহলে তুমিও তাই করবে। কাজেই শর্ত না মানলে তোমাকে কিছু না বলাই শ্রেয় হবে।

নগা তাড়াতাড়ি বলল— না, না, পণ্ডিতমশাই, আপনার শর্ত আমি মেনে নিচ্ছি। আপনি যদি সাধারণ মানুষ হতেন তাহলে আপনাকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতুম। কিন্তু, আমরা জানি যে আপনার ওপরে অত্যাচার করে কোনো লাভ হবে না। আপনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

—আমি তোমাকে গোপন পথের কথা বলে দেবার পর তুমি আমার ওপরে জোর করবে না তো?

নগা ডাকাত হাতজোড় করে বলল— এটা কী কথা বললেন, পণ্ডিতমশাই? আমি ডাকাত হতে পারি কিন্তু দশগাঁয়ের লোক জানে যে আজ পর্যন্ত নগার কথার নড়চড় হয়নি, কোনোদিন হবেও না।

পণ্ডিতমশাই বললেন— বেশ কথা। বলে, ফিসফিস করে নগাকে গুপ্তপথের হদিশ বলে দিলেন।

নগা সবকথা মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল— শুধু এতে তো হবে না পণ্ডিতমশাই। দরজা খোলার মন্তরটাও তো বলতে হবে। ওখানে শুনেছি জগদ্দল দরজা। সেটা ভাঙতে গেলে তো তার শব্দে রাজবাড়ি সুদ্ধু লোক আর যত রাজ্যের পাইক-পেয়াদা সেখানে এসে উপস্থিত হবে। অথচ, মন্তর বললে দরজা নাকি হুড়ুৎ করে খুলে যায়।

পণ্ডিতমশাই বললেন— অঃ, সে-কথাটাও জেনে গেছ? তবে শোনো। যখন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন প্রথমে জোরে জোরে বলবে, ওঁ হুং খ্রীং ঘুট, তাহলে দরজা খুলে যাবে। তারপরে বলবে, ওঁ ঝিড়িং গিড়িং ফট। তাহলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হবে। ভুল করে মন্ত্রগুলো উলটোপালটা করে ফেল না যেন। তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে।

নগা মাথা নেড়ে বলল— ভুল হবে না, পণ্ডিতমশাই। বলে বিড়বিড় করে মন্ত্র দুটো মুখস্থ করে ফেলল। তারপর, পণ্ডিতমশাইকে একটা নমস্কার করে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

নগা বেরিয়ে যেতেই ঘরের ভেতর থেকে সরস্বতী বেরিয়ে এলেন। বললেন— এটা কী করলে? আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমাদের উপকারী রাজামশায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? আমাদের না-হয় বাঁচালে, কিন্তু তোমার ছাত্রদের মধ্যে হয়তো কেউ নগা আর তোমার কথাবার্তা শুনেছে। তারা তো বাইরে গিয়ে রটাবে যে তুমি কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক। সেটা সইতে পারবে?

পণ্ডিতমশাই মাথা নেড়ে বললেন— বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি দেখো। কেবল, একটা জায়গায় খটকা রয়ে গেল। আজ থেকে বহুবছর আগে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ তন্ত্রাচার্য ঈশ্বর জগন্নাথ আগমবাগীশ কতগুলো মন্ত্র দিয়ে ওই দরজা বেঁধে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় যে মন্ত্রটা নগাকে শেখালুম সেটা তো কখনো ব্যবহার হয়নি, এখন এত বছর বাদে সেটা কাজ করবে কি না সে বিষয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছে। যদি কাজ না করে তাহলে বিপদ।

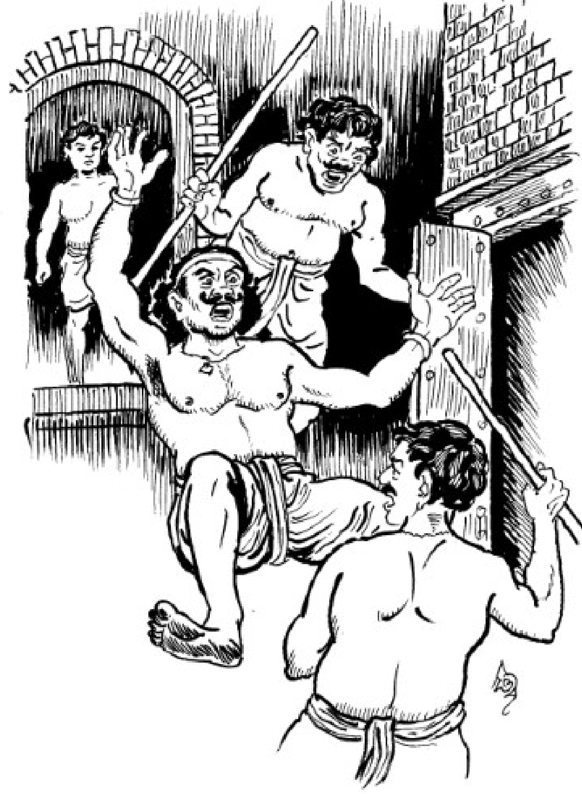
—এতদিন মন্ত্রটা যদি ব্যবহার নাই হয়ে থাকে, তাহলে দরজাটা খোলা হয় কী করে? চাবি দিয়ে বুঝি? বুঝতে পেরেছি। নগা যাতে চাবির জন্য রাজামশায়ের অন্দরমহলে গিয়ে উপস্থিত না-হয়, তাই তুমি ওকে মন্ত্রটা দিলে, তাই না?

হরনাথ তর্কতীর্থ এই প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়ে চিন্তিত মুখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাওয়ায় বসে রইলেন।

ঝোপঝাড় ভেঙে নগা আর তার দলবল রাজবাড়ির পেছনে বাগানের পাঁচিলের কাছে পৌঁছল। সেটা টপকে ভেতরে ঢুকে তারা চলে গেল একটা প্রকাণ্ড বটগাছের সামনে। তার একগুচ্ছ ঝুরি আর কাঁটাঝোপ সরিয়ে দেখা গেল গাছের মূলকাণ্ডের গায়ে একটা দরজা। কেউ বলে না-দিলে সেটা চেনা একেবারে অসম্ভব। শাবলের চাড় দিয়ে দরজা খোলা হল। তার পেছনে একটা সুড়ঙ্গ পথ। সেটা নেমে গেছে মাটির নীচে। মশাল জ্বালিয়ে নগা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ভেতরে ঢুকল।

সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ হয়েছে সেটা একটা বড়ো ঘর আর তার একপাশে বিরাট শালকাঠের মজবুত দরজা। সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নগা বলল— ওঁ হ্রুং ভ্রীং ঘুট। বলামাত্র দরজাটা কড়কড় করে খুলতে শুরু করল। তখন নগা বলল— ওঁ ঝিড়িং গিড়িং ফট। বলতে বলতে দরজাটা পুরো খুলে গেল।

দরজার পেছনে একটা বড়োসড়ো ঘর, নিরেট পাথরের দেওয়াল। সেখানে মশাল রাখার খাঁজ কাটা আছে। ঘরের মেঝেয় সাত-আটটা লোহার সিন্দুক। নগা বলল— কেউ আগে সিন্দুক খুলবি না। আগে মশালগুলো খাঁজের মধ্যে রাখ। দু-জন সড়কি নিয়ে দরজায় পাহারা দে। বাকি সবাই সড়কি আর লাঠি তৈরি করে রাখ যাতে ওই গর্ত দিয়ে কেউ নেমে এলে আমাদের কোণঠাসা ইঁদুরের মতো অবস্থা না-হয়। সিন্দুকগুলো খুলব আমি।



সেইমতো ব্যবস্থা হল। প্রথম সিন্দুকটা খুলে নগা একেবারে স্তম্ভিত। সেটা সোনা আর রুপোর টাকায় ভরতি। দ্বিতীয়টাও সেইরকম। তৃতীয়টায় গয়নাগাঁটি। তার পরেরটায় সোনা-রুপোর তৈজসপত্র। কোনোটাতে হিরে-মণি-মুক্তো। নগা আর তার লোকেরা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল।

নগা কোনোরকমে বলল— হারু, হাঁ করে কী দেখছিস? থলেগুলো বের কর। সেগুলো ভরতে হবে না?

বলতে বলতে নগা যেই টাকা ভরতি সিন্দুকটায় হাত ঢুকিয়েছে অমনি একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় খেয়ে সে মেঝের ওপর হাত-পা তুলে ছিটকে পড়ল। চট করে সামলে নিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— অ্যাই, অ্যাই, কে মারল রে? কার এতবড়ো সাহস?

দলের সবাই সমস্বরে বলল— আমরা কেউ মারিনি, সর্দার।

—মারিসনি তো আমার গালে এমন জোরে লাগল কী করে, শুনি?

একজন বলল— বোধ হয় তাড়াহুড়োয় সিন্দুকের ডালাটায় লেগে গেছে।

—হুম, তাই হবে। বলে নগা যেই আবার সিন্দুকে হাত দিয়েছে, কে যেন পেছন থেকে ওর ঘাড়ে এমন রদ্দা মারল যে তার মুখ টাকার স্তূপের ভেতরে সিধিয়ে গেল।

সবাই আবার সমস্বরে বলল— অত হাঁক-পাক কোরো না, সর্দার। সময় আছে। আস্তে আস্তে করো।

বিকৃত মুখে ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে নগা বলল— নাঃ, আমার দ্বারা হচ্ছে না। তোরা সক্কলে থলে নে, আর ভরতে শুরু কর।

তখন ঘরের মধ্যে একেবারে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। কেউ শূন্যে উঠে দড়াম করে মেঝের ওপরে আছড়ে পড়তে লাগল, কেউ 'ওরে বাবারে, মরে গেলুম রে' বলে লাফাতে লাফাতে ঘরের চারদিকে দৌড়তে লাগল, কেউ এক বার এ দেওয়ালে আর এক বার ও দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, কেউ-বা মেঝের ওপর পড়ে গাঁক গাঁক করতে করতে হাত-পা ছুড়তে লাগল। আর সক্কলে মিলে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে শুরু করে দিল। নগা বলতে গিয়েছিল যে অমন চ্যাঁচালে রাজবাড়ি সুদ্ধু লোক জেগে যাবে। কিন্তু সে কথা বলবার আগেই আবার ঘাড়ে প্রচণ্ড রদ্দা খেয়ে সেও মাটিতে পড়ে হাউমাউ করে চিৎকার জুড়ে দিল। যে দু-জন দরজার কাছে পাহারা দিচ্ছিল, তারা পালাতে গিয়ে আর পালাতে পারল না। ছিটকে ঘরের ভেতরে এসে পড়ল। সে একেবারে হুলুস্থুল ব্যাপার।

বাগানের দিক থেকে প্রবল চ্যাঁচামেচি শুনে রাজবাড়ি সুদ্ধু সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ল। রাজামশাই হাই তুলতে তুলতে খোলা তরোয়াল হাতে কোটাল আর তাঁর পাইক-বরকন্দাজদের নিয়ে বটগাছটার কাছে চলে এলেন। ততক্ষণে আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য। গাছের তলায় একপাশে কতগুলো মুস্কো লোক হাত-পা ছড়িয়ে, কেউ চিৎপাত হয়ে, কেউ-বা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

রাজামশাই তো স্তম্ভিত। বললেন— দেখো তো, এরা কারা।

মশালের আলোয় লোকগুলোকে দেখে বরকন্দাজরা বলল— এরা তো ডাকাত, রাজামশাই! বেজায় মার খেয়ে সব ক-টা অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। আর, মুখের যা অবস্থা হয়েছে তাতে এদের মা-মাসিরাও মাসখানেকের আগে এদের চিনতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। আহারে, নাক-চোখ-মুখ সব একাকার হয়ে গিয়েছে। এরা এখানে এলই-বা কী করে আর এদের এমন মারই বা দিলে কে?

রাজামশাই চোখ মুছতে মুছতে বললেন, সে কথা পরে ভেবো। আগে এদের ভালো করে পিছমোড়া করে বাঁধো, তারপরে মুখে জল ঢেলে জ্ঞান ফেরাও।

সে রকমই করা হল। ডাকাতদের যারই জ্ঞান ফেরে সেই 'ভূত ভূত' বলে চেঁচিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পালাতে যায়। কিন্তু পালাবে কোথায়? হাত-পা তো বাঁধা।

রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন— তোমাদের সর্দার কে?

ডাকাতরা বলল— আজ্ঞে, ওই যে উনি যাঁর জ্ঞান ফেরানোর জন্যে মুখে কলসি কলসি জল ঢালা হচ্ছে।

—কী নাম তোমাদের সর্দারের?

—আজ্ঞে, ছিরি নগেন্দরনাথ গায়েন।

এইবার রাজামশায়ের ঘুম ছুটে গেল। বললেন— কী সর্বনাশ! তোমরা নগা ডাকাতের দল নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজামশাই। লোকে আমাদের তাই বলে বটে।

ইতিমধ্যে ছিরি নগেন্দ্রনাথ গায়েনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। বরকন্দাজরা তাকে টানতে টানতে রাজামশায়ের কাছে নিয়ে এল। তার ছিরি দেখে রাজামশায়ের কষ্টই হল। নাকটা বেঁকে গেছে, চোখ দুটো আর দেখাই যাচ্ছে না, কপাল আর ঠোঁট ফুলে ঢোল, হাত-পাগুলো কেমনধারা যেন ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে গেছে।

রাজামশাই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— অ্যাই, তুমি নগা ডাকাত?

নগা কাঁদতে কাঁদতে বলল— হ্যাঁ, রাজামশাই।

—তোমার মুণ্ডুটা অমন বেঁকিয়ে রেখেছ কেন? ওটা কি জন্মাবধিই ওরকম নাকি?

—না, রাজামশাই। ঘাড়ে এমন রদ্দা খেয়েছি যে মুণ্ডু সোজা করতে পারছি না। ভূতের রদ্দা, সে কী সোজা ব্যাপার?

রাজামশাই কোটালকে ডেকে বললেন— এরা কেবল ভূত ভূত করছে। মনে হচ্ছে মার খেয়ে বা অন্য কোনো কারণে ওদের সকলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এদের এখন কারাগারে নিয়ে যাও। সকাল হলে রাজসভায় নিয়ে এসো। সেখানে ওদের সবকথা শুনব আর তারপরে বিচার হবে।

কোটাল বললেন— রাজামশাই, এই নগা আর তার দলের অত্যাচারে আশেপাশের সব ক-টা রাজ্যের লোক ত্রাহি ত্রাহি করছে। ওর ভয়ে আমরা সারারাত ঘুমোতে পারি না। ধনী-দরিদ্র কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। কত লোক যে ওদের জন্যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার সীমা নেই। অনেক চেষ্টা করেও এতদিন কেউ ওদের আটকাতে পারেনি। এখন যখন ওদের বাগে পেয়েছি, আমরা সবাই আশ মিটিয়ে হাতের সুখ করে নিতে চাই। আপনি দয়া করে বাধা দেবেন না। তারপরে আমরা রাজসভায় নিয়ে যাব।

রাজামশাই বললেন— ওদের তো নড়াচড়া করবারও ক্ষমতা নেই। তার ওপরে আরও মারলে মরে যাবে যে।

—কিচ্ছু মরবে না। আপনি দেখুন না, ওরা নড়াচড়া করতে পারে কিনা।

তখন বরকন্দাজরা সবাই মিলে ডাকাতদের গায়ে আচ্ছা করে জলবিছুটি ঘষে দিল আর অমনি তারা, 'ওরে বাবারে, গেলুম রে, মলুম রে', বলে বেঁকেচুরে নাচতে শুরু করে দিল।

তারপরে যা হল সে আর বলে কাজ নেই।

ভেউভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে নগা রাজামশায়ের পায়ে পড়ে বলল— আপনি তো আমাদের শূলেই দেবেন। তার আগে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন, রাজামশাই?

—কী অনুরোধ? রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

—মশানে যাবার আগে একটি বার আমি হরনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি আমাকে সেই অনুমতিটা দিন, রাজামশাই।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে রাজামশাই বললেন— সেকী? তুমি পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাও? ঠিক আছে, তাই হবে। তবে মশানে যাবার আগে কেন? এখুনি চলো। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল। আমরা ওঁর বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে উনি উঠে পড়বেন।

পুবদিকে রাঙা আলোর আঁচল উড়িয়ে ঊষা আসছেন। পাখিরা ঘুম ভেঙে কলরব করে তাঁর আগমনী গাইছে। পণ্ডিতমশাই দাওয়ায় বসে মুগ্ধ চোখে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। উদবেগে সারারাত ঘুমোতে পারেননি। ভোর বেলার ঠান্ডা বাতাস তাঁর তপ্ত মুখে যেন তাঁর স্বর্গতা মায়ের সস্নেহ হাতের স্পর্শ মাখিয়ে দিচ্ছিল।

সেইসময় ছোট্ট একটি রাখাল ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে বলল— পণ্ডিতমশাই, পণ্ডিতমশাই, আমাদের রাজামশাই লোকলস্কর নিয়ে এইদিকে আসছেন। তাঁর বরকন্দাজরা কতগুলো হুমদো মতন লোককে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ইসস, লোকগুলোর কী অবস্থা! বরকন্দাজরা তাদের মেরে একেবারে কাঁঠাল পাকিয়ে দিয়েছে।

বলতে না-বলতেই রাজার দলবল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির সামনে এসে পড়ল। রাজামশাই পালকি থেকে নেমে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকলেন। পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে দাওয়া থেকে নেমে এসেছেন। রাজামশাই তাঁকে প্রণাম করে বললেন— গুরুদেব, কাল নগা ডাকাতের দল আমাদের বাগানে ঢুকেছিল। বোধ হয়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজকোষ লুঠ করা। সে তো তারা পারেইনি, উলটে কোনো রহস্যময় কারণে প্রচণ্ড মার খেয়ে গাছের তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। আমার গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল যে রাজকোষ রক্ষা পাওয়ার পেছনে আপনার কোনোরকম ক্ষমতা কাজ করেছে। পরে যখন নগা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইল তখন স্থির নিশ্চয় হলুম যে আমার সন্দেহে কোনো ভুল ছিল না। আমি ওকে নিয়ে এসেছি। আপনি ওর কথা শুনুন, আমি পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

হরনাথ বললেন— সে-কী? তুমি রাজা, তোমার কাছে তো কোনো কথা গোপন থাকতে পারে না। তুমি এখানেই থাকবে। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা তা তোমার সামনেই হবে।

রাজামশায়ের আদেশে নগাকে পণ্ডিতমশায়ের সামনে আনা হল। সে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে বলল— পণ্ডিতমশাই, শূলে যাবার আগে আপনাকে শেষ দেখা দেখতে এলুম। আপনার অনেক গুণের কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আপনি যে আমাদের ভূতের মারও খাওয়াবেন আবার পেয়াদার মারও খাওয়াবেন, এতটা বুঝতে পারিনি। কোনো রাজা-মহারাজারও এ কাজ করার সাধ্যি ছিল না।

হরনাথ রাজামশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন— ওদের কি শূলেই দেবে?

রাজামশাই বললেন— নাঃ, যা ঘটেছে তারপরে ওদের শূলে দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। তবে, আমি ওদের জন্য আরও বড়ো শাস্তি ভেবে রেখেছি।

—সে আবার কী?

—এই নগার বংশগত পেশা হল খোল বাজিয়ে কীর্তন গাওয়া। ও যখন গানের দল গড়ে গাওনা শুরু করল, দেখা গেল যে যে-ই তাদের কীর্তন শোনে সে-ই ভীষণ ক্ষেপে যায় আর ওদের খোল-টোল ভেঙে দিয়ে মারতে তাড়া করে। বার কয়েক বেধড়ক প্রহার খেয়ে ও দলবলসুদ্ধু গান ছেড়ে ডাকাতি করতে শুরু করে দিল। সেইজন্যে আমি স্থির করেছি যে ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবো আর ওর কাজ হবে রোজ সকালে কারাগারের সমস্ত বন্দিদের কীর্তন শোনানো।

তাই শুনে নগা আবার হাউহাউ করে কান্না জুড়ে দিল। সে কাঁদে আর বলে, ওরে বাবারে, এর চেয়ে যে শূলে যাওয়া ছিল ভালো। এত বড়ো শাস্তি আমাকে দেবেন না রাজামশাই। রোজ সকালে? ওরে বাবারে!

নগাকে নিয়ে কোটাল আর বরকন্দাজরা চলে যাবার পর, রাজামশাই হরনাথকে বললেন — গুরুদেব, আপনার শক্তিতেই আজ আমাদের রাজকোষ রক্ষা পেয়েছে। সেটা কীভাবে

হল, তা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন— আমার শক্তিতে কিছুই হয়নি। তুমি তো জানো যে আমার পূর্বপুরুষ ঈশ্বর জগন্নাথ আগমবাগীশ এই রাজ্যের কোষাগারের দ্বার মন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেটা খোলার মন্ত্রটা তুমি জানো। আরও কয়েকটা মন্ত্র কিন্তু আছে। বংশপরম্পরায় সেই মন্ত্রগুলো এখন আমার আয়ত্তে। তাদের মধ্যে একটা আছে যেটা দরজার সামনে উচ্চারণ করলে পাতালবাসী অপদেবতারা জেগে উঠবে আর কেউ যদি রাজকোষের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে বা করতে যায় তাহলে তারা বাধা দেবে আর ঘাড়ে ধরে সেই অর্থ যথাস্থানে রেখে দিতে বাধ্য করবে।

—কী সেই মন্ত্র, গুরুদেব? আমি কি সেটা জানতে পারি না?

পণ্ডিত হরনাথ তর্কতীর্থ গম্ভীর গলায় বললেন— না, রাজা। এই মন্ত্রের যাতে কোনোরকম অপব্যবহার না-হয়, সেই জন্য অন্য কাউকে সেটা না জানানোর আদেশ আছে আমার ওপর।

রাজামশাই মাথা চুলকে বললেন— বেশ কথা, গুরুদেব। আমার জানার দরকার নেই, কিন্তু নগা তো জেনে ফেলেছে। অবশ্য, তাতে আর কিছু যায় আসে না। সে যা মার খেয়েছে, তারপরে মন্ত্র তো দূরস্থান, সে যে তার পিতৃনামও বিস্মৃত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।



সে অনেকদিন আগেকার কথা। মহেন্দ্রনগর রাজ্যে অনন্তপুর গ্রামের কেষ্ট নস্করের গোরুটা হঠাৎ একদিন রাত্রে গোয়াল থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ভোর বেলা মাঠে-ঘাটে ঘুরে কেষ্ট যখন গোরুটাকে পেলেন না, তখন তাঁর গ্রামের লোকেদের গিয়ে বললেন — আমার গোরুটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে সে শালকোঁড়া বনের দিকে চলে গেছে। আমি সেদিকেই যাব ভাবছি। তোমরা আমার সঙ্গে আসবে?

সবাই কেষ্ট নস্করকে খুব ভালোবাসত। তারা সমস্বরে বলল,— নিশ্চয়ই। একা-একা তোমার ওই বনের মধ্যে যাওয়া হতেই পারে না।

কেষ্ট নস্করের সঙ্গে তখন গ্রামসুদ্ধু লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে শালকোঁড়া বনের দিকে চলল। বনটা বড়ো, তবে গভীর জঙ্গল কিছু নয়। বড়ো বড়ো গাছ আছে বটে, তবে ঝোপঝাড়ই বেশি। নস্কর আর তাঁর লোকজন হই-হই করতে করতে আর লাঠি দিয়ে ঝোপগুলো খোঁচাতে খোঁচাতে বনের ভেতরদিকে এগোতে শুরু করল। ব্যাপার দেখে গ্রামের ছোটোরাও লাফাতে লাফাতে এসে তাদের বাবা-কাকাদের সঙ্গে জুটে গেল। বেশ একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল।

এই সময়ে অনন্তপুরের পাশের গ্রাম শীতলদিঘির কিছু হাটুরে লোক শালকোঁড়া বনের পাশ দিয়ে হাটে যাচ্ছিল। গোলমাল শুনে তাদের খুব কৌতূহল হল। তারা অনন্তপুরের বাসিন্দা গোবিন্দকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল— তোমরা কী খুঁজছ গো?

গোবিন্দ আবার শীতলদিঘির লোকেদের একদম পছন্দ করত না। সে বললে— তোমাদের সে কথা বলতে যাব কেন হে? যাও, যাও, নিজের কাজে যাও।

তাই শুনে হাটুরেদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তারা কাকুতি-মিনতি করে বলল — আহা, বলোই-না! আমাদের অমন পরপর ভাবছ কেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, এই একটা পেয়ারা খাও। ডাঁসা আর খুব মিষ্টি। এইবার বলো।

গোবিন্দ পেয়ারা খেতে খেতে বলল— এই একটা বড়ো সাদা মতন জিনিস। ভীষণ দামি। ব্যস, আর কিছু বলতে পারব না। বলে, সে এক দৌড়ে বনের ভেতরে চলে গেল।

হাটুরেরা পড়ল মহা সমস্যায়। বড়ো সাদা মতন জিনিস, ভীষণ দামি। সেটা কী হতে পারে?

একজন বললে— বুঝেছি। ভীষণ দামি বড়ো সাদা জিনিস মানে কোনো দামি পাথর। হিরেও হতে পারে। তবে কি বনের ভেতরে গুপ্তধনটন লুকোনো আছে আর সবাই মিলে সেটাই খুঁজতে এসেছে? নিশ্চয়ই তাই। তাহলে আমরাই বা বাদ যাই কেন? বনের ভেতরে লুকোনো গুপ্তধন তো যে পাবে তার। চলো, আমরাও আমাদের গাঁয়ের লোকেদের ডেকে আনি।

এই কথা বলামাত্র সবাই মিলে দৌড়ল তাদের গ্রামের দিকে। একটু বাদেই দেখা গেল শীতলদিঘির লোকজন শাবল, কোদাল, খন্তা ইত্যাদি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। শালকোঁড়া বনে ঢুকেই তাদের কেউ মাটি কোপাতে শুরু করে দিল, কেউ ঝোপগুলো খোঁচাতে লাগল, আবার কেউ-বা মোটা মোটা গাছগুলো ফাঁপা কি না সেটা বোঝবার জন্য তাদের গায়ে বাঁশ দিয়ে ঢকাং-ঢকাং করে পেটাতে লাগল।

এদিকে হয়েছে কী, শীতলদিঘির দু-জন, পঞ্চানন আর দুলাল, মহেন্দ্রনগরের সৈন্যদলে কাজ করত। সকাল বেলা তারা এল না দেখে সেনাপতি একজন সেপাইকে তাদের বাড়িতে পাঠালেন তাদের খোঁজ করবার জন্য। সে শীতলদিঘিতে এসে দেখে গ্রামের মধ্যিখানে মহিলারা একজোট হয়ে খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছে। তাদের ভেতর থেকে দুলালের স্ত্রীকে খুঁজে বের করে সে জিজ্ঞাসা করল— দুলাল আজ কাজে যায়নি কেন?

দুলালের স্ত্রী পেট-আলগা মানুষ। সে তড়বড় করে বলল— কেন যাবে? তুমি শোনোনি বুঝি যে শালকোঁড়া বনে গুপ্তধন পাওয়া গেছে? সে ওখানে গেছে সেইসব আনবার জন্য।

—গুপ্তধন পাওয়া গেছে না কি? বলো কী? কীরকম গুপ্তধন?

—আমি তো শুনলুম সেসব বেজায় দামি দামি হিরে-মানিক। এই ধরো, হাঁসের ডিমের মতো মুক্তো, আধলা ইটের মতো চুনি, হাতের তেলোর মতো পান্না, কদবেলের মতো হিরে, আরও কত কী। তাদের একটা পেলেও কাউকে আর সাতপুরুষ করে খেতে হবে না। আমি তো ওঁকে বলেছি যে আমাকে একটা হিরে বসানো বিছেহার গড়িয়ে দিতেই হবে, হ্যাঁ। আমার বলে কত দিনের শখ!

পুরো কথাটা আর শোনা হল না। খানিকটা শুনেই সেপাই বাবাজি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল রাজবাড়ির দিকে।

দেখতে-না-দেখতে কথাটা মহেন্দ্রনগরের রাজা প্রচণ্ড সিংহের কানে উঠল। উনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি আর মন্ত্রীমশাইকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দু-জনে তখন রাজবাড়ির রান্নাঘরে রাঁধুনিঠাকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে গোপনে ইলিশমাছের ডিমভাজা খাচ্ছিলেন। রাজামশায়ের ডাক পেয়ে প্রবলবেগে মুখ মুছতে মুছতে দৌড়ুলেন অন্তঃপুরের দিকে।

প্রচণ্ড সিংহ অলিন্দে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছিলেন। দু-জনে কাছে আসতে নাক কুঁচকে বললেন— আমার রাজ্যে যখন ভয়ংকর সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে, তখন আপনারা ইলিশমাছ খাচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনাদের?

সেনাপতি বললেন— আজ্ঞে, ইলিশমাছ নয় মহারাজ, আমরা ইলিশমাছের ডিমভাজা খাচ্ছিলুম। ওই, মানে খুব খিদে পেয়েছিল কিনা!

মন্ত্রীমশাই সেনাপতিকে চিমটি কেটে বললেন— তুমি থামো। কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে, মহারাজ?

রাজামশাই বললেন— কোথায় থাকেন সবাই? আপনারা কি জানেন, যে শালকোঁড়ার বনে গুপ্তধন বেরিয়েছে?

মন্ত্রীমশাই আর সেনাপতি সমস্বরে বললেন— কই, না তো!

—কোত্থেকে আর জানাবেন! ইলিশমাছের গন্ধ পেলে কী আর আপনাদের কোনো জ্ঞানগম্যি থাকে? যাকগে, সেসব বেরিয়েছে আর অনন্তপুর এবং শীতলদিঘির লোকেরা সেই গুপ্তধন সংগ্রহ করতে বনের ভেতর ঢুকেছে। এ সব কী হচ্ছে? শুনলুম, ওখানে না কি অত্যন্ত মহার্ঘ্য মণিমাণিক্যাদি পাওয়া গেছে; যার এক-একটারই মূল্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রারও বেশি। সেইসব রত্ন ওই গেঁয়ো লোকগুলো ভোগ করবে আর আমি এখানে বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষব?

মন্ত্রীমশাই বললেন— না, না, তা কখনোই হতে দেওয়া যায় না। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মহারাজ। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

—বটে। তা কী ব্যবস্থা নেবেন?

মন্ত্রীমশাই মাথা চুলকে বললেন— তাই তো। কী ব্যবস্থা নেব? শালকোঁড়া বন তো আমাদের রাজ্যের বাইরে।

রাজামশাই কপাল চাপড়ে বললেন— এই না-হলে আমার মন্ত্রী। শালকোঁড়া বনে যেমন আমার অধিকার নেই তেমনি আর কারুরই তো নেই। এমনকী ওপাশের উপবর্তন রাজ্যেরও নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের ওখানে অভিযান চালাতে কোনো অসুবিধে আছে?

মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে বললেন— আজ্ঞে না, তা নেই। তবে কি না...

—তবের কথা পরে হবে। আপনি এই মুহূর্তে সৈন্যদল প্রস্তুত করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শালকোঁড়া বন ঘিরে ফেলতে হবে যাতে কেউ বেরুতে না-পারে।

সেনাপতি মিনমিন করে বললেন— আজ্ঞে ইয়ে হয়েছে, সৈন্যরা সবে দুপুরের ভাতটা খেতে বসেছে। তার ওপরে আজ বড়ি দিয়ে পালংশাকের তরকারি হয়েছিল। এক্ষুনি না-বেরিয়ে বিকেলের দিকে গেলে হত না?

প্রচণ্ড সিংহ প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বললেন— আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। যা বলছি তাই করুন।

সেই হুংকার শুনে মন্ত্রীমশাই আর সেনাপতি পড়ি কী মরি ছুট লাগালেন।

উপবর্তন রাজ্যের রাজা দুর্দান্ত সিংহও ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন। তিনিও তাঁর মন্ত্রী আর সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন— মহেন্দ্রনগর থেকে আমাদের গুপ্তচর কী খবর পাঠিয়েছে, তা তো আপনারা জানেন। এক্ষুনি সৈন্য সাজান। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের শালকোঁড়া বনে যেতে হবে। মহেন্দ্রনগরের ওই হতচ্ছাড়া পচা সিঙ্গি শালকোঁড়া বনের ধনভাণ্ডার হাতিয়ে নেওয়ার আগেই আমাদের ওখানে গিয়ে পড়তে হবে।

মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন— আচ্ছা মহারাজ, শালকোঁড়া বনে এত ধনরত্ন এল কোত্থেকে?

রাজামশাই গ্রাম্ভারি চালে বললেন— দেখুন, ওই ধনরত্নের যা বর্ণনা শুনলুম তাতে মনে হয় যে ওসব কোনো সাধারণ লোকের বা ছোটোখাটো রাজাগজার সম্পত্তি নয়। কোনো রাজচক্রবর্তী সম্রাটের কাছেই ওই ধনভাণ্ডার থাকতে পারে।

—কোনো রাজচক্রবর্তী সম্রাটের ধনভাণ্ডার শালকোঁড়া বনে আসতে যাবে কোন দুঃখে, মহারাজ?

—আসতেই পারে। আমার যতদূর জানা আছে, এ ধরনের সম্পদ ছিল পাটলিপুত্রের সম্রাট ধননন্দের কাছে। তাঁর ঐশ্বর্যের কোনো সীমা ছিল না। তাঁর ধনভাণ্ডারে এত স্বর্ণমুদ্রা ছিল যা একজন লোক সারাজীবনেও গুনে উঠতে পারত না। যখন চন্দ্রগুপ্তের কাছে ধননন্দ যুদ্ধে হেরে যান, তখন পালিয়ে যাওয়ার পথে তিনি আর তাঁর পরিজনরা এই অখ্যাত বনে তাঁর ধনরত্নের কিছু অংশ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এই আশায় লুকিয়ে রেখে থাকতেই পারেন।

—অদ্ভুত, মহারাজ, আশ্চর্য আপনার জ্ঞান আর ধীশক্তি!

দুর্দান্ত সিংহ বললেন— হেঁ হেঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আর তাহলে দেরি করবেন না। আপনারা সৈন্যশিবিরে চলে যান।

দুই রাজ্যের সৈন্যদল প্রায় একইসময়ে শালকোঁড়া বনে এসে পৌঁছল। রাজারা আর সেনাপতিরা ঘোড়ার পিঠে, বাকি সৈন্যরা দুপুরের খাওয়াটা না-হওয়ার জন্য ব্যাজার মুখে থপাস-থপাস করতে করতে পেছনে পেছনে এল।

দুর্দান্ত সিংহ বললেন— এ কী, রাজা প্রচণ্ড, তুমি এখানে কী মনে করে?

প্রচণ্ড সিংহ বললেন— আমার রাজ্যের কিছু লোক এই বনে ঢুকেছে। আমি তাদের নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু, তুমি এখানে এই ভরদুপুরে কোন রাজকার্যে এসেছ?

দুর্দান্ত সিংহ আর ভদ্রতা করতে পারলেন না। বললেন— দ্যাখ পচা, মিথ্যে কথা বলা তোর ছোটোবেলাকার স্বভাব। তুই এসেছিস সম্রাট ধননন্দের সম্পদ হস্তগত করতে। ওই সম্পদ আমার, তুই এর এক কণাও পাওয়ার অধিকারী নোস।

—বটে! ওই যে সম্রাট বললি, তার সম্পত্তি তোর আর তাতে আমার কোনো অধিকার নেই, কেন সেটা জানতে পারি কি?

—অবশ্যই। তার কারণ, সম্রাট ধননন্দ আর অজাতশত্রু আমার পূর্বপুরুষ, সেইজন্য।

—দ্যাখ দেঁতো, তুই আর হাসাসনি। তোর ঊর্দ্ধতন চোদ্দোপুরুষে কেউ অমন বিদঘুটে নামওয়ালা সম্রাট ছিলেন, সেকথা শুনলে আমার বেড়ালটাও মুচ্ছো যাবে। এখন ডেঁপোমি না-করে যা বলছি শোন। শালকোঁড়া বনে যা আছে তা আমার। কারণ, আমার রাজ্যের লোকেরা এখানে প্রথম এসেছে। ব্যস, এর ওপরে আর কোনো কথাই হতে পারে না।

—পচা, এটা ভালো হচ্ছে না বলছি। তুই এখান থেকে যাবি, না তোকে মেরে তাড়াতে হবে।

—দেঁতো, তোর আস্পর্দ্ধা কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি, মার না-খেলে তোর বুদ্ধি খোলে না। দেখছি সেই ব্যবস্থাই নিতে হবে।

—ঠিক আছে, তাহলে যুদ্ধই হোক। তাতে যদি রক্তগঙ্গা বয়ে যায়, তাই যাবে।

—ঠিক আছে, যুদ্ধই হোক।

কাছেই একটা বটগাছের ছায়ায় এক সন্ন্যাসীঠাকুর নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। গোলমাল শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। হাই তুলতে তুলতে এসে দুই যুযুধান সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন— কী ব্যাপার? একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার গন্ধ পাচ্ছি যেন?

দুই রাজা সমস্বরে বললেন— আপনি সরে যান, ঠাকুরমশাই। আজ ওই হতচ্ছাড়া মিথ্যেবাদীটার মুণ্ডু যদি না-কেটেছি তো কী বলেছি!

সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন— মুণ্ডু কাটা হবে অখন। আগে শুনি এই যুদ্ধবিগ্রহের কারণটা কী?

দুই রাজার মুখে কারণ শুনে সন্ন্যাসীঠাকুর হাসতে শুরু করলেন। বললেন— কে বলেছে তোমাদের যে শালকোঁড়া বনে সম্রাট ধননন্দের সম্পদ লুকোনো আছে?

দুর্দান্ত সিংহ বললেন— মহেন্দ্রনগর থেকে আমার গুপ্তচর খবর পাঠিয়েছে।

শুনে প্রচণ্ড সিংহ রেগে কাঁই। চিৎকার করে বললেন— কী, আমার রাজ্যে তুই গুপ্তচর লাগিয়েছিস? কে সেই হতভাগা? আজ তারই একদিন কী আমারই একদিন!

সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন— সে পরে দেখা যাবে। আগে বলো দেখি, রাজা প্রচণ্ড সিংহ, তোমাকে এহেন সংবাদটি দিলে কে?

প্রচণ্ড সিংহ ব্যাজার মুখে বললেন— খবরটা এনেছে আমাদের এক সৈন্য। শীতলদিঘি গ্রামের এক মহিলার কাছে সে জানতে পারে যে সেই গ্রামের লোকেরা এই বনে এসেছে এক বিশাল গুপ্তধনের খোঁজে। তারা আবার সংবাদটি পায় অনন্তপুর গ্রামের লোকেদের কাছে।



শুনে সন্ন্যাসীঠাকুর হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়লেন। বললেন— এইরকম একটি উড়ো কথার ভিত্তিতে তোমরা দুই রাজা একেবারে সসৈন্যে যুদ্ধ শুরু করতে চলেছ? বাবা, তোমাদের খুরে-খুরে দণ্ডবৎ।

ঠিক এইসময় দেখা গেল অনন্তপুর গ্রামের লোকেরা হইহই করে একটি সাদা গোরু তাড়াতে তাড়াতে আর পেয়েছি পেয়েছি বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বন থেকে বেরিয়ে আসছে। তারা দুই সৈন্যদলকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে থেমে গেল।

তাদের পেছনে পেছনে শীতলদিঘির লোকেরাও বেরিয়ে এল। তারা জিজ্ঞাসা করল— গুপ্তধন পেয়ে গেছ? কই, দেখি।

শুনে অনন্তপুরের লোকেরা অবাক। বলল— গুপ্তধন? কীসের গুপ্তধন? আমরা তো কেষ্টদার গোরু খুঁজতে গিয়েছিলুম।

—সে কী? তোমাদের গোবিন্দচন্দর যে বললে তোমরা ওখানে বড়ো বড়ো হিরে খুঁজতে গিয়েছিল?

গোবিন্দ হাত-পা ছুঁড়ে বলল— কক্ষনো আমি সেকথা বলিনি। আমি শুধু বলেছি যে আমরা একটা বড়ো সাদা মতন ভীষণ দামি জিনিস খুঁজতে যাচ্ছি। তা, কেষ্টজ্যাঠার গোরুটা কি তাই নয়?

এই কথোপকথন শুনে সন্ন্যাসীঠাকুর হাসতে হাসতে শুয়েই পড়লেন। উবুড় হয়ে পড়ে মাটি থাবড়ান আর বললেন— হো-হো, হা-হা, সম্রাট ধননন্দ থেকে একেবারে গোরু! হায়-হায়, হো-হো, হা-হা!

দেখতে-দেখতে তাঁর সাদা দাড়ি ধুলোয় ধূসর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বাদে হাসি সামলে দাড়ি ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসীঠাকুর। দুই অধোবদন রাজাকে সম্বোধন করে বললেন — হে রাজন্যগণ, তোমরা এবার বাড়ি যাও। গিয়েই আচ্ছা করে মাথায় হুঁকোর জল ঢেলো আর রোজ ব্রাহ্মীশাক সেদ্ধ করে খেও। এতে আর কিছু না-হোক, তোমাদের ঘটে বুদ্ধি একটু বাড়বে।

প্রচণ্ড সিংহ কোনোরকমে লজ্জিত মুখ তুলে বললেন— বুঝলি দেঁতো, একটু ভুল হয়ে গেছিল। তা সে তো মানুষমাত্রেরই হতে পারে। আমি বলি কী, এখন এক কাজ করা যাক। এতটাই যখন এসেছিস, তখন আর একটু কষ্ট করে আমার বাড়িতে চল। তোর সৈন্যরাও চলুক। সবাই মিলে দুপুরের খাওয়াটা ওখানেই সারা যাবে। তোর রানিবউদিও সেদিন বলছিল যে অনেকদিন দাঁতু ঠাকুরপোকে দেখি না।

দুর্দান্ত সিংহ বললেন— তুই যখন বলছিস তখন তো যেতেই হয়। তোর কথা কি আর কোনোদিন ঠেলতে পেরেছি আমি?

দু-পক্ষের সৈন্যদল এই কথা শুনে সহর্ষে দুই রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল।



মৃত্যুঞ্জয় আর জয়ন্ত

কালিন্দী রাজ্যের মহারাজ সুজন সিংহের বরকন্দাজদের প্রধান ছিল মৃত্যুঞ্জয় নায়েক। তার ধ্যানজ্ঞান সব-ই ছিল মহারাজের সেবা করা। আর কোনো দিকেই তার কোনো খেয়াল ছিল না। শহরের একপ্রান্তে তার বাড়ি ছিল। তার স্ত্রী তাদের ছেলে জয়ন্তর জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাই ছেলের দেখাশোনার ভার দূরসম্পর্কের এক বৃদ্ধা বিধবা মাসির ওপর ছেড়ে দিয়ে সে দিনরাত রাজবাড়িতে পড়ে থাকত।

জয়ন্ত তার দশ বছরের জীবনে বাবাকে প্রায় দেখেইনি। তাদের পাড়ায় তার সমবয়সি কোনো বন্ধু ছিল না, তাই সে একা একাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। ঘরের কাজ আর পড়াশুনো সেরে জয়ন্ত সারাদিন আপন মনে মাঠে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, ফুলপাতা তুলে এনে ঘর সাজাত, বৃষ্টিতে ভিজত, রোদে পুড়ত আর পাখিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইত। আকাশ, বাতাস, গাছপালা আর নদীর জল তার গান শুনত।

আর শুনতেন তার ঠাকুমা। যখন সন্ধে গড়িয়ে রাত আসত, তখন আলো আঁধারি দাওয়ায় বসে তিনি তাঁর নাতির গান শুনতে শুনতে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মনিমগ্ন হয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে জয়ন্ত যখন তার বাবার কথা মা-র কথা জিজ্ঞাসা করত, তিনি গোপনে চোখের জল মুছে তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

কখনো সখনো মৃত্যুঞ্জয় যখন বাড়ি আসত, তখন সে তার মাসিকে বলত— দেখো মাসি, জয়ন্ত যেন জঙ্গলের দিকে না-যায়।

তিনি বলতেন— আমি কি আর তোর ছেলের পেছনে দৌড়ে পারি? তোর ছেলের ভার আর কাউকে দে, বাবা। এই বয়সে আমি আর পারছি না।

মৃত্যুঞ্জয় বলত— হবে, হবে, যথাসময়ে সব হবে; বলে রাজবাড়িতে ফিরে যেত। কিন্তু সেইসময় হবার কোনো লক্ষণই দেখা যেত না।

কালিন্দীর সীমানার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা মস্তোবড়ো পাহাড়ি জঙ্গল ছিল। সবাই বলত উত্তরের জঙ্গল। একবার একটা ভয়ংকর রাক্ষস সেখানে কোত্থেকে এসে আশ্রয় নিল। জঙ্গলের ধারেকাছে যারা থাকে, তারা মাঝে মাঝে রক্তজলকরা ভীষণ গর্জন শুনতে পায়। তার ফলে, ভয়ের চোটে তারা সূর্যাস্তের আগেই

যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে শুরু করে দিল। যারা কাঠ কেটে জীবনধারণ করত, তাদের কাজকর্ম শিকেয় উঠল। একবার কয়েক জন ডাকাবুকো কাঠুরিয়া রাক্ষসটাকে মারতে জঙ্গলের ভেতরে চলে গিয়েছিল। তাদের প্রায় কেউই আর ফিরে আসেনি।

কথাটা রাজামশাইয়ের কানে গেল। তিনি ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে যদি কেউ নরখাদক রাক্ষসটাকে মারতে পারে তাহলে সে এক-শো স্বর্ণমুদ্রা পাবে। তাতে অবশ্য লাভ কিছুই হল না।

এই সময়ে রাজামশাইয়ের ছোটোছেলের ভীষণ অসুখ করল। রাজকবিরাজ অনেক ওষুধপত্র দিলেন বটে কিন্তু রাজপুত্রের অসুখ সারা তো দূরস্থান, বরং বেড়েই যেতে লাগল। শেষপর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন— আর আমার কিছু করবার নেই। মনে হচ্ছে, রাজপুত্রের আয়ু আর সাতদিনের বেশি নেই।

রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মহারানি মৃত্যুঞ্জয়কে ডেকে বললেন— তুমি একবার আমার বাপের বাড়ি পুষ্পিতনগরে যেতে পারবে? সেখানে মহর্ষিকে রাজপুত্রের অসুখের কথা সবিস্তারে বলবে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধারের কোনো পথ বলে দিতে পারবেন। তবে, সময় তো আর বেশি নেই আর মহর্ষি যা বিধান দেবেন তার ব্যবস্থা করতে যে কতদিন লাগবে তা তো জানি না। তাই তোমাকে দু-দিনের মধ্যে ফিরে আসতেই হবে। অনেকটা পথ, কাজেই কোথাও দেরি করলে চলবে না। আমি তোমাকে চিনি, মৃত্যুঞ্জয়। আমি জানি, একমাত্র তুমিই একাজ করতে পারবে।

মৃত্যুঞ্জয় বলল— নিশ্চয়ই পারব, মহারানি। আপনি শুধু মহারাজকে বলুন তাঁর নিজের ঘোড়া মাতরিশ্বাকে আমায় দিতে। আমি ঠিক দু-দিনের মধ্যে আপনাকে সংবাদ এনে দেব।

মহারাজ এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলেন। সেইদিনই মৃত্যুঞ্জয়কে পিঠে নিয়ে মাতরিশ্বা প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে গেল পুষ্পিতনগরের দিকে।

দু-দিন শেষ হবার আগেই ফিরে এল মৃত্যুঞ্জয়। তার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, মাতরিশ্বার মুখ দিয়ে যেন ফেনা উঠছে। রাজামশাই তাকে বিশ্রাম নিতে বললেন; কিন্তু কথা না-শুনে সে ছুটতে ছুটতে চলে গেল মহারানির কাছে।

মৃত্যুঞ্জয় বলল যে মহর্ষির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন রাজপুত্রের অসুখের একটাই ওষুধ আছে। উত্তরের জঙ্গলের গভীরে একটি অতি প্রাচীন মহাকালের মন্দির আছে। কে যে সেটা বানিয়েছিল তা কেউ জানে না। বহু বছর ধরে সেটা পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। সেই মন্দিরে যাওয়ার পথটিও অত্যন্ত দুর্গম। তাই, কেউ সেখানে যায় না। একপাশে একটা অত্যন্ত দুর্লভ আকাশপদ্মের গাছ আছে। রোজ সকালে তার একটি ফুল মহাকালের পায়ের কাছে পড়ে। সেই ফুল এনে রাজপুত্রের মাথায় ঠেকালে তার অসুখ সেরে যাবে।

মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত শিকারিদের ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল তারা কেউ সেই মন্দিরের হদিশ জানে না, বা জানলেও না-জানার ভান করছে। তখন ডাকা হল কাঠুরিয়াদের। তাদের মধ্যে কেবল একজনই একটা পাহাড়ের ওপর থেকে মন্দিরটা দেখছে। তার নাম কানাই। কিন্তু সে যা বলল তা শুনে রাজামশাই অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

কানাই বলল সে মন্দিরে যাবার পথটা যে কেবল দুর্গম তাই নয়, সেটা গেছে একটা অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে। সেই গুহার ভেতরেই রাক্ষসটা থাকে। সেটা অতিকায়, অত্যন্ত হিংস্র, প্রচণ্ড শক্তিশালী আর অসম্ভব ধূর্ত। কাঠুরিয়াদের যে দলটি রাক্ষসটাকে মারতে গিয়েছিল, কানাই ছিল সেই দলে। তাকে তারা সবাই মিলে আক্রমণ করেছিল। তাদের সম্মিলিত কুঠারের আঘাতে তার তো কিছুই হল না, বরং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে সমস্ত দলটাকে মেরে ফেলল। একমাত্র কানাই পালিয়ে আসতে পেরেছিল। মহারাজ তাঁর সমস্ত সৈন্যদলও যদি পাঠান, তাহলেও কিন্তু রাক্ষসটা তাদের একজনকেও গুহা পার হতে দেবে না। আর, ওই পথ ছাড়া মন্দিরের কাছে পৌঁছনোর আর কোনো রাস্তাও নেই। পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া হয়তো যায়, কিন্তু তাতে অনেক দিন লেগে যাবে।

রাজামশাই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। অনেকে অনেক প্রস্তাব দিলেন কিন্তু তার একটাও তাঁর পছন্দ হল না। শেষপর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় বলল— মহারাজ, আপনি আর একবার মাতরিশ্বাকে আমায় দিন। আমি আবার মহর্ষির কাছে যাই। তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসটাকে মারার কোনো উপায় বলে দিতে পারবেন। আর তো মোটে পাঁচদিন আছে। আমি ঘুরে এসে তিনি যা করতে বলবেন, তা নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও করবার ব্যবস্থা করে ফেলব।

মহারাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— ঠিক আছে, তাই করো।

দু-দিন পরে মৃত্যুঞ্জয় ফিরে এল। তার বিষণ্ণ মুখ দেখে রাজামশাই উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— খবর কী মৃত্যুঞ্জয়?

মৃত্যুঞ্জয় বলল— খবর ভালো নয়, মহারাজ। মহর্ষি বলেছেন যে রাক্ষসটাকে মারার একটাই উপায় আছে; কিন্তু সেটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

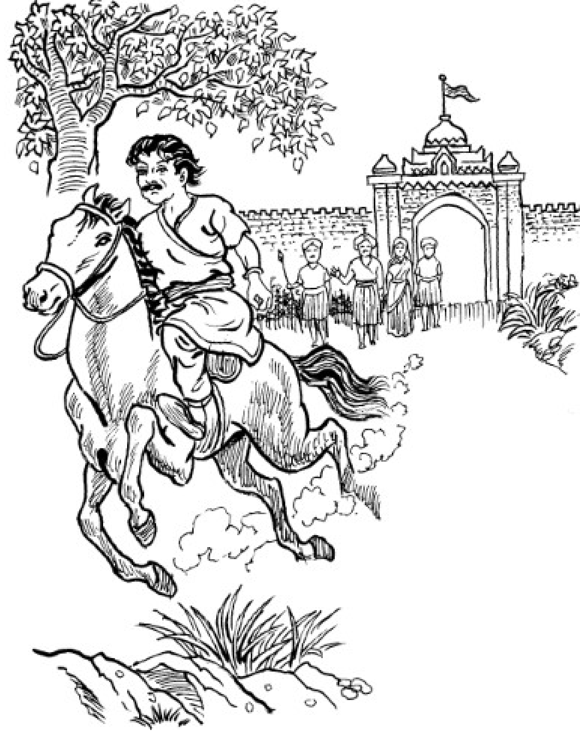
—কী সেই উপায়?

—মহর্ষি বলেছেন যে ওই ধরনের রাক্ষসদের একটাই দুর্বলতা। তারা গান শুনলে জেগে থাকতে পারে না, ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু, সে গানে কোনোরকম ভুলভাল থাকলে চলবে না। যদি সুর ভুল হয় বা ছন্দপতন ঘটে, তাহলে সে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

—বলো কী! এ তো ভয়ানক দুঃসংবাদ। আমার সভা গায়করা সবাই তো ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যায়, ল্যাগব্যাগ করে হাঁটে আর বেড়াল দেখলে ভয় পায়। তারা কখনো রাক্ষসের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইতে পারবে? যাকেই এরকম গান গাইবার কথা বলব, সে তো ভয়েই মরে যাবে।

—আমি তা জানি মহারাজ। কিন্তু, ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি কাল ভোর না-হতেই উত্তরের জঙ্গলে যাব। রাক্ষসটাকে এড়িয়ে মন্দিরে পৌঁছোনোর একটা-না-একটা পথ বের করবই। যদি দেখি যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে রাক্ষসটাকে সরাসরি আক্রমণ করব। সে হয়তো তার প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে আমার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পেরে উঠবে না। আমি একাই যাব যাতে নিঃশব্দে কাজ সারতে পারি।

—সে কিন্তু ভীষণ ধূর্ত। তুমি কি বুঝতে পারছ যে তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছ?



—ধূর্ততায় আমিও কিন্তু কম যাই না, মহারাজ। একটা জংলি রাক্ষসের কাছে বুদ্ধির লড়াই-এ আমি হেরে যাব না। আর, আপনি তো জানেন, আমার মৃত্যু ভয় বলে কিছু নেই।

রাজামশাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন। মৃত্যুঞ্জয় বলল— তাহলে অনুমতি করুন, এখন আমি বাড়ি যাই। আমার মাসি আর ছেলেটাকে একবার দেখে যাই, আমার তিনকুলে শুধু ওই দু-জনই আছে। হয়তো তাদের আর দেখতে পাব না। একটা অনুরোধ, আমি যদি ফিরে না-আসি, তারা যেন একেবারে অর্ধাহারে না থাকে।

রাজামশাই ম্লান হেসে বললেন— তুমি না বললেও তাদের সমস্ত ভারই আমি নিতুম, মৃত্যুঞ্জয়।

অসময়ে মৃত্যুঞ্জয়কে বাড়ি আসতে দেখে তার মাসি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সবকথা শুনে তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। ঠিক তখনই জয়ন্ত এসে বাড়িতে ঢুকল। ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে আর বাবাকে বাড়িতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। চোখ পাকিয়ে বাবাকে বলল— তুমি ঠাকুমাকে বকেছ?

মৃত্যুঞ্জয় জয়ন্তকে কোলে নিয়ে বলল— না বাবা। আমি কাল ভোর বেলা একটা কাজে যাচ্ছি, হয়তো ফিরতে দেরি হবে। তাই তোর ঠাকুমা কাঁদছেন।

জয়ন্ত বলল— আমি সব শুনেছি, বাবা। তুমি রাক্ষস মারতে যাচ্ছ। কালিন্দীর সব্বাই এই কথা আলোচনা করছে। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বলল— তুই যাবি কী করে? বাচ্চারা কি রাক্ষস মারতে পারে? তোকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমার কি সুবিধে হবে, বল? রাক্ষসটা যখন আসবে তখন তোকে বাঁচাব না-সেটার সঙ্গে লড়াই করব?

—ওই রাক্ষসটাকে তুমিও মারতে পারবে না, বাবা। কিন্তু, আমি গেলে তুমি ঠিক একটা আকাশপদ্ম নিয়ে আসতে পারবে।

—বটে? কী করে সেটা সম্ভব হবে?

—প্রথমত খুব তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে ওখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমি রাক্ষসের গুহাটা চিনি। অনেক বার গিয়েছি ওখানে। আগে ওখানে দুটো ভালুক তাদের দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকত। তারা আমার বন্ধু ছিল। রাক্ষসটা এসে তাদের সবাইকে মেরে ফেলে গুহাটা দখল করে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত আমি রাক্ষসটার সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইব। সেই গান শুনে রাক্ষসটা ঘুমিয়ে পড়বে আর তুমি চট করে গিয়ে ফুলটা নিয়ে আসবে।

—তুই গান গাইতে পারিস?

—পারি, বাবা। ভালোই পারি। তুমি ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

একথা বলামাত্র ঠাকুমা হাহাকার করে উঠলেন। বললেন— না-না, ও একদম গান গাইতে পারে না। হায় ভগবান, এ রাজ্যে কী একজনও গাইয়ে নেই? এই দুধের শিশুটাকেই ওখানে যেতে হবে?

জয়ন্ত বলল— আমি দুধের শিশু নই, ঠাকুমা। আমি বড়ো হয়ে গেছি। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ওই রাক্ষসটাকে মারবার জন্য বাবাকে সবরকমভাবে সাহায্য করা আমার কর্তব্য? সে যে আমার বন্ধুদের অকারণে মেরে ফেলেছে। আমি তার প্রতিশোধ যদি সুযোগ পেয়েও না-নিয়ে ভয়ের চোটে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে বসে থাকি, তবে আমি আরও বড়ো হয়ে বাবার মতো সৈনিক হবার যোগ্য হব কী করে? আমি বাবার সঙ্গে যাবই আর ফুল নিয়ে ফিরেও আসব। তুমি কান্নাকাটি কোরো না।

জয়ন্তর কথা শুনে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে জল এল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল— ওই ভয়ংকর রাক্ষসটাকে আসতে দেখলে তুই তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাবি।

—কক্ষনো না। আমার বন্ধুদের কথা যখন ভাবব, তখন কোনো ভয় থাকবে না। তা ছাড়া আমি দূর থেকে রাক্ষসটাকে দেখেছি। আমার ভয় করেনি।

অনেক তর্কবিতর্ক হল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় কিছুতেই ছেলেকে টলাতে পারল না। জীবনে এই প্রথম তাকে হার স্বীকার করতে হল।

ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগেই মৃত্যুঞ্জয় জয়ন্তকে নিয়ে উত্তরের জঙ্গলের দিকে রওনা হল। সঙ্গে নিল অস্ত্রশস্ত্র, পাহাড়ে চড়ার জন্য দড়ি ইত্যাদি। ওরা যখন রাক্ষসের গুহার সামনে এসে পৌঁছল, তখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। কাছাকাছি আসতেই, রাক্ষসটা হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে দেখে জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে স্থির হয়ে গান গাইতে শুরু করে দিল। এ গান সে শিখেছে পাখিদের কাছে, গাছের পাতার মর্মরশব্দে, ঝরনার ঝরঝর আওয়াজে। স্তম্ভিত মৃত্যুঞ্জয় রোমাঞ্চিত হয়ে সেই গান শুনতে লাগল।

রাক্ষসটা হুংকার করে তার অতিকায় শরীর নিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে আসছিল; কিন্তু জয়ন্তর গান শুনে তার গতি ক্রমশ কমে আসতে লাগল। রাগে বিকৃত তার কদাকার মুখটা আস্তে আস্তে কেমন যেন শান্ত হয়ে এল। তার চোখদুটো ঢুলঢুল হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত

জয়ন্তর প্রায় পায়ের কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ে হাসিহাসি মুখে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করে দিল।

জয়ন্ত গান থামাল না, হাতের ইশারায় মৃত্যুঞ্জয়কে ফুল আনতে যেতে বলল। মৃত্যুঞ্জয় একদৌড়ে গুহার ভেতরে ঢুকে গেল আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশপদ্মের অপূর্ব একটা ফুল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ফুলটা ছেলের হাতে দিয়ে পাহাড়ে চড়ার দড়ি দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় রাক্ষসটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল, যাতে গান থামার পরে তার উঠে দাঁড়াতে একটু সময় লাগে আর এই সময়ের মধ্যেই তারা যাতে যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যেতে পারে। রাক্ষসটা কিন্তু একটুও বাধা দিল না। জয়ন্তর গান চলতে থাকল আর সে ঘুমিয়েই রইল।

এদিকে মৃত্যুঞ্জয়কে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে রাজামশাই আর রানিমা সারারাত ঘুমোতে পারেননি। মনের কষ্টে আর বিবেকের দংশনে দু-জনে ছটফট করেছেন। কাজেই, ভোর হওয়ামাত্র রাজামশাই সসৈন্যে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে সবাই মিলে উত্তরের জঙ্গলে যাবেন, কিন্তু এসে যা শুনলেন তাতে তো রাজামশাই স্তম্ভিত। তার মাসিকে বললেন— আপনি ভাববেন না। আমরা যাচ্ছি, আপনার বোনপো আর নাতিকে উদ্ধার করে আনবই। তারপরে, একটা ওইটুকু বাচ্চা ছেলেকে অমন বিপদের মুখে নিয়ে যাবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে খুব শাস্তি দেব।

মাসি বললেন— না, না, মৃত্যুঞ্জয় ওকে নিয়ে যেতে চায়নি। অনেক বাধা দিয়েছিল। কিন্তু আমার নাতি কোনো কথাই শোনেনি।

—সে দেখা যাবে। বলে, রাজামশাই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে পেছনে গেল তাঁর সৈন্যদল।

রাক্ষসের গুহাটার কাছাকাছি আসতেই, রাজামশাই একটা অপূর্ব গান শুনতে পেলেন। তিনি ইশারায় সৈন্যদের কোনোরকম শব্দ করতে বারণ করে ঘোড়া থেকে নেমে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, ফুল হাতে নিয়ে জয়ন্ত নির্ভীক গলায় গান গাইছে আর মৃত্যুঞ্জয় দড়ি দিয়ে রাক্ষসটাকে বেঁধে ফেলছে।

বাঁধা যখন হয়ে গেল, রাজামশাই নিঃশব্দে সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে এলেন। ইশারায় জয়ন্তকে গান চালিয়ে যেতে বললেন আর ওইভাবেই সৈন্যদের বললেন, রাক্ষসটাকে কাছেই একটা খাদের কাছে টেনে নিয়ে যেতে। খাদটা অত্যন্ত গভীর, অনেক নীচে বয়ে যাওয়া বিশাল নীলাম্বরী নদীটিকে সূর্যের আলোয় একটা চকচকে সরু রুপোলি সুতো বলে মনে হচ্ছিল।

রাজামশাইয়ের আদেশে সৈন্যরা সবাই মিলে রাক্ষসটাকে ছুড়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিল।

বাবার কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরছিল জয়ন্ত। বলছিল— জানো তো বাবা, রাজামশাই বললেন যে আমি বড়ো হলে তিনি আমাকে তাঁর দেহরক্ষী সৈন্যদলে ভরতি করে নেবেন। আমার কিন্তু এখনই বড়ো হয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে। এখান থেকে আমি কত দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। তুমি যখন রাজবাড়িতে চলে যাবে, আর আমি কষ্ট পাব না। আমি কেবল নিজেকে তোমার মতো বীর সৈনিক হবার জন্য তৈরি করব।

মৃত্যুঞ্জয় জয়ন্তর পা দুটো শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল— না বাবা, আর আমি তোমাকে কষ্ট দেব না। এখন থেকে আমি রোজ বাড়ি চলে আসব আর রাত্রি বেলা তোমার গান শুনব।



রাজকন্যা স্বর্ণরেণু সকাল বেলা চিন্তিত আর বিষণ্ণ মুখে রাজবাড়ির বাগানে পায়চারি করছিল আর মাঝে মাঝে এক একটা ফুলগাছ থেকে ফুল তুলে তার পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলছিল। তার মুখ দেখে বেশ বোঝাই যাচ্ছিল যে সে কোনো কারণে মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছে।

এইসময় সেনাপতি প্রদ্যুম্ন বাগানের পাশ দিয়ে রাজবাড়িতে যাচ্ছিলেন। প্রদ্যুম্নের বয়েস বেশি নয় কিন্তু বীরত্ব, সাহস আর তীক্ষ্ন বুদ্ধির জন্যে তাঁর খুব সুনাম। তাঁর বাবা দুর্মদ সিংহও ছিলেন মহাবীর আর এ রাজ্যের সেনাপতি। তিনি রাজামশায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। সেইজন্য দুর্মদ সিংহ অবসর নিলে, রাজামশাই প্রদ্যুম্নকেই সেনাপতি পদে বরণ করে নিয়েছেন।

স্বর্ণরেণুকে দেখে প্রদ্যুম্ন দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন— কী রে রেণু, এই সাতসকালে এমন হাঁড়িপানা মুখ করে আছিস কেন রে? রানিমা বকেছেন, না কাল একগাদা কুল খেয়েছিস, তাই পেট কামড়াচ্ছে? নইলে, চারদিকে এত ফুল ফুটেছে, পাখি-টাখি ডাকছে, এখন তো তোর চিত্ত প্রফুল্ল হবার কথা।

রাজকন্যা চোখ পাকিয়ে বললেন— তুমি থামো-তো প্রদ্যুম্নদা। পাখি কেন, হাতি ডাকলেও আমার চিত্ত আর কোনোদিন প্রফুল্ল হবে না, বুঝলে?

—বটে? তবে তো ব্যাপার খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। কী হয়েছে বলবি?

স্বর্ণরেণু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে— দেখো না, প্রদ্যুম্ন দাদা, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন।

প্রদ্যুম্ন পুলকিত হয়ে বললেন— সে তো খুব ভালো কথা রে। তোর নিশ্চয়ই কোনো রাজার সঙ্গে বিয়ে হবে। ব্যস, অমনি তুই রাজকন্যে থেকে একলাফে রাজরানি হয়ে যাবি। তখন আর সারাদিন আমাদের রানিমার কথামতো চলতে হবে না, এই ঠান্ডায় সকাল-সন্ধে চন্দন মেখে পদ্ম ফুলের পাপড়ি ভেজানো জলে চান করতে হবে না, যত খুশি কুল আর লঙ্কার আচার খেতে পারবি। আর তোর বিয়েতে আমরাও কবজি ডুবিয়ে খাব। আর

চারদিন নেমন্তন্ন তো হবেই বল, তাই না? অনেক দিন রাজবাড়িতে পাত পেড়ে খাওয়া হয়নি।

—তুমি চুপ করবে? তোমার খালি খাওয়ার চিন্তা। তুমি জানো, কার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে? চূড়ামণি রাজ্যের রাজা গজগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে। মা কাল থেকে অনবরত কেঁদে যাচ্ছে।

এইবার প্রদ্যুম্নের হাসি শুকিয়ে গেল। বললেন— গজগোবিন্দ? বলিস কী রে? সে ব্যাটার তো তিনটে রানি বর্তমান; আরও একটা চাই? লোকটার ধামার মতো পেট, মুখ ভরতি জঙ্গুলে দাড়িগোঁফ, বয়েসের কোনো গাছপাথর নেই, তার সঙ্গে তোর বিয়ে? কী হয়েছে আমাদের রাজামশায়ের?

—কী হয়েছে? বলিদান দিচ্ছেন মেয়েকে, বলিদান! তাঁর কাছে প্রজাদের মঙ্গল মেয়ের মঙ্গলের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো।

—খুলে বল।

—গজগোবিন্দ বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বলেছে বিয়ে না-দিলে সসৈন্যে এসে আমাদের রাজ্য ছারখার করে দেবে।

শুনে প্রদ্যুম্ন অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন— গজার সৈন্যেরা আমাদের রাজ্য ছারখার করে দেবে? সেদিন তো সূর্য সন্ধে বেলা পশ্চিম দিকে উঠবে। অন্য কেউ না-হোক, ওরা আমাদের আক্রমণ করলে হেরে ভূত হয়ে তো যাবেই, ওদের একজনও চূড়ামণিতে হেঁটে ফিরে যাবে না, হামাগুড়ি দিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত দেখবি গজাব্যাটা রাজামশায়ের শোবার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

—তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?

—নিশ্চিত হব না? ওদের সেনাপতি কে জানিস? আমাদের উত্তর দিকে একটা রাজ্য আছে, তার নাম কাঞ্চনপুরী। তার রাজার ছোটো ভাইয়ের ছেলে, নাম অচলাদ্রি। একেবারে সার্থকনামা। পাহাড়ের মতোই অচল, ওকে নড়ায় কার সাধ্যি। ওর দিদিই তো গজার মেজোরানি। যেমন রাজা তার তেমনি সেনাপতি। ওকে তোর মনে নেই?

—না তো। কে অচলাদ্রি?

—তোর অবশ্যি মনে না থাকারই কথা। তুই যে বছর থেকে তপোবন গুরুগৃহে যেতে শুরু করলি, আমি আর অচল তো সেই বছরেই কৌশাম্বীতে চলে গেলুম যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। অচল ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গবেট, হাঁদাস্য হাঁদা। চার বছরেও কোদণ্ড আর কার্মুকের পার্থক্যই শিখে উঠতে পারল না। একটা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ওকে দেখলেই আমাদের গুরুমশায়ের শিখা খাড়া হয়ে যেত, চোখ লাল করে চিৎকার করতে শুরু করতেন। শেষপর্যন্ত আর পারলেন না, ওকে বিদ্যাশ্রম থেকে বেরই করে দিলেন। তখন দিদিকে ধরে গজার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হয়ে গেল। ও একটা অস্ত্রই চালাতে পারে, সেটা হল বাঁটুল বা গুলতি।

স্বর্ণরেণু চিন্তিত হয়ে বলল— কিন্তু বাবা বোধ হয় এসব কথা জানেন না। তুমি একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখো-না, প্রদ্যুম্ন দাদা। উনি তোমার কথা খুব মানেন। পারলে তুমিই পারবে। তোমার মনে নেই, ছেলেবেলায় তুমি আমার নাগালের বাইরে থাকা আম বা পেয়ারা পেড়ে দিতে? সেই রকম।

প্রদ্যুম্ন বললেন— রাজামশায়ের সঙ্গে আমি এখনই গিয়ে কথা বলছি। তুই এখানেই থাক, আমি এসে তোকে কথাবার্তা কী হল তা জানাচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে প্রদ্যুম্ন রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। উদবিগ্ন স্বর্ণরেণু এগিয়ে এসে বলল— কী কথা হল, প্রদ্যুম্ন দাদা? তোমাকে এমন গম্ভীর আর চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

প্রদ্যুম্ন বললেন— দ্যাখ, ব্যাপারটা যতটা সহজ ভেবেছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। ঘটনাটা হল, গজা রাজামশায়ের কাছে তুই যেমন বলেছিলি সেরকমই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তুই তো জানিস, আমাদের রাজামশাই যেমন মহাবীর আবার তেমনি দয়ালু আর শান্তিপ্রিয় মানুষ। উনি যুদ্ধ একেবারেই পছন্দ করেন না বরং ঘৃণা করেন। তাই উনি ভাবলেন তুই স্বয়ংবরা হতে চাস বললে গজা পেছিয়ে যাবে আর কোনো গণ্ডগোল হবে না। কারণ, ও অন্তত এটুকু বোঝে যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের রাজকন্যা ওর গলায় স্বেচ্ছায় মালা দেবে না। কিন্তু, সেই প্রস্তাবটা শোনার পরে এখন ও একটা নতুন চাল চেলে বসেছে। ও বলে পাঠিয়েছে যে ওর কাছে না কি একটা ধনু আছে যেটা ও ছাড়া আর কেউ তুলতে পারে না। ওই ধনুটা না কি রাবণ রাজার ধনু। রাম-রাবণের যুদ্ধের পর সেটা বিভীষণের হাতে যায়। বিভীষণ সেটা নিয়ে হিমালয়ে চলে যান তপস্যা করতে। গজা যখন হিমালয়ে গিয়েছিল তীর্থ করতে তখন সেখানে ওর সঙ্গে বিভীষণের দেখা হয়। তা, বিভীষণ না কি গজাকে দেখে এতই পছন্দ করে ফেলেন যে তাকে ধনুটা উপহার দিয়ে দেন।

—বাবা এই আষাঢ়ে গল্পটা বিশ্বাস করলেন? এতদিন ধরে বিভীষণ টিকে থাকতে পারেন কখনো?

—শাস্ত্রমতে কিন্তু থাকবারই কথা। রামচন্দ্রের বরে বিভীষণ তো অমর। কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা তো হতেই পারে। আর তাঁর তো গজাকে পছন্দ হবেই। ওকে দেখে তাঁর নিশ্চয়ই দাদার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, অমন রাক্ষুসে চেহারা তো মানুষের মধ্যে সচরাচর নজরে পড়ে না। তাই ভালোবেসে দাদার ধনুটা ওকেই দিয়ে দিয়েছেন।

—তোমার রসিকতা রাখো তো। এই ধনুর সঙ্গে স্বয়ংবরের কী সম্পর্ক?

—গজা বলেছে যে স্বয়ংবর হোক, কিন্তু তাতে একটা শর্ত থাকতে হবে। ওই ধনু নিয়ে গজা এখানে আসবে। স্বয়ংবর সভায় যে ওই ধনু তুলতে পারবে, তোকে তার গলায় মালা দিতে হবে। অনেকটা সীতার স্বয়ংবরের মতন আর কী! বোঝাই যাচ্ছে, ওটা গজা ছাড়া আর কেউ তুলতে পারবে না। তাহলে স্বয়ংবর সভায় তোকে ওর গলায় মালা দিতেই হবে আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ হবে যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক হল রাজা গজগোবিন্দ।

—তুমি বাবাকে ওই রাজাটির সৈন্যদল আর তার সেনাপতির কথা বলোনি?

প্রদ্যুম্ন হাত নেড়ে বললেন— বলিনি আবার? কিন্তু রাজামশাই কিছুতেই যুদ্ধ করতে রাজি নন। বললেন, যুদ্ধে হার-জিত যারই হোক না-কেন, কিছু সৈন্যের তো মৃত্যু হবেই। আমার ব্যক্তিগত সমস্যায় তারা কেন প্রাণ দেবে? তাদের পরিবার পরিজনকে আমি কী সান্ত্বনা দেব? তারা যে আমার প্রজা, আমার সন্তান। আমার মেয়ের সুখের জন্যে আমি এতজনের সুখ আর আনন্দ সারা জীবনের মতো কেড়ে নিতে পারি? ভারতবর্ষের কত রাজারই তো একাধিক স্ত্রী। তাঁরা সবাই যদি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন তো আমার

মেয়ে পারবে না কেন? কী জানিস রেণু, তোর বাবার কথা শুনতে শুনতে আমার তাঁর ওপরে রাগ আর শ্রদ্ধা দুটোই হচ্ছিল। আমি সৈনিক, যুদ্ধই আমার পেশা। তাই, যুদ্ধ যে কী একটা অর্থহীন জঘন্য ব্যাপার তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। তাই, ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে যাচ্ছিল। তবু রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে, এ যুগে তোর বাবার মতো একজন নির্লোভ আদর্শবান মানুষ জন্মান কেন? ওঁর কথায় আমাদের নিজেদের খুব খারাপ ধরনের অমানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

—তাহলে কী হবে, প্রদ্যুম্ন দাদা?

—কী আবার হবে? স্বয়ংবর হবে।

স্বর্ণরেণু চেঁচিয়ে উঠল— স্বয়ংবর হবে? তার মানে আমাকে ওই রাক্ষসটাকে বিয়ে করতে হবে?

প্রদ্যুম্ন আবার হাত নেড়ে বললেন— আহা, স্বয়ংবর হবে মানেই যে তোকে গজাকে বিয়ে করতে হবে তা তো নয়।

—কী বলতে চাইছ তুমি?

—শোন, এই ধনু-তোলা ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা চালাকি আছে, সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। গজা আর যাই হোক রামচন্দ্র নয়। যে ধনু কেউ তুলতে পারে না, সেটা ও তুলবে, একথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। ওর বিশাল ভুঁড়ি দেখলে কেউ তা করবেও না। আমি স্বয়ংবর সভায় ওর সেই মিথ্যাচারটা ধরে ফেলতে পারব বলে মনে করি। গজা এমন বুদ্ধিমান নয় যে, ওর কূটকৌশল আমি ধরতে পারব না। তাহলে ওর বিবাহ করার আশা তো যাবেই, নাকটা মাটিতে ঘষে যাবে সমস্ত রাজাদের সামনে।

—ব্যাপারটা তো ইন্দ্রজালও হতে পারে, কিংবা মন্ত্রশক্তি? সেক্ষেত্রে তুমি কিছু করতে পারবে কী?

—চুপ কর। আজকের যুগে ওসব ইন্দ্রজাল বা মন্ত্রশক্তিতে কেউ আবার বিশ্বাস করে না কি? ওসব মানুষের তৈরি ধাঁধা, লোক ঠকানোর জন্যে। এ ব্যাপারে আমি চার্বাক ঋষিদের কথাই মেনে চলি। তুই চুপচাপ থাক-তো। দেখ না, যদি রহস্যটা ধরতে নাও পারি, এমন একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দেব যে সব ভেস্তে যাবে। তারপরে কী হয়, সেটা তখন দেখা যাবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিলেই হবে।

—এরকম গণ্ডগোল বাবা পছন্দ করবেন কি? উনি কিন্তু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন।

—মনে হয় না। ওঁর মুখ দেখলে সন্দেহ থাকে না যে উনিও মনে মনে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। এরকম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলে উনি যতটা অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত ততটা হয়তো হবেন না। তুই যাই বলিস না কেন, নিজের নীতিবোধের কাছে আসলে উনি নিজেকেই বলি দিচ্ছেন। সেটা তুই বুঝতে পারছিস না। সত্যি, আশ্চর্য মানুষ এই আমাদের রাজামশাই।

—আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে, প্রদ্যুম্ন দাদা।

—আবার বলে ভয় করছে। বলেছি না যে ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দে। তোকে আম আর পেয়ারা পেড়ে দিয়েছি আর এই কাজটা করতে পারব না?

স্বয়ংবরের দিন এসে গেল। রাজধানী পতাকা আর ফুলের স্তবকে সাজানো হয়েছে। পথগুলি জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, তার ওপরে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাশ্রমগুলিতে অনধ্যয়ন বা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছেলে মেয়েরা বাসন্তী আর লাল রঙের কাপড় পড়ে, মাথায় নানা রকমের ফুলের অলংকার পরে হো হো করছে। স্বয়ংবর সভার জন্যে রাজবাড়ির পাশেই সুদৃশ্য বিশাল মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। সেখানে ভোর না-হতেই উৎসবের সংগীত বেজে উঠেছে। রাজপথের দু-ধারে শিরস্ত্রাণ পরে সৈন্যদল সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভ্যাগত রাজাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। তাঁদের দেখবার জন্যে রাজপথের দু-ধারে সমস্ত বাড়ির ছাদে ভিড় করে উত্তেজিত পুর নারীরা কলরব করছেন।

একটু পরেই ডঙ্কা আর শিঙ্গা বেজে উঠল। রাজাদের ফুল আর পতাকায় সাজানো রথগুলি একের পর এক রাজপথে এসে ঢুকল। প্রত্যেক রাজার রথ ঘিরে পায়ে পা মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত শূলধারী দেহরক্ষীদল সগর্বে এগিয়ে এল। তাদের আগে আগে খোলা তলোয়ার হাতে প্রধান দেহরক্ষী চিৎকার করে তার রাজার নাম আর গুণাবলি ঘোষণা করতে করতে চলল। যেমন— সুপর্ণ রাজ্যের মহারাজ মহাবীর জয়লক্ষ্মীর বরপুত্র মহাধনুর্ধর মহারথ পরমকান্তিমান শ্রীমান ক্ষেমধর্মা আসছে-এ-এন। রথগুলি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বাড়িগুলির ছাদে ছাদে কোন রাজার ভাগ্যে বরমাল্য জুটতে পারে, তাই নিয়ে পুর নারীদের প্রবল আলোচনা চলতে লাগল।

সবশেষে এল চূড়ামণি রাজ্যের রাজা গজগোবিন্দের রথ। রথের ভেতরে সুখাসনে বসে তিনি খুব অহংকৃত মুখে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন বটে, কিন্তু তাঁকে দেখে নাগরিকদের আলোচনাটা কেমন যেন থিতিয়ে গেল।

গজগোবিন্দের রথের পেছনে পেছনে এল একটা গোরুর গাড়ি। তার ওপরে রাখা মস্ত একটি জটিল কারুকার্য করা কাঠের পেটিকা। সেটার মধ্যেই না কি রাবণ রাজার ধনুটা থাকে। এসেছে চূড়ামণি থেকে রাজা গজগোবিন্দের সঙ্গে। ওটা কখনো কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না, তবে এখন স্বয়ংবর উপলক্ষ্যে সবাইকে দেখাবার জন্যে সেটা পেটিকাটার ওপরে রাখা আছে।

পেটিকাটি লম্বায় প্রায় পাঁচহাত, চওড়ায় আর উচ্চতায় দু-হাত। তার ওপরে পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা আছে একটি ধনু। সেটি লম্বায় চারহাত, মাঝখানে যেটা মুষ্টি বা ধরবার জায়গা সেটা কালো শিঙের, বাকিটা সাদা কাঠের। ধনুটা কিন্তু খুবই সাধারণ, দেখলে নতুন বলেই মনে হয়, পুরাকালের বলে একেবারেই মনে হয় না। সবাই কৌতূহল নিয়ে সেটা দেখল বটে কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করল না। গজগোবিন্দকে দেখে সকলেই যেন বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। এবার একে একে দর্শকদের সবাই যে যার কাজে চলে গেল।

মণ্ডপের ভেতরে রাজারা অর্ধচন্দ্রের আকারে সাজানো আরামপ্রদ আসনগুলিতে বসেছেন। তাঁদের পাশে নিমন্ত্রিত অতিথিদের বসবার জায়গা। মণ্ডপের ওপরে প্রকাণ্ড কারুকার্য করা চন্দ্রাতপ, নীচে কাশ্মীরের মোটা রাজাস্তরণ। তাঁদের সামনে অসংখ্য পুষ্পস্তবকে সাজানো বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা। সেখানে কিছুটা দূরে পেটিকার ওপরে ধনুটা রাখা আছে। সেটা পাহারা দেবার জন্যে তার একপাশে সেনাপতি প্রদ্যুম্ন আর অন্যপাশে স্বর্ণরেণুর মামা রাজা অনঙ্গদেব খোলা তলোয়ার হাতে স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রদ্যুম্নের মুখ অভিব্যক্তিহীন কিন্তু তাঁর তীব্র আর চঞ্চল দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় যে তাঁর মনের ভেতরে কোনো একটা চিন্তা প্রবলভাবে কাজ করে চলেছে।

এদিকে সৈন্যরা সমস্ত মণ্ডপটি ঘিরে রেখেছে যাতে অনিমন্ত্রিত কেউ ঢুকে পড়তে না পারে। তাদের পেছনে কৌতূহলী জনতা উঁকিঝুঁকি মারছে আর উত্তেজিত আলোচনা করছে। রাজারাও নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। ফলে উৎসব সংগীত ছাপিয়ে মণ্ডপের ভেতরে বেশ একটা গুন গুন করে গুঞ্জন চলছিল।

হঠাৎ দামামা বেজে উঠল। একজন ঘোষক মণ্ডপে ঢুকে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করলেন— আমাদের মহারাজা তাঁর কন্যা রাজকুমারী স্বর্ণরেণু সমভিব্যাহারে আসছেন।

সঙ্গেসঙ্গে গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল। সবাই উৎসুক চোখে রাজপুরীর দিক থেকে মণ্ডপে ঢোকার প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাজামশায়ের পাশে পাশে রাজকন্যা স্বর্ণরেণু সভায় ঢুকলেন। তাঁদের পেছনে পেছনে এল রাজকন্যার সখীরা আর রাজামশায়ের দেহরক্ষীরা। সালঙ্কারা স্বর্ণরেণুর পরনে লাল চিনাংশুক, হাতে সাদাফুলের মোটা স্বয়ংবরের মালা। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। সবাই নির্বাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলেন।

রাজামশাই নিস্তব্ধ সভার মাঝখানে এসে তিনবার উচ্চকণ্ঠে বললেন— এই আমার একমাত্র মেয়ে স্বর্ণরেণু। আজ তার স্বয়ংবর অনুষ্ঠিত হবে। এই যে ধনুটি এখানে রাখা আছে, এটি এই সভায় উপস্থিত যিনি পেটিকার ওপর থেকে প্রথম তুলে ধরতে পারবেন, স্বর্ণরেণু তাঁর গলায় মালা দেবেন।

এই ঘোষণা করে রাজামশাই মেয়েকে নিয়ে পেটিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রদ্যুম্ন সামনে দিকে তাকিয়ে খুব নীচু গলায় বললেন— ভয় পাসনি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা স্বর্ণরেণু আর রাজামশাই, দু-জনেরই কানে গেল। কিন্তু দু-জনেই চুপ করে রইলেন। রাজামশাইয়ের মুখটা গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে রইল।

এইবার একজন একজন করে রাজারা আসন থেকে উঠে হাসতে হাসতে পেটিকার দিকে আসতে লাগলেন। সঙ্গেসঙ্গে ঘোষক ঘোষণা করতে লাগল— এইবার চিত্রগঙ্গা রাজ্যের মহারাজ কীর্তিধর আসছেন। এইবার রজতগিরি রাজ্যের রাজকুমার অগ্নিদেব আসছেন। ইত্যাদি।

হাসতে হাসতে আসছেন তো বটে, তবে একটু পরেই মাথা নীচু করে ফিরেও যাচ্ছেন। রোগা-মোটা-বেঁটে লম্বা সব রাজারাই দু-হাতে ধনুটা ধরে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে অনেক টানাটানি করেও একচুল নড়াতে পারলেন না।

সবশেষে এলেন গজগোবিন্দ। বিরাট ভুঁড়ি দুলিয়ে থপ থপ করতে করতে ধনুটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দু-হাত ঘষে চারবার তালি দিলেন। তারপর, কোনোরকমে সামনে ঝুঁকে এক হাতে ধরে ধনুটা তুলে ধরলেন। সেটা মাথার ওপরে তুলে বিজয়গর্বে সকলের দিকে তাকালেন। তারপর খুব সন্তর্পণে ধনুটা যথাস্থানে রেখে বিজয়গর্বে দু-বার হাততালি দিয়ে দাঁড়িগোঁফের ভেতর দিয়ে দন্তবিকাশ করতে করতে স্বর্ণরেণুর দিকে এগিয়ে গেলেন। সমস্ত সভা স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

ঠিক তখুনি প্রদ্যুম্নর হুংকার শোনা গেল— একটু দাঁড়ান, রাজা গজগোবিন্দ। আপনার এই ধনু তোলবার ব্যাপারটা একটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এক্ষুণি সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি আর প্রমাণ করে দিচ্ছি যে আপনি এই স্বয়ংবর সভায় সমবেত সকলকে অন্যায়ভাবে প্রতারণা করেছেন।

গজগোবিন্দ দাঁড়িয়ে গিয়ে নাক কুঁচকে বললেন— এই কথা বলবার তুমি কে হে? তুমি তো একজন সামান্য সৈনিক। তুমি তো রাজা নও। এই প্রশ্ন তুলতে পারেন একমাত্র

রাজারা। তোমার তো তোলবার অধিকার নেই।

—কে বলেছে আপনাকে যে অধিকার নেই? আমাদের রাজামশাই তো একবারও বলেননি যে এই স্বয়ংবর অনুষ্ঠান শুধু রাজাদের। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে এখানে উপস্থিত যে-কেউ এতে অংশ নিতে পারে। আমার মতে একজন সামান্য সৈনিকও পারে। কাজেই এই স্বয়ংবরে কেউ দুর্নীতির আশ্রয় নিলে, সেই অন্যায় কাজ প্রকাশ করে দেবার অধিকার এখানে সকলেরই আছে।

বলামাত্র সভার বাইরে সমবেত প্রজারা আর গজগোবিন্দের শত্রুপক্ষের রাজারা সমস্বরে বলে উঠলেন— ঠিক ঠিক, একদম ঠিক কথা।

রাজারা বললেন— তুমি এগিয়ে যাও তো। আমরা জানতে চাই রাজা গজগোবিন্দ আমাদের বোকা বানিয়েছেন কিনা।

গজগোবিন্দ পূর্ববৎ নাক কুঁচকে বললেন— ঠিক আছে। দ্যাখো, আমি কোনো অন্যায় করেছি কি না। তবে, যদি কিছু প্রমাণ করতে না পারো, তাহলে আমি তোমাদের রাজামশাইকে বলে তোমার মুণ্ডু কাটার ব্যবস্থা করব। এই কথাটা মনে রেখো।

প্রদ্যুম্ন সহাস্যে বললেন— মনে রাখব, রাজা গজগোবিন্দ।

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়পদে ধনুটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তীব্র দৃষ্টিতে ধনুটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পর পর চারটে তালি দিলেন। তৎক্ষণাৎ গজগোবিন্দ চিৎকার করে উঠলেন — অ্যাই, অ্যাই, হাততালি দিচ্ছ কেন? হাততালি দেবে না, বলে দিচ্ছি।

প্রদ্যুম্ন গজগোবিন্দের কথায় কর্ণপাতও করলেন না। জোরে জোরে বললেন— ধনুটা একটু নড়েছে।

বলে একহাতে ধনুটা ধরে টেনে মাথার ওপরে তুলে ধরলেন। রাজাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন— এটা অত্যন্ত হালকা। একটা বাচ্চা ছেলেও এটা তুলতে পারে। আমার কখনোই সন্দেহ ছিল না যে গজগোবিন্দ আর যেই হন, মহাবীর নন। তিনি একটা প্রতারক। গজগোবিন্দের রামচন্দ্র হবার বাসনা হয়েছিল, যদিও তিনি তাঁর পায়ের নখেরও যোগ্য নন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইঁদুরের গোঁফ গজালে সে সিংহ হয় না।

একজন রাজা চিৎকার করে বললেন— গজগোবিন্দ ইন্দ্রজাল বা তান্ত্রিক মন্ত্র অবলম্বন করে আমাদের প্রতারণা করেছেন।

প্রদ্যুম্ন বললেন— না, ইন্দ্রজালে আমি বিশ্বাস করি না, তন্ত্রমন্ত্রে তো নয়-ই। এটা সোজাসুজি প্রতারণা। কীভাবে উনি এটা করলেন সেটাও এখুনি বের করে দিচ্ছি।

বলে প্রদ্যুম্ন খুব ভালো করে ধনুটা পরীক্ষা করলেন। তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তারপরে পেটিকাটা খুঁটিয়ে দেখলেন। এবার রাজাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন — দেখুন, এই ধনুর মাঝখানে মুঠো করে ধরবার জায়গা দু-পাশে দুটো ছোট্ট ছোট্ট লোহার পাত লাগানো আছে। দেখলে মনে হবে যে ধনুর্ধরের হাতের মুঠো যাতে পিছলে না যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই পাত দুটোর ডগায় একটা করে ছোটো ছিদ্র করা আছে। এবার দেখুন, এই পেটিকার ওপরে কারুকার্যের ভেতরে দুটো ছোটো ছিদ্র করা আছে যার ভেতর দিয়ে এই পাত দুটো গলে পেটিকার ভেতরে ঢুকে যাবে যদি সাবধানে ধনুটা এর ওপরে রাখা যায়। এখন যদি পেটিকার ভেতর থেকে এই দুটো ছিদ্রের ভেতরে একটা লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওপর থেকে সহস্রবার টানলেও ধনুটা ওঠানো যাবে না।

রাজারা প্রশ্ন করলেন— তাহলে কি পেটিকার ভেতরে কোনো যন্ত্র রাখা আছে?

প্রদ্যুম্ন বললেন— দেখছি।

বলে পেটিকার ওপরের ভারী ডালাটা টেনে সরিয়ে দিলেন। দেখা গেল, ভেতরে একটা বেঁটে লোক লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। প্রদ্যুম্ন তাকে চুল ধরে টেনে তুলে বের করে আনলেন। এক চড় মেরে বললেন— কে তুই? ওখানে কী করছিলি?

লোকটা হাউমাউ করে বলল— আমি ছিদাম। আমি তো শলাকা পরাচ্ছিলুম।

—বটে? কে তোকে শলাকা পরাতে বলেছিল?

—আমাদের মহারাজ গজগোবিন্দ। আমাকে বললেন যে চারবার হাততালি শুনলে আমি যেন শলাকাটা ছ্যাঁদার ভেতর থেকে বের করে নি আর দু-বার হাততালি শুনলে আবার সেখানে ঢুকিয়ে দি।

তখন সভার ভেতরে-বাইরে ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। গজগোবিন্দের পক্ষের রাজারা চিৎকার করে বললেন যে যুদ্ধে আর বিবাহে প্রতারণা করলে দোষ হয় না। বিপক্ষের রাজারা ততোধিক গলা ফাটিয়ে বললেন, বাজে কথা। যেকোনো অবস্থাতেই প্রতারণা অপরাধ এবং প্রতারককে শাস্তি পেতেই হবে।

এদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রজারা এক এক পক্ষকে সমর্থন করে চিৎকার করতে লাগল। তারা এমন হুড়োহুড়ি লাগাল যে তাদের মণ্ডপের বাইরে রাখতে সৈন্যরা গলদঘর্ম হয়ে উঠল। গোলমালে কান পাতা দায় হয়ে উঠল।

তা, ক্ষত্রিয়রা তো বেশিক্ষণ তর্কাতর্কি করতে পারেন না। একটু পরেই সড়াক সড়াক করে কোষ থেকে তরোয়াল বেরিয়ে এল আর চোখের পলকে দু-পক্ষে প্রবল অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সবাই মণ্ডপের ফাঁকা জায়গাটায় নেমে এলেন। খানিক বাদে কে যে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠল।

ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কিতে অভ্যাগতদের বসবার আসনগুলো উলটেপালটে একাকার হল। রাজামশায়ের দেহরক্ষীরা তাঁকে ঘিরে ফেলে একপাশে নিয়ে গেল। রাজকুমারীর সখিরা এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। স্বর্ণরেণু মালা হাতে কোথায় যাবে ঠিক করতে না-পেরে সন্ত্রস্তমুখে তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রদ্যুম্ন তখন একসঙ্গে তিনজন রাজার সঙ্গে অসিযুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ, অন্য দুই যুযুধান রাজার ধাক্কায় স্বর্ণরেণুর হাত থেকে মালাটা ছিটকে গিয়ে প্রদ্যুম্নের গলায় পড়ে গেল।

প্রদ্যুম্ন চমকে উঠে বললেন— ওই যা, এটা আবার কী? ওরে বাবা, এটা যে স্বয়ংবরের মালা দেখছি। ওরে রেণু, কোথায় গেলি?

স্বর্ণরেণু বলল— এই তো, তোমার পাশেই আছি।

—এই মালাটা তাড়াতাড়ি খুলে নে তো।

—তুমি খুলে নাও না।

—যুদ্ধ করছি যে, একহাতে খুলতে গেলে ছিঁড়ে যেতে পারে। শিগগির কর।

—আমি খুলতে টুলতে পারব না।

—দূর বোকা! খুলবি না, মানে কী? এটা কী যে সে মালা নাকি? এটা হল স্বয়ংবরের মালা। এ মালা কি আমার গলায় মানায়?

—কেন মানাবে না? দিব্যি মানিয়েছে। অমন মোটা ফুলের মালা গলায় দিয়ে তোমার আগে কেউ বোধহয় অসিযুদ্ধ করেনি।

—এ তো আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি।

ঠিক এইসময় দেখা গেল রাজা গজগোবিন্দের সেনাপতি অচলাদ্রি তরোয়াল হাতে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কোথায় যেন যাচ্ছে।



প্রদ্যুম্ন গর্জন করে বললেন— এ্যাই অচা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

অচলাদ্রি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল— না, মানে ওই ইয়ে, তোদের রাজামশাইকে বন্দি করতে যাচ্ছি। মানে, জামাইবাবু বললেন কিনা।

—সাবধান, আর এক পা এগোলে তোকে ওপর থেকে দেড় বিঘৎ ছেঁটে দেব, বলছি। তোকে তখন আর কেউ চিনতে পারবে না। যা! যেখান থেকে এসেছিস সেইখানে ফিরে যা।

বলতেই অচলাদ্রি বেশ কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে 'অ জামাইবাবু, অ জামাইবাবু' বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে একদিকে চলে গেল।

তখন প্রদ্যুম্ন তার প্রতিপক্ষ তিনজন রাজাকে খুব বিনীতভাবে বললেন— আপনারা একটু দাঁড়াবেন? আমি এই রাজকুমারীর সঙ্গে একটু কথা বলেনি।

তিনজন রাজাই খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন— এ সব খুব খারাপ। চমৎকার যুদ্ধটা হচ্ছিল, তার মধ্যে যত সব ঝামেলা! ঠিক আছে, কথা শেষ করে নিন, আমরা দাঁড়াচ্ছি। তারপরে আবার শুরু করা যাবে।

প্রদ্যুম্ন রাজাদের ধন্যবাদ জানিয়ে স্বর্ণরেণুর দিকে ফিরে বলল— শোন রেণু, ছেলেমানুষী করিসনি। এই মালা কি আমার জন্যে? তুই এ মালা পরাবি কোনো রাজপুত্রকে কিংবা কোনো দিগ্বিজয়ী রাজার গলায়। আমাকে পরালে সেটা ঠিক হবে না তো।

স্বর্ণরেণু বলল— কেন হবে না? তুমি রাজা বা রাজপুত্তুরের চেয়ে কম কীসে? রাজা বা রাজপুত্রদের কি মাথায় দুটো শিং আছে না পেছনে একটা ল্যাজ আছে?

অপেক্ষমান রাজাদের একজন বললেন— রাজকন্যা তো ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি দেখতে শুনতে ভালো, খ্যাতনামা বীর, অনায়াসে তিনজনের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করে যাচ্ছেন, আপনার তীক্ষ্ন বুদ্ধির কথা এতদিন শুনেই এসেছি, আজ স্বচক্ষে দেখেছি। আপনি রাজা বা রাজপুত্তুরদের চেয়ে কোন অংশে কম?

প্রদ্যুম্ন চোখ পাকিয়ে বললেন— আপনি চুপ করুন তো মশায়। মেলা জ্ঞান দেবেন না। দেখছেন এদিকে মা মনসা, আর আপনি তার ওপরে ধুনোর গন্ধ দিয়ে যাচ্ছেন। শুনুন, সেনাপতি হই আর যাই হই, আসলে আমি একজন বেতনভোগী সৈনিক। রাজামশাই যে বেতন দেন, তাতে আমি, আমার ছোটো ভাই, বাবা আর মা এই চারজনের সংসার সুখে-স্বাচ্ছন্দেই চলে যায়। আমি যদি এখন রাজকন্যে বিয়ে করি তাহলে আমরা সবাই কী আতান্তরে পড়ব, সেটা বুঝতে পারছেন? ঘটি-বাটি বিক্রি করে সকলকে যে পথে দাঁড়াতে হবে।

পেছন থেকে একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল— সেটা পরেকার কথা। আপাতত রেণু এই স্বয়ংবর সভায় সর্বসমক্ষে তোমার গলায় মালাটা যখন দিয়েই ফেলেছে, তখন তোমার ওকে বিয়ে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বলে রাজামশাই উচ্চকণ্ঠে বললেন— সবাই শান্ত হন, অস্ত্র সংবরণ করুন। এই সভায় আমার একমাত্র মেয়ে রাজকন্যা স্বর্ণরেণু আমার পরম বন্ধু দুর্মদ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র সেনাপতি প্রদ্যুম্ন সিংহের গলায় বরমাল্য দান করেছে। আমি তাদের আশীর্বাদ করছি এবং তাদের বিবাহে আপনাদের সবাইকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করছি। আপনারাও ওদের আশীর্বাদ করুন। আর ঘোষণা করছি যে এই বিবাহে যৌতুকস্বরূপ আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব আমার জামাতা বাবাজীবনকে দান করছি।

সবাই সহর্ষে অনুমোদন জানালেন।

রানিমা কেঁদে কেঁদে শয্যা নিয়েছিলেন। স্বর্ণরেণুর সখীদের মুখে সব শুনে উঠে বসলেন। বললেন— আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে রেণুর ঠিক প্রদ্যুম্নের মতো বুদ্ধিমান আর সাহসী একটি বর হোক। ভগবান যে আমার সেই ইচ্ছে পূর্ণ করবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। বড়ো ভালো ছেলে। সৎ আর তেজস্বী। আমাদের রেণুকে ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই বোধ হয় ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন।

শুনে সখীরা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রানিমা আশ্চর্য হয়ে বললেন— হাসছিস কেন রে তোরা? এতে হাসির কী আছে?

সখীরা বলল— হাসব না? রাজামশাই হঠাৎ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যের ঘোষণা করতেই মহাবীর প্রদ্যুম্ন দাদার হাত থেকে তরোয়ালটা ধুপ করে খসে পড়ল যে।

রানিমা সস্নেহে বললেন— তাতে হাসবার কী আছে? রেণুর মতো অমন একটা ডানপিটে দুষ্টু মেয়েকে বিয়ে করতে হবে শুনলে অনেক রথী-মহারথীরও বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবে। আমাদের প্রদ্যুম্ন তো তাদের তুলনায় একেবারে ছেলেমানুষ।



অতনু গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যাদবপুরে, আমার মেজকাকার বাড়িতে। মেজকা রিটায়ার করে ফরিদাবাদের ফ্যাক্টরি-কোয়ার্টার্স ছেড়ে এসে ওখানে বাড়ি করেছিলেন। আমি একদিন কলেজ সেরে ওঁর বাড়িতে গেছি, দেখি মেজকাকি শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। বান্ধবীটি মেজকাকির সমবয়সিই হবেন, ভীষণ ফর্সা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুল সবই প্রায় সাদা, পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি আর লালরঙের ব্লাউজ। গল্প চলেছে আর সেইসঙ্গে মেজকাকি অনবরত পান সেজে যাচ্ছে আর তার বান্ধবী খচখচ করে জাঁতি দিয়ে প্রবল বেগে সুপুরি কেটে যাচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্য দেখে বেরিয়ে এলুম। মেজকা পেছনের বাগানে মালিকে একটার পর একটা ভুলভাল ইন্সট্রাকশন দিচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে চলে গেলুম।

একটু বাদেই দেখি মেজকাকি বাগানে আসছে, সঙ্গে একটা ছোকরা সাহেব। সে ছ-ফুটের ওপর লম্বা, বিশাল স্বাস্থ্যবান শরীর, চোখ দুটো নীল তবে মাথার চুল কালো। মহাবিপদ। আমি আবার সাহেব-সুবো দেখলে বেজায় ভয় পাই। একে তো ইংরিজি বলতে হয়, তার ওপরে ওরা যে কী বলে সেটা ভালো ধরতেই পারি না। তার ওপর দেখি মেজকাকি ওই সাহেবটাকে নিয়ে আমার দিকেই আসছে।

মেজকাকি বলল— শোন ভেনো, এই হল অতনু। ও এসেছে ওর মাকে নিয়ে যেতে। তা নিয়ে যাব বললেই তো আর হয় না। ছত্রিশ নম্বরের মহাদেববাবুর বাজার করতে গিয়ে মেছুনিদের সঙ্গে হাতাহাতির গল্পটা সবে জমে উঠেছে, বুঝলি? তার ওপরে এখনও আমার পঞ্চাশটা পান সাজা বাকি। এ সময় তো আর ওর মাকে যেতে দেওয়া যেতে পারে না— না কী বলিস?

তারপর অতনু নামক সাহেবটির দিকে ফিরে বলল— এ হল ভেনো, মানে ভানু। আমার ভাসুরপো। একেবারে তোর সমবয়সি। যোগেশচন্দ্র কলেজে পড়ে, তোরই মতো পলিটিকাল সায়েন্স। তোরা একটু গল্প কর। আমি আর আধঘণ্টার মধ্যেই তোর মাকে ছেড়ে দেব।

অতনু সহাস্যে পরিষ্কার বাংলায় বলল— ঠিক আছে, মাসিমা। আপনার কোনো চিন্তা নেই। তবে মহাদেবমেসোর ব্যাপারটা চুকে গেলেই কিন্তু মাকে ছেড়ে দেবেন। যা পান

সেজেছেন! তাতে গোটা দশেক কম পড়লে কিছু অসুবিধে হবে না। বাকিটা না হয় আমি কাল এসে সেজে দিয়ে যাব।

সেই হল আমার অতনুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত। প্রথমে আপনি দিয়ে শুরু, এখন তুই। অতনুর বাবা গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলী মেজকার প্রতিবেশী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়বার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে অতনুর মাকে বিয়ে করেন। ভদ্রমহিলা জার্মান-আমেরিকান, নাম উরসুলা। বিয়ের আগে কেমন ছিলেন, জানি না। এখন তো একেবারে বাঙালি হয়ে গেছেন। পুজো-আচ্চা করেন, রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত আর পটলের দোলমা যা রাঁধেন তা একেবারে অসাধারণ।

অতনুও কিছু কম যায় না। তার পৈতে তো আছেই, বাড়ির পুজোর অনুষ্ঠানগুলোর অনেকগুলো সে নিজেই করে। অনেক পুজোর মন্ত্র তার কণ্ঠস্থ। আর কখন কী করতে হবে, না করতে হবে, সে সম্পর্কেও তার জ্ঞান কিছু কম নয়। সে ইংরিজি বলে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে অথচ তার সংস্কৃত উচ্চারণে কোনো ত্রুটি নেই। তার চেহারায়, চালচলনে বা স্বভাবে এই বৈপরীত্যের জন্য তাকে অনেক সময় অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে সব অভিজ্ঞতার একটা এখানে বলছি।

সেবার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর ছুটিতে অতনু গিয়েছিল মেমারির কাছে কাঁঠালপুকুর বলে একটা গ্রামে। কাঁঠালপুকুর একটা বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা, অনেকগুলো পাকা বাড়ি, পরিষ্কার রাস্তা, খোলামেলা গ্রাম। একপাশে একটা ছোটো নদী আছে, তার নাম সঙ্কটা। খুব যে চওড়া তা নয়, তবে টলটলে জল, বেশ স্রোতও আছে। এই সঙ্কটার ধারে গ্রামের জমিদার চাটুজ্জেদের বসতবাড়ি। এই বাড়ির ছেলে শ্রীমন্ত অতনুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সে-ই নিমন্ত্রণ করেছিল তার কয়েক জন বন্ধুকে তাদের বাড়ির পুজো দেখবার জন্য।

চাটুজ্জে বাড়ি যে খুব একটা বিশাল ইমারত তা নয়, তবে বেশ বড়োই বলা চলে। একতলা-দোতলা মিলিয়ে কুড়ি-বাইশটা ঘর, মাঝখানে ঠাকুরদালান, তার একপাশে অতিথিশালা। সামনে-পেছনে বাগান, গোশালা, গ্যারেজ, রান্নাঘর ইত্যাদি। পাঁচিল ঘেরা জমিটা বিঘে তিনেক তো হবেই। জমিদারি চলে যাবার পরেও চাটুজ্জেদের যে অর্থাভাবে পড়তে হয়নি, সেটা বেশ বোঝা যায়।

পুজোর আগের দিন বিকেল বেলা অতনুরা যখন ওখানে পৌঁছল, তখন বাড়িতে অনেক লোক। বাচ্চাকাচ্চাদের হুল্লোড়, মেয়েদের উচ্চকিত হাসি, বড়োদের ব্যস্তসমস্ত গতিবিধি বাড়িটাকে সরগরম করে রেখেছে।

ঠাকুরদালানের পুজোমণ্ডপের একপাশে একটা প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় শ্রীমন্তের ঠাকুরদাদা শ্রীশচন্দ্র পুজোর কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলেন। তিনি নাতির বন্ধুদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন বটে কিন্তু অতনুকে দেখে তাঁর ভুরু দুটো একটু কোঁচকাল। সবার সঙ্গে অতনু যখন তাঁকে প্রণাম করতে গেল, উনি তাড়াতাড়ি কোঁচা দিয়ে পা দুটো ঢেকে দিলেন। তাঁর একমুখ পাকাদাড়ি অস্বস্তিটা গোপন করতে পারল না।

শ্রীশচন্দ্র নাতিকে বললেন— তোমার বন্ধুদের মালপত্র এখানেই রাখতে বলো। কানাই আর শিবু ওগুলো যার যার ঘরে পৌঁছে দেবে। এখন তুমি বন্ধুদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখিয়ে দাও। ছ-টার সময় আসবে। তখন চা দেওয়া হবে।

সেইরকমই করা হল। শ্রীমন্ত বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ যেতে-না-যেতেই একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে শ্রীমন্তকে বলল— তোমাকে বড়োকর্তা ডাকতেছেন গো। তাড়াতাড়ি এসো। তোমার বন্ধুরা এখানেই একটু থাক। বড়োকর্তা বললেন, সময় বেশি লাগবে না।

শ্রীমন্ত চলে গেল। অতনু বন্ধুদের বলল— বড়োকর্তা ভেবেছেন, আমি খ্রিস্টান সাহেব। খুব সম্ভব আমাকে পুজোবাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। আমাকে এখানে আনবার জন্য শ্রীমন্ত বকুনি খাবে।

শ্রীমন্ত যখন ফিরে এল, দেখা গেল যে অতনুর অনুমানই ঠিক। ম্লান হেসে শ্রীমন্ত বলল — ঠাকুরদাদার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে এলুম। একটা ম্লেচ্ছ সাহেবকে আনার জন্য বকতে গিয়েছিলেন আমাকে। আমি বললুম, ম্লেচ্ছ হবে কেন? অতনু গাঙ্গুলী ব্রাহ্মণসন্তান।

ঠাকুরদাদা বললেন— আমাদের দেশের লোকের কখনো নীল চোখ হয়?

আমি বললুম— হবে না কেন? কেলেকিষ্টি রামচন্দ্রেরই তো নীল চোখ ছিল। সেটাই তো একটা মিসিং নীলপদ্মের জায়গায় দিতে গিয়েছিলেন। আর এ তো ভীষণ ফর্সা। আমার কথায় ঠাকুরদাদা খুব যে একটা আশ্বস্ত হয়েছেন, তা মনে হল না। আসলে অতনুর দুরন্ত সাহেব সাহেব ফিচারগুলো মেনে নিতে পারছেন না। যাহোক, শেষপর্যন্ত বলেছেন যে তোর জন্যে অতিথিশালায় একটা ঘর ঠিক করতে। সেটা সিঙ্গল সিটেড ঘর। তোরা বাকি সকলে অন্য ঘরে থাকবি। সবাই তোকে ওয়াচ করবে, তারপরে ঠিক করা হবে যে তোকে পুজোমণ্ডপে ঢুকতে দেওয়া হবে কী হবে না।

অতনু সন্দিগ্ধ হয়ে বলল— সবাই ওয়াচ করবে মানে? কে সবাই?

শ্রীমন্ত কথাটা যেন এড়িয়ে গেল। বলল— সবাই মানে আমাদের সবাই। ভয় নেই, তোর কোনো অসুবিধে হবে না। বলে অন্য কথা পেড়ে বন্ধুদের গ্রাম দেখাতে শুরু করল।

অতনুর ঘরটা অতিথিশালার একধারে। যেকোনো হস্টেলের সিঙ্গল সিটেড ঘরের থেকে সামান্য ছোটোই হবে। বড়োজোর দশ ফুট বাই পাঁচ ফুট। ঘরের দু-পাশে দুটো জানলা, শীতের জন্য তাদের ঘড়খড়ি পাল্লাগুলো বন্ধ রয়েছে। ঘরের ভেতরে একটা সিঙ্গল তক্তপোশ আর একটা আলনা। তক্তপোশের একপাশে ওর ব্যাগটা রাখা ছিল।

সারা বিকেল মাঠে-ঘাটে ঘুরে, সন্ধে বেলা অতিথিশালার পাশের মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলে আর রাত্রে গুরুভোজনের পর অতনু খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শ্রীমন্ত যখন ওকে ওর ঘরে নিয়ে এল, তখন শোবার জন্য ওর সমস্ত শরীর উদগ্রীব হয়ে ছিল।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেল অতনু। সমস্ত ঘরটা অসম্ভব গুমোট, নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অথচ, শ্রীমন্তকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হল। এটা অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। ছোট্ট ঘর, সব দরজা-জানলা বন্ধ, তার ভেতরটা গুমোট হতেই পারে। অতনু তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিল। দেখা গেল বাইরে একটা অদ্ভুত কুয়াশা। মনে হচ্ছিল সেটা যেন নড়ছে, চড়ছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। আকাশে চতুর্থীর নখের মতো সরু একফালি চাঁদটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। অতনু ভাবল কুয়াশাটা ঘরের ভেতরে চলে আসবে। তা কিন্তু এল না। জানলার বাইরেই একটা অস্বচ্ছ পর্দার মতো দুলতে লাগল।

শ্রীমন্ত বলল— জানলাটা খুলে রাখবি? ঠান্ডা লেগে যেতে পারে কিন্তু।

অতনু বলল— সন্ধ্যা করে নিই। তারপরে বন্ধ করব। বলে ব্যাগ থেকে একটা ধুতি বের করল।

তুই এখন সন্ধ্যা করবি? রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়। জানিস না বিদেশে নিয়মো নাস্তি?

—তা হয় না। আজ পর্যন্ত কখনো সন্ধ্যা বাদ যায়নি। রাত হয়েছে তো কী? সন্ধে বেলা করতে না পারলে দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিলেই হল। আমেরিকায় যখন যাই তখনও বাদ দিই না। বলে খোলা জানলাটার দিকে চোখ পড়তেই অতনু দেখল কুয়াশার ভেতরে নড়াচড়ার গতিটা যেন বেড়ে গেছে।

সন্ধ্যা করার পর প্রাণায়াম করে আচমন করার সঙ্গেসঙ্গে ঘরের গুমোটটা যেন অনেকটাই কেটে গেল। ঠান্ডাটাও একটু বাড়ল। তখন, জানলাটা বন্ধ করে দেওয়াই স্থির করল অতনু।

পরদিন সকালে অতনু যখন বন্ধুদের সঙ্গে পুজোমণ্ডপে গেল, তাকে কেউ বাধা দিল না। তবে প্রণাম করার সময় যেন অভ্যাসবশতই কোঁচা দিয়ে পা ঢেকে রাখলেন শ্রীশচন্দ্র। ঠিকই বলেছে শ্রীমন্ত। অতনুর প্রবল সাহেব সাহেব আকৃতিটাকে উনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

ওরা যখন মণ্ডপে ঢোকে তখন তার এককোণে একটা উত্তেজিত আলোচনা চলছিল। দেখা গেল উত্তেজনাটা ক্রমশ বাড়ছে। একটু বাদে শ্রীমন্ত দৌড়ে এসে অতনুকে বলল— একবার আমার সঙ্গে আয় তো।

বলে ওকে টানতে টানতে শ্রীশচন্দ্রের কাছে নিয়ে গেল।

শ্রীশচন্দ্র দারুভূত জগন্নাথের মতো ইজিচেয়ারের ওপর স্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটো রক্তবর্ণ, মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথম করছে। দেখে মনে হচ্ছিল উনি এক্ষুণি একটা বোমার মতো ফেটে পড়বেন।

শ্রীমন্ত বলল— ঠাকুরদা, আমাদের আজকের বিপদ থেকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তো সে এই অতনু।

শ্রীশচন্দ্র রক্তচক্ষু করে নাতির দিকে তাকালেন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগে তাঁর পাশে দাঁড়ানো একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বললেন— তুমি একথা বলছ কেন? এই ছেলেটি পুজো করতে পারবে?

শ্রীমন্ত বলল— নিশ্চয়ই পারবে মেজকাকা। ও বড়ো বড়ো পুজো করে, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করে, আর সরস্বতী পুজো করতে পারবে না? কি রে অতনু, পারবি না?

অতনু ঘাড় নেড়ে বলল— পারব।

শ্রীমন্তর মেজকাকা বললেন— মন্ত্রের বই লাগবে?

—লাগবে না। আমার সরস্বতী পুজোর সব মন্ত্রই মুখস্থ আছে।

হঠাৎ শ্রীশচন্দ্রের মুখের কঠিন রেখাগুলো একটু কোমল হয়ে এল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন— 'দ্যাখো অতনু, আমি মহাবিপদে পড়েছি। আমার সম্মান ধুলোয় মিশে যেতে বসেছে। আমাদের পুরোহিত কাঁঠালপুকুর হাই স্কুলের হেডপণ্ডিত দীননাথ ভটচায্যি। তিনি আজ সকাল থেকে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ির কাজকর্ম দেখাশুনো করে তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ। সে আবার আজ সকালের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেছে ডাক্তারবদ্যির সন্ধানে। এঁরা ছাড়া আর একজন পুরোহিত আছেন,

কিন্তু ফন্টে হারামজাদা তাঁকে আসতে দেবে না। ও জানে, এইবার পুজো না-হলে আমার নাকটা মাটিতে ঘষে দেওয়া যাবে।

অতনু শ্রীমন্তকে জিজ্ঞেস করল— ফন্টে কে?

শ্রীমন্ত ফিসফিস করে বলল— ঠাকুরদার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে। শরিক-শত্রুপক্ষ!

শ্রীশচন্দ্র এদিকে বলে চলেছেন— দ্যাখো যদি তুমি উদ্ধার করতে পারো। আমাদের এখানে আর যে সব পুরোহিত আছে তারা একবর্ণ সংস্কৃত জানে না, ঠংঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে, একগাদা বিড়বিড় করে অংবংচং বকে, তুমি নাও মা ফুলের ভার, আমাকে দাও মা বিদ্যের ভার বলে পুজো শেষ করে। আমি তাদের এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিতে পারি না। হয়তো তুমি পারবে। শুনলুম, তোমার সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রোচ্চারণ অত্যন্ত সুন্দর। দ্যাখো, চেষ্টা করে।

অতনু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল— আমার মন্ত্রের প্রশংসা করলে কে আপনার কাছে?

শ্রীশচন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। শ্রীমন্তকে বললেন— মন্টু, একে সরকারমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাও। ওকে জোড়ের ধুতি-চাদর দিতে বলো।

অতনু বিনীতভাবে বলল— সেইসঙ্গে একজোড়া খড়ম।



লম্বা চওড়া অতনু যখন গরদের ধুতি-চাদর পরে খড়ম খট খটিয়ে পুজোমণ্ডপে এসে ঢুকল, হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে উপস্থিত সকলের কলরব বন্ধ হয়ে গেল। সবাই হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আর সে যখন ভরাট উদাত্ত গলায় মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল, তখন ঠাকুরদালানের ছাদে পায়রাদের ডানার ঝটপট শব্দ ছাড়া আর টুঁ শব্দটি নেই। শ্রীশচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বেলা যত বাড়তে লাগল, ভিড়ও তত বাড়তে লাগল। জানা গেল, শরিকদের পুজোমণ্ডপ নাকি ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই চলে

এসেছে এ তরফে, তার ফলে ও তরফ রেগে আগুন হয়ে আছে। অঞ্জলি দেবার সময় তো রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

সব যখন শেষ হল, বন্ধুরা অতনুকে প্রায় কাঁধে তুলে অতিথিশালায় নিয়ে গেল। শ্রীশচন্দ্র পর্যন্ত এই ছেলেমানুষি দেখে বিরক্ত তো হলেনই না, বরং একটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে লাগলেন। তার আগে অবশ্য তিনি সবাইকে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন।

সন্ধের মুখে একটা বাচ্চা ছেলে এসে অতনুর হাতে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা শ্রীমন্তের লেখা। সেটা এইরকম—

> অতনু, পালা! আমাদের ওঁনারা তোকে বেজায় পছন্দ করে ফেলেছেন। বাবা বললেন, আমার সেজজ্যাঠামশায়ের ছোটো মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার দশ বছর বয়েস, কলকাতার গোখেল স্কুলে পড়ে। সেজজ্যাঠামশাই বা জ্যেঠিমার এ ব্যাপারে করণীয় কিছুই নেই কারণ ওঁদের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারুর নেই। তোর মতামতেরও কোনো প্রয়োজন নেই। ওঁদের জীবদ্দশায় ভালো ছেলে ধরে নিয়ে এসে এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেবার অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে ওঁরা এক্সপার্ট। থানাপুলিশ করে কোনো লাভ হবে না কারণ এ তল্লাটে আইন, কানুন, পুলিশ, মিলিটারি সব-ই শ্রীশচন্দ্র চাটুজ্জে। আর তিনি ওঁদের আদেশ অমান্য করবেন না— শত হলেও ওঁরা তাঁর পূর্বপুরুষ।
>
> অতএব এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়। তোর ব্যাগটা এখানেই থাক, শুধু কিছু টাকা সঙ্গে নিবি। জমিদারি যাবার আগে যাদের আমরা পাইক বলতুম তাদের এখন দরওয়ান বলি। তারা লাঠি-সড়কি নিয়ে রেডি হচ্ছে। তোর ঘর ঘিরে ফেলবার আগেই বেরিয়ে পড়। এক্ষুনি। তোর ব্যাগ আমি পরে পৌঁছে দিয়ে আসব।
>
> তুই যেন সাঁঝের ঝোঁকে বেড়াচ্ছিস এইরকম ভাব করে এদিক-ওদিক ঘুরবি। সঙ্কটার উলটোদিকে পূর্বদিকে দেউড়ির দিকটা ফাঁকা। ওদিকে বাগান। ওখানে একটু ঘুরে সুযোগ বুঝে দেউড়ি পেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে উলটোদিকের আমবাগানের মধ্যে যদি ঢুকে পড়তে পারিস তাহলে দরওয়ানেরা তোর পেছনে যাবে না, কারণ ওই বাগানটা ফন্টে-কাকার। দাঁড়াবি না কিন্তু। নাক বরাবর দৌড়বি। তাহলে স্টেশনে পৌঁছে যাবি। এখন পর পর কয়েকটা ট্রেন আছে। সামনে যেটা পাবি সেটাতেই উঠে পড়াবি। টিকিট-ফিকিটের কথা পরে ভাবিস। বড়োরাস্তা ঘুরে আমাদের লোকেদের স্টেশনে যেতে যে সময় লাগবে তার আগেই তোকে কেটে পড়তে হবে।

চিঠি পড়ে তো অতনুর মাথার চুল খাড়া! তার বন্ধুদেরও তথৈবচ। সবাই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল। যেন কিছুই হয়নি, এরকম একটা ভাব করে বেড়াতে বেড়াতে ওরা পুবদিকের বাগানে চলে গেল। সত্যিই ওদিকে লোকজন কম। কয়েকটা চাদর মুড়ি দেওয়া রোগাপটকা মালি ঘোরাঘুরি করছিল। সবাই মাথা নেড়ে নেড়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ফুলগাছগুলো দেখতে লাগল। অতনু ইচ্ছে করে দেউড়ির দিকে পেছন ফিরে রইল। যাতে কেউ সন্দেহ না-করে।

পবিত্র ফিসফিস করে বলল— দেউড়িতে মাত্র একটা হোঁৎকামতো গুঁপো দরওয়ান আছে। তুই যখন পালাবি, ওকে আমরা সামলাব।

অজয় বলল— ওই গাছটার নীচে দ্যাখ, কী রকম অদ্ভুত একটা ধোঁয়ার পিণ্ড জমাট বেঁধে রয়েছে। শীতকালে বাতাস ভারী হয়ে যায় বলে এরকম হয়, কিন্তু ওই ধোঁয়াটা যেন কেমন। দেখলে ভয় করে।

অতনুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একটু দূরে একটা তেঁতুলগাছের নীচে মাটি থেকে ইঞ্চি ছয়েক ওপরে ভাসমান গত রাত্রের দেখা নিরলম্ব কুয়াশাটা। কালকের মতোই সেটা নড়ছে-চড়ছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। কখনো সরু হয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে আবার কখনো মোটা হয়ে বেঁটে হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে অতনু আর দাঁড়াল না। 'আমি যাচ্ছি, তোরা এ দিকটা সামলা' বলে হঠাৎ ফুলের বেড-টেড মাড়িয়ে, একগাদা ফ্লক্স আর প্যানসি চেপ্টে দিয়ে, গোটা চারেক গাঁদা গাছ ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল দেউড়ির দিকে। দরওয়ানটা একটা টুলে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল। সে ব্যাপারটা বুঝে খচমচ করে উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে অতনু সাঁ করে তার সামনে দিয়ে ছুটে দেউড়ি পার হয়ে, রাস্তা পেরিয়ে আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরওয়ানটা 'পালাল! পালাল!' বলে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল ঠিকই কিন্তু সত্যিই আমবাগানের ভেতরে ঢুকল না। রাস্তার ওপরে লাফাতে লাগল।

বেশ কিছুটা দৌড়ে একটু দম নেবার জন্য দাঁড়াল অতনু। দম নেবে কী? পেছন ফিরে যে দৃশ্য দেখল তাতে তো ওর একেবারে আক্কেল গুড়ুম!

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় অতনু দেখল সাদাটে কুয়াশাটা বাতাসে ভেসে ভেসে একটা হিংস্র ক্ষুধার্ত হাঙরের মতো তার দিকে তেড়ে আসছে। তার এপাশ-ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে যেন অতনুর গলা টিপে ধরার জন্য সরু লিকলিকে কতগুলো শুঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গ বেরুচ্ছে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। এমনকী সেই কুয়াশার ভেতর থেকে বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা ক্ষীণ কিন্তু ক্রুদ্ধ কোলাহলও যেন শোনা যাচ্ছে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না অতনু। বিরাট একটা লাফ মেরে 'গেছি রে!' বলে একটা আর্তনাদ করে আবার প্রচণ্ড জোরে ছুট লাগল। তখন যদি স্টপওয়াচ নিয়ে ওর স্পিড মাপা যেত, তা বোধ হয় দেখা যেত যে অনেক অলিম্পিক রেকর্ড-ই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

স্টেশনটা খুব দূরে নয়। অতনু যখন পৌঁছল তখন একটা ট্রেন সদ্য রওনা হয়েছে। ও লাফ দিয়ে একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা নস্যিরঙের র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া লোকের পাশে বসে পড়ল। জানলা দিয়ে দেখল প্ল্যাটফর্মের ধারে একটা গাছের নীচে কুয়াশাটা জমাট বেঁধে যেন নিষ্ফল রাগে ফুঁসছে।

নস্যিরঙের র‍্যাপার বলল— আর কেয়া দেখতা হায় সাহেব? এখানকার আদমি-লোগকো পলিউশনকে নিয়ে কোনো চিন্তাই নেহি হায়। কাঁচা কয়লা দেকে উনুন জ্বালায়গা আর ঐসা মাফিক ধোঁওয়ায় সকলের স্বাস্থ্যকা বারোটা বাজায়গা। দেখিয়ে না, উনুনওয়ালা কতক্ষণ চলা গিয়া তার ঠিক নেহি হায় অথচ ওই ধোঁয়াটা ওইখানমে এখনও ঘোঁট পাকাতা হায়।

গল্প শেষ করে অতনু বলল— জানিস ভেনো, শ্রীমন্তকে অনেক চাপাচাপি করলুম ওই কুয়াশার মতো জিনিসটা কী বা কেমন করে ওর সেই 'ওঁদের' সঙ্গে ওর ঠাকুরদার যোগাযোগ হয় সে কথা বলবার জন্য। কিছুতেই বলল না। আমি ওসব জানি না বলে এড়িয়ে গেল।

ভয়



প্রায় পঁচিশ বছর বাদে দেশে ফিরেছেন অমরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি। পনেরো বছর বয়সে বিদেশে গিয়েছিলেন, সেখানেই লেখাপড়া করেছেন, ডাক্তারি পাশ করেছেন, তারপর স্থায়ীভাবে ওখানেই থেকে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মীনাক্ষীও ডাক্তার। দু-জনেই লন্ডন শহরের একই হাসপাতালে চাকরি করেন। কাজেই দেশে ফেরার কোনো প্রয়োজন বা তাগিদ তাঁরা কোনোদিনই অনুভব করেননি। এ ছাড়াও তাঁদের দেশে ফেরার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ না থাকার অন্য কারণও ছিল।

গোলমাল বাঁধাল ছেলেমেয়েরা। তেরো বছরের ইন্দ্রনারায়ণ আর এগারো বছরের এষা তাদের দেশ দেখবার জন্য এমন ঝুলোঝুলি শুরু করে দিল যে শেষপর্যন্ত অমরেন্দ্র রাজি না হয়ে পারেননি। এরকম হওয়ারই কথা; কারণ ইন্দ্র আর এষাকে ছোটোবেলা থেকেই বাংলা বলতে, বাংলা বই পড়তে আর বাংলা গান শুনতে তাদের বাবা-মা-ই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। সেজন্যে তাদের ভেতরে নিজেদের দেশ সম্পর্কে একটা অদম্য কৌতূহল গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

কলকাতায় একটা পাঁচতারা হোটেলে উঠেছিলেন রায়চৌধুরিরা। পঁচিশ বছর বাদে কলকাতার চেহারা দেখে বেশ খুশি হলেন অমরেন্দ্র। কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়ে সন্তুষ্ট হল না। তারা, তাদের দেশ, হাওড়া জেলার মানিকপুর গ্রামে যেতে চায়। তাদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন অমরেন্দ্র। বললেন, এই মানিকপুর একটি নিতান্তই অজ পাড়াগাঁ, এখানে সুইচ টিপলে আলো জ্বলে না, কল খুললে জল পড়ে না, চারদিকে ঝোপঝাড়, সাপখোপ, পোকামাকড়, সন্ধে হলে শেয়াল ডাকে। ওখানে গেলে কলকাতার সুন্দর স্মৃতিটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে দার্জিলিং যাওয়া অনেক ভালো। সকাল বেলা কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্রর এতসব যুক্তি তাঁর ছেলেমেয়ের কাছে ধোপে টিকল না। ওদের বাবা যেখানে তাঁর ছেলেবেলা কাটিয়েছেন, সে জায়গাটা না-দেখে তারা কোথাও যাবে না। অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল যে ভোর বেলা একটা গাড়িভাড়া করে মানিকপুর যাওয়া হবে, সঙ্গে থাকবে প্যাক করা দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের আগেই ওখান থেকে রওনা দিয়ে সন্ধে নাগাদ ফিরে আসা হবে।

সেইরকমই করা হল, গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল হোটেলের কর্ত,পক্ষ। বিদ্যাসাগর সেতু আর কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দেখে তো অমরেন্দ্র একেবারে চমৎকৃত। ড্রাইভার মহেন্দ্রকে বললেন— এই জায়গাটা যে এতদূর পালটে যাবে ভাবতেই পারিনি। আপনাকে রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারব কি না বুঝতে পারছি না।

মহেন্দ্র বললেন— মানিকপুর যাবেন তো? কোনো চিন্তা করবেন না, আমি ঠিক নিয়ে যাব। মানিকপুরের পাশেই এই রাস্তার ওপরে বিরাট হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। আমি ওখানে বেশ কয়েক বার গেস্টদের নিয়ে গেছি। মানিকপুরের আশেপাশে সব-কটা রেস্টুরেন্ট আর পানের দোকানের মালিক আমার চেনা।

মানিকপুরে পৌঁছে অমরেন্দ্র একেবারে হতবাক। চারদিকে তাকান আর গলার মধ্যে নানারকম শব্দ করেন। শেষপর্যন্ত একটা বড়ো কাপড়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভারকে বললেন— জেনে আসুন তো শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরির বাড়িটা কোনদিকে। আমি তো কিছুই চিনতে পারছি না।

মহেন্দ্র ভেতরে গেলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করল— বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি তো তোমার কাকা, তোমার বাবার ছোটোভাই, তাই না? এখনও বেঁচে আছেন? কত বয়েস?

—বোধ হয় বেঁচে আছেন। মারা গেলে খবর পেতুম। ওঁর বয়েস এখন হবে সত্তরের কাছাকাছি।

বলতে-বলতেই দোকানের ভেতর থেকে মহেন্দ্র আর তার সঙ্গে তিন-চারজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁরা দোকানের খরিদ্দার না কর্মচারী বোঝা গেল না। তাঁদের একজন এগিয়ে এসে অমরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি রায়চৌধুরি বাড়িতে যেতে চান? জমি কিনবেন না কি?

অমরেন্দ্র সাবধানে বললেন— ঠিক তা নয়। অন্য একটা কাজ ছিল।

—আমার এসব প্রশ্নে কিছু মনে করবেন না। শুনলুম আপনি বিদেশ থেকে এসেছেন, তাই বলছিলুম যে, যে কাজই থাক, সতর্ক থাকবেন। বীরেন চৌধুরি লোকটা ভালো নয়, অত্যন্ত ধূর্ত আর প্রচণ্ড কিপটে। ওঁর দাদা আর ছোটোবোন অকালে মারা যান। সে ব্যাপারেও লোকে নানাকথা বলে। তখন উনি এখানকার জমিদার হন। সে সময় তো হাতে মাথা কাটতেন। পরে, প্রোমোটারদের খাসজমি বেচে লক্ষ লক্ষ টাকা করেছেন অথচ সৎকাজে একপয়সা ও উবুড়-হস্ত করতে নারাজ। বিয়েথা করেননি, এত টাকা যে কী করবেন তা ভগবানই জানেন। ওদিকে, সাদাসিধে সরল লোককে বিপদে ফেলে নাকাল করতে সিদ্ধহস্ত। এখানকার লোকেরা ওঁর নাম মুখে আনে না। আনলে না কি হাঁড়ি ফেটে যায়। সেকথা থাক, রায়চৌধুরি বাড়ি যাওয়ার পথ এঁকে বলে দিয়েছি। চিনতে অসুবিধে হবে না।

এষা হিহি করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল— হাঁড়ি ফেটে যায় মানে কী বাবা?

চিন্তিত গম্ভীর মুখে অমরেন্দ্র বললেন— ও কিছু নয়, পরে বলব।

কিছুটা এগিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি যখন কাঁচা রাস্তা ধরল, তখন গ্রামের দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। টালির চালের ঘর, চাষের খেত ইত্যাদি দেখে ইন্দ্র আর এষা মহাখুশি। বলল— এই তো তোমার গ্রাম, তাই না বাবা?

অমরেন্দ্র সংক্ষেপে হ্যাঁ বলে চুপ করে গেলেন, তাঁর মুখ চিন্তিত আর গম্ভীর হয়ে রইল। তাঁর আনন্দ আর উৎসাহে কেমন যেন ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হল।

রায়চৌধুরি বাড়ি গ্রামের এক প্রান্তে। প্রায় দশফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিঘে-তিনেক জমির ওপরে দোতলা লম্বাটে প্রকাণ্ড ইমারত। সামনে টানা থামওয়ালা বারান্দা, মাঝখানে পেছনদিকে যাওয়ার জন্য খিলেন করা চওড়া প্যাসেজ। কিন্তু সমস্ত বাড়িটার এখন বড়োই দৈন্যদশা। অনেক জায়গায় প্লাস্টার খসে গেছে, মোটা থামগুলো জড়িয়ে উঠেছে বুনোলতা, জানলা দরজায় রং হয়নি যে কতকাল তা বোধ হয় কেউ জানে না। একজন ক্লান্ত বিষণ্ণ বৃদ্ধের মতো বাড়িটা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। সে বাড়িতে যে কেউ বাস করে তা প্রথম দর্শনে মনে হয় না।

মীনাক্ষী বললেন— তুমি ঠিক জানো যে তোমার কাকা এইখানে থাকেন? আমার তো মনে হচ্ছে যে উনি হয়তো অন্য কোথাও বাড়ি করে উঠে গেছেন।

অমরেন্দ্র বললেন— তাই হবে হয়তো। তাহলে তো ভালোই হয়।

দেউড়ি দিয়ে ঢুকে গাড়ি দাঁড়াল একখণ্ড পোড়ো জমির ওপরে। সে জায়গাটা বোধ হয় একসময়ে লন ছিল, এখন আগাছায় ভরতি। এমন নিস্তেজ আর নিষ্প্রাণ জায়গায় এসেও ইন্দ্র আর এষার আনন্দের কোনো অভাব ঘটল না। হইহই করতে করতে গাড়ি থেকে নেমে দু-জনে প্রথমে বাড়ির সামনে একপাক ঘুরে এল, তারপর দৌড়ে প্যাসেজের ভেতরে চলে গেল। পেছন থেকে মীনাক্ষী ডেকে বললেন— সাবধানে যাবি। সাপখোপ থাকতে পারে।

ইন্দ্র আর এষা কোনো জবাব দিল না বটে কিন্তু প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বেরিয়ে এল। সমস্বরে বলল— এখানে লোক থাকে, বাবা।

অমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন— কী করে বুঝলি?

—ওপাশে জামাকাপড় শুকোচ্ছে দেখলুম।

—তাহলে চল, দেখে আসি।

প্যাসেজের অন্যপাশে বাঁধানো উঠোন। শুকনো ডালপালা, ভাঙা ইটের স্তূপ আর আর্বজনায় ভরতি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমরেন্দ্র বললেন— ছেলেবেলায় এখানে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতুম, ভাবাই যায় না।

—কে, কে ওখানে? বলতে বলতে একতলার একটা ঘরের ভেতর থেকে একজন গামছা কাঁধে আধময়লা ধুতিপরা প্রৌঢ় লোক বেরিয়ে এল, তার পেছনে একজন পক্ককেশ বিধবা বৃদ্ধা। প্রৌঢ় লোকটি জিজ্ঞাসা করল— কে আপনারা, কী চাই?

উত্তর দেওয়ার দরকার হল না। তার আগেই বৃদ্ধা বললেন— আরে অমর না? বড়োবাবুর ছেলে না তুমি?

অমরেন্দ্র মাথা নেড়ে বললেন— হ্যাঁ, তুমি তো মিনতি পিসি, তাই না? আর, তুমি তো জগাদাদা।

—হ্যাঁরে ছেলে, ঠিক চিনেছিস! তা, হাঁকডাক করিসনি কেন? কত বছর বাদে এলি, আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস? সঙ্গে কারা? তোর বউ আর বাচ্চারা? আয় বাবা, ভেতরে আয়। বৈঠকখানায় বস। বড্ডো ধুলো আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, জগু? যা, ওপরে গিয়ে ছোটোবাবুকে খবর দে।

প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘর। সেখানে থাকবার মধ্যে আছে একটা ধূলিধূসরিত বিশাল সোফাসেট আর দেওয়ালে অনেকগুলো অয়েলপেন্টিং। আসবাবপত্র বলতে আর কিছুই নেই। মিনতিপিসি একটা সোফার ধুলো ঝেড়ে সেটা বসবার উপযুক্ত করে দিলেন। ইন্দ্র আর এষা দু-তিন মিনিট ঘরের ভেতরে ঘুরে দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

মিনতিপিসি বললেন— তোরা বস, আমি তোদের জন্য চা করে আনি। বলেই পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ শুরু করে দিলেন। সে আর থামেই না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে বারান্দায় চটির শব্দ পেয়ে বাক্যস্রোত বন্ধ করে মিনতিপিসি তাড়াতাড়ি চা করতে বেরিয়ে গেলেন। তখন ঘরে ঢুকলেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি। ছ-ফুট লম্বা শক্তসমর্থ শরীর। মাথার চুল, ভুরু আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি সব-ই সাদা। পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। দেখলে ভক্তি হয় না, ভয় করে।

প্রণাম আর কুশল প্রশ্ন শেষ হলে বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি এখানে এসেছ কেন? কোনো বিশেষ কারণ আছে কী? আমি তো জানতাম তুমি আর কোনোদিন এদিকে আসবে না।

অমরেন্দ্র বললেন— নিজের দেশে বা নিজের বাড়িতে আসতে গেলে কোনো বিশেষ কারণের দরকার হয় কি, কাকা? তবু কারণ একটা আছে। আমি এসেছি আমার ছেলেমেয়েদের তাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান দেখাতে। এখানে এসে অবশ্য মনে হচ্ছে যে ওদের না আনলেই বোধ হয় ভালো হত। আমি এতদিন ধরে ওদের এই বাড়ির যে উজ্জ্বল রূপের কথা বলে এসেছি, তার তো কণামাত্রও আজ আর অবশিষ্ট নেই। ভয় হচ্ছে যে ওরা না আমাকে মিথ্যেবাদী ভাবে।

—সেরকম ভাবার তো কারণ দেখি না। যা দিনকাল পড়েছে তাতে তোমার ওই উজ্জ্বল রূপ আর অবশিষ্ট থাকা সম্ভব নয়। তুমি তো জানো না, জমিদারি চলে যাওয়ার পর আজ আমাদের কী দুরবস্থা। কোনোরকমে ডালভাত খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। দেখছ না, এই ঘরে যত ফার্নিচার ছিল, সব-ই প্রায় বিক্রি করে দিতে হয়েছে? টাকাপয়সার যা অভাব তা বলে বোঝাতে পারব না। নেহাত পূর্বপুরুষের ভিটে, তাই বাড়িটা বিক্রি করতে পারিনি। তবে, হয়তো তারও আর বেশি দেরি নেই।

অমরেন্দ্র কথাটা খুব একটা বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। বললেন— লোকে তো বলে আপনার নাকি অনেক টাকা।

ভয়ানক রেগে গেলেন বীরেন্দ্রনাথ, তবে নিজেকে চট করে সামলে নিলেন। বিস্ফারিত চোখে যথাসাধ্য শান্ত গলায় বললেন— লোকে কী বলে না-বলে, তাই দিয়ে কাকার কথার সত্যাসত্য বিচার করতে যেও না, অমর।



আরও কিছু হয়তো বলতেন, কিন্তু তার আগেই ইন্দ্র আর এষা লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল। এষা তড়বড় করে বলে গেল— জানো বাবা, ওই উঠোনটার একপাশে একটা দরজা আছে। সেখান দিয়ে পেছনের একটা জঙ্গলে যাওয়া যায়। ওখানে একজন সাধুবাবা আছেন। একটা গাছের নীচে একটা খুব সুন্দর প্ল্যাটফর্মের ওপরে লালরঙের কাপড় পরে বসেছিলেন। মুখে লম্বা দাড়ি কিন্তু খুব ভালো লোক। আমাদের জিগ্যেস করছিলেন যে আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, এইসব।

মীনাক্ষী কথাটা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন— তোমাদের না বলেছি যে অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে কখনো কথা বলবে না বা তার কাছে যাবে না?

ইন্দ্র বলল— না মা, সাধুবাবা খুব ভালো মানুষ।

এতক্ষণ বীরেন্দ্রনাথ তীব্রদৃষ্টিতে ইন্দ্র আর এষার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। থেমে থেমে বললেন— এরা তোমাদের ছেলেমেয়ে? বেশ, বেশ। তা তুমি ঠিকই বলেছ, বউমা। এইসব সাধুবাবা-টাবার কাছেপিঠে না যাওয়াই উচিত। এই অঞ্চলে মাঝে-মাঝেই ছেলেধরার উৎপাত হয়। সবাইকে তাই সাবধানে থাকতে হয়।

বলতে বলতে তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত চাপাহাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললেন— তা, তোমরা এখানে কতদিন থাকবে?

অমরেন্দ্র বললেন— আমরা আজ বিকেলেই চলে যাব।

—তা বেশ। এখন দেখি, তোমাদের দুপুরের খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করতে পারি কিনা। না-হলে, এখানে কাঠেপিঠে খাওয়ার অবশ্য কোনো অভাব নেই।

—তার দরকার নেই, কাকা। আমাদের সঙ্গে প্যাকেট করা খাবার আছে।

—বেশ, বেশ। সব ব্যবস্থা করেই এসেছ দেখছি। তুমি আর বউমা তাহলে এখন বিশ্রাম করো। আমি বরং তোমার ছেলেমেয়েকে বাড়িটা ঘুরে দেখাই, কি বলো? ওদেরই তো সব।

বলামাত্র ইন্দ্র আর এষা মহাখুশি হয়ে সমস্বরে বলল— হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো।

বীরেন্দ্রনাথ গলায় যথাসাধ্য মধু ঢেলে ওদের বললেন— আমি তোমাদের ছোটো ঠাকুরদাদা। এখন প্রথমে তোমাদের আমাদের বাড়িটা দেখাব আর তারপরে তোমাদের খাওয়ার পর জমিটমিগুলো দেখাব, কি বলো?

দু-জনে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

মীনাক্ষী বললেন— সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে গাড়ির কাছে চলে আসবে কিন্তু। আর কোনোরকম দুষ্টুমি করবে না, কেমন?

বীরেন্দ্রনাথ বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন— চিন্তা করো না বউমা, আমি ঠিক পৌঁছে দেব। আর, বাচ্চারা দুষ্টুমি করবে না, তা কখনো হয়?

বলে ছোটো ঠাকুরদাদা তাঁর নাতি-নাতনিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অমরেন্দ্র কিন্তু কিছুটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মীনাক্ষী বললেন— তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? কী ভাবছ?

অমরেন্দ্র বললেন— ভাবছি, মানুষের মধ্যে এতটা পরিবর্তন কী সম্ভব? বীরেন্দ্রনাথের ভেতরে স্নেহের সঞ্চার যে দেখিলেও না-হয় প্রত্যয়। কবে দেখব, গোরিলা গান গাইছে আর নেকড়েবাঘ গলায় কণ্ঠি ঝুলিয়ে হরিনাম করছে।

মীনাক্ষী বললেন— চমৎকার! কাকা-ভাইপোতে এমন ভাব তো বিশ্বসংসারে দেখা যায় না। পারোও তোমরা!

অমরেন্দ্র গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলেন। কোনো কথা বললেন না।

দেড়টা নাগাদ গরদের ধুতি আর উত্তরীয় পরা বীরেন্দ্রনাথকে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির মাঝখানের প্যাসেজটা দিয়ে বাইরে আসতে দেখা গেল, পেছনে জগা। মীনাক্ষী, মোবাইল ফোন হাতে, অমরেন্দ্র একটা লোহার রড হাতে, মহেন্দ্র অত্যন্ত উদবিগ্নমুখে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন পরামর্শ করছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ উত্তেজিতভাবে বললেন— তোমার ছেলেমেয়েরা কি এখানে এসেছে?

রাগত কঠিন মুখে অমরেন্দ্র বললেন— ওরা আপনার কাছে ছিল।

—ছিল তো। আমি একটু পুজোয় বসেছিলুম, তখন ওরা জগুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। খেলতে খেলতে কোথায় যে গেল। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। জগু আর আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। ভীষণ ভয় করছে। ছেলেধরা তুলে নিয়ে গেল না তো?

—ছেলেধরার ব্যবস্থা পরে হবে। আগে বলুন তো কাকা, এই ভরদুপুরে আপনি কী পুজো করছিলেন?

—সে তুমি বুঝবে না। আমি রোজ এই পুজো করে থাকি। আমার গুরুর আদেশ।

—আপনার গুরুটি তো তান্ত্রিক, তাই না, কাকা? তাকে তো এখন আমার বাবার শোওয়ার ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার ব্যবস্থাও হবে। আর তোমাকেও বলি জগাদা, এই

জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ভালো কাজ করোনি। আমার বাবা আর পিসি যখন মারা যান, তখনও তুমি চুপ করে ছিলে, আজও চুপ করে আছ। তোমার কপালে অশেষ দুঃখ রয়েছে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন বীরেন্দ্রনাথ। চিৎকার করে বললেন— তুমি শালিনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, অমর। তোমার ছেলেমেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তুমি আমার সাধনাকে জঘন্য ব্যাপার বলতে সাহস পাও কী করে? তা-ও আমারই সামনে দাঁড়িয়ে।

—আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি আরও অনেক কথাই বলব, কাকা। যথাসময়ে। আগে তো আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে আসি। তারাও বলবে। পুলিশ আসতে আর বেশি দেরি নেই। সবকথা আপনার আর তাদের সামনেই হবে। আমি লালবাজারে ফোন করে দিয়েছি। তারা লোকাল থানায় খবর নিয়ে দিয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ পূর্ববৎ চিৎকার করে বললেন— তুমি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছ? ক্ষমতা থাকে তো যাও, নিয়ে এসো তোমার ছেলেমেয়েদের। দেখি তারা কী বলে? তারা কোথায় আছে তা কি তোমার জানা আছে?

—আছে। আমাদের গুমঘরে আপনি তাদের আটকে রেখেছেন যাতে তারা আস্তে-আস্তে কষ্ট পেয়ে মারা যায় আর যখ হয়ে যে কুবেরের ঐশ্বর্য আপনি ওই ঘরে জমিয়ে তুলেছেন সেটা অনন্তকাল ধরে পাহারা দিতে পারে। মোহর দেখাবার অছিলায় আপনি তাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আপনার সেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারল না, কাকা। আপনার এই কদর্য নিষ্ঠুর কুসংস্কার কি জঘন্য ব্যাপার নয়?

মীনাক্ষি বললেন— আপনি শালিনতার কথা বলছিলেন না? এই আপনার শালিনতা?

চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো মিইয়ে গেলেন বীরেন্দ্রনাথ। মিনমিন করে বললেন— আমাদের গুমঘর কোথায়, তোমরা জানো? সেটা তো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না বলে জানতুম। সেই ঘর তো আজ বহুবছর তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তার চাবি তো কবেই হারিয়ে গিয়েছে।

অমরেন্দ্র বললেন— তার চাবি আপাতত আছে আপনার শোওয়ার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের ভেতরে।

মহেন্দ্র বললেন— ভালোয় ভালোয় চাবি যদি না দেন, তাহলে এই লোহার রড দিয়ে তালা ভেঙে দেব। কোনো অসুবিধে হবে না।

স্তম্ভিত বীরেন্দ্রনাথ বললেন— তোমাদের এসব খবর দিলে কে? নিশ্চয়ই জগু হারামজাদা।

—না, আমি দিয়েছি। বলতে বলতে মাঝারি গড়নের, ধুতি আর ফতুয়া পরা, মুখে লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি, একটি লোক বারান্দার একটি থামের পেছন থেকে বেরিয়ে এল।

বীরেন্দ্রনাথ বললেন— কে তুই? এসব খবর তুই জানলি কী করে?

লোকটি বলল— আমাকে চিনতে পারলেন না, ছোটোবাবু? আমি গোষ্ঠ, বড়োবাবুর খাস বেয়ারা।

বীরেন্দ্রনাথ মুখ বেঁকিয়ে বললেন— গোষ্ঠ? ফাজলামো হচ্ছে? এ গোষ্ঠ নয়, হতে পারে না। কারণ, গোষ্ঠ বেঁচে নেই। সে বহুকাল আগে খুন হয়েছিল। দাদা মারা যাওয়ার প্রায়

সঙ্গে-সঙ্গেই। টাকাপয়সা চুরি করেছিল আর সেই সূত্রে ওর দলের লোকজনের সঙ্গে বিবাদে ওকে খুন হতে হয়েছিল।

শুনে সবাই স্তম্ভিত, বাক্যহারা। মহেন্দ্র সামলে নিয়ে বলল— লোকটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর আপনি বলছেন যে সে খুন হয়েছে! এ কি তবে ভূত? যত সব বাজে কথা। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।

বীরেন্দ্রনাথ বললেন— আমি তা বলছি না। আসলে, এ একটা বাজে লোক। তুমি এর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না, অমর। আমার কোনো শত্রু একে এখানে পাঠিয়েছে।

গোষ্ঠ সহাস্যে বলল— আমি বাজে লোক কি না জানি না। তবে, এটা জানি যে রানিমা যখন অমরদাদাকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন জমিদারির লোভে আপনি আপনার দাদা আর ছোটোবোনকে বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন। ওরা ফিরে এলে সুযোগ বুঝে ওদেরও মারতেন। আমি ব্যাপারটা জানতে পেরে সেই রাতেই খবরটা অমরদাদার বড়োমামাকে দিয়ে আসি। তিনি তখন কিছু করতে পারেননি; তবে আর ওদের এখানে আসতে দেননি। আপনি ঘটনাটা টের পেয়ে আমাকেও খুন করেন। তার ওপর, আজ আপনি দুটো নিরাপরাধ শিশুকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তাদের হাহাকার আর কান্না আপনি শুনতে পাচ্ছেন, ছোটোবাবু? আমি পাচ্ছি। এতবড়ো অন্যায়, এতবড়ো পাপ আর সহ্য করা যায় না। এতদিন যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলুম, আজ অমরদাদার চলে আসায় তা এসেছে। এবার আপনার সব খেলা শেষ, ছোটোবাবু।

বলতে-বলতেই পুলিশের গাড়ি বাড়ির ভেতরে এসে দাঁড়াল। বীরেন্দ্রনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে দেখলেন, তার পরেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মহেন্দ্রর গাড়ি কলকাতার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। পেছনের সিটে ইন্দ্র আর এষা অকাতরে ঘুমোচ্ছিল আর সামনের সিটে অমরেন্দ্র আর মীনাক্ষি চিন্তিত-বিষণ্ণ মুখে বসেছিলেন। মীনাক্ষি বললেন— লোকে কেন যে ভূতে ভয় পায়, জানি না। আজ দেখলুম, মানুষ অনেক বেশি ভয়ংকর।



ইন্দ্রনাথ রায় আর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বহুদিনের বন্ধু। দু-জনে একসঙ্গে গিরিডি শিলটন মাইকা কোম্পানিতে ঢুকেছিলেন আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে। তারপর অনেক উত্থান-পতনের পর একইসঙ্গে অবসর নিয়েছেন দু-বছর আগে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু হলে কী হবে, দু-জনের মধ্যে তফাত ছিল অনেক। ইন্দ্রনাথ ছিলেন লম্বাচওড়া, ফর্সা আর প্রচণ্ড ফূর্তিবাজ। হাসতে শুরু করলে থামতে পারতেন না। আর বিষ্ণুপদ ছিলেন ছোটোখাটো মানুষ। শ্যামবর্ণ, গম্ভীর আর কিছুটা অন্তর্মুখী। দু-জনের বন্ধুত্বটা যে কী করে টিকে ছিল সেটা অনেকেই ভেবে পেত না। আর শুধু কী বন্ধুত্ব? দু-জনের মধ্যে আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল। ইন্দ্রনাথের বড়ো ছেলে প্রদীপ্তর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিষ্ণুপদর একমাত্র মেয়ে কল্যাণীর। কৈশোরে মাতৃহারা কল্যাণীকে নিজের মেয়ের মতো করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথের স্ত্রী সুতপা।

অবসর নিয়ে বিষ্ণুপদ বাড়ি করেছিলেন গিরিডি শহর থেকে অনেকটা দূরে। সে জায়গাটা বেশ নির্জন। বাড়িঘর বেশি নেই, জঙ্গলও কাছে। একা থাকতেন আর একটি স্থানীয় সাইকেল রিকশাওয়ালা তাঁকে দেখাশুনো করত। ছেলেটির নাম মদন। সে ভোর বেলা এসে বাড়ির কাজকর্ম করে রান্না করে দশটা নাগাদ চলে যেত। মাঝে মাঝে রাত্রি বেলা বাড়ি ফেরার পথে খবর নিয়ে যেত আর বিষ্ণুপদ-র শহরে বা স্টেশনে যাবার দরকার হলে তার সাইকেলরিকশায় তাঁকে নিয়ে যেত।

ইন্দ্রনাথও বাড়ি করেছিলেন গিরিডিতে; তবে সে একেবারে শহরের মধ্যিখানে। তাঁর বন্ধুর মতো নির্জনে বসে বই পড়া তাঁর ধাতে সইত না। আর তাঁর তিন ছেলে আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে প্রায় সারা বছর ধরে তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন মহানন্দে। যতদিন গিরিডিতে থাকতেন, ততদিন অবশ্য রোজ বিকেলে বিষ্ণুপদর বাড়িতে যেতেন।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা। বিষ্ণুপদ অত্যন্ত উদবিগ্ন হয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। রাত অনেক হয়েছে কিন্তু শুতে যেতে পারছেন না। তখন লোডশেডিং চলেছে। বিষ্ণুপদ মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, আকাশে যেন মেঘ না-আসে আর উজ্জ্বল চাঁদের আলোটা যেন ঢাকা পড়ে না-যায়। তা যদি যায় তাহলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সবকিছু ঢাকা পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে,

পঞ্চাননের সাইকেল চালিয়ে তাঁর বাড়িতে আসা যে শুধু কঠিন হবে তা-ই নয় বিপজ্জনকও হবে। এ অঞ্চলে সম্প্রতি চুরি-ডাকাতি খুব বেড়ে গেছে। পঞ্চাননকে যদি কেউ রাস্তায় ধরে, তাহলে তার কাছে টাকা পয়সা হয়তো পাবে না কিন্তু তাকে মারধর করে তার সাইকেলটা কেড়ে নেবে।

পঞ্চানন ইন্দ্রনাথের কাজের লোক। অনেক দিন ধরে রয়েছে ও বাড়িতে। আজ সকালে কল্যাণীর সন্তান হবার কথা। সেই খবরটা তাকে টেলিফোন করে কলকাতা থেকে জানাবেন ইন্দ্রনাথ আর সে এসে বিষ্ণুপদকে খবর দেবে, এরকমই কথা ছিল। দুপুর নাগাদ উদবেগ চেপে রাখতে না-পেরে বিষ্ণুপদ মদনের রিকশা নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, ইন্দ্রনাথের টেলিফোন কাজ করছে না। পঞ্চানন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল যে বাবু, ইন্দ্রনাথ যে ভাবেই হোক, ঠিক খবর দেবেন আর যত রাতই হোক, সেই খবর সে তাঁকে পৌঁছে দেবেই।

রাত যখন এগারোটা বাজল বিষ্ণুপদ শুয়ে পড়াই স্থির করলেন। পঞ্চানন এত রাতে কী আর আসবে? খবরাখবর সব কাল সকালেই পাওয়া যাবে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে সবে লেপের ভেতরে ঢুকেছেন বিষ্ণুপদ, হঠাৎ বাইরে একটা হুংকার শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে একটা শাল জড়িয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। দেখেন গ্রিলের একপাশে ধূসর রঙের একটা কম্বল মুড়ি দেওয়া মংকি ক্যাপ পরা একটা লম্বাচওড়া লোক একটা লম্বা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল আগন্তুকটির হাতে সাদা উলের আস্তানা।

বিষ্ণুপদ হিন্দিতে প্রশ্ন করলেন— কৌন?

আগন্তুক আবার হুংকার দিয়ে উঠল— কী হয়েছে তোর? চশমা ছাড়া বই পড়তে পারিস না জানতুম। লোকজন চিনতেও অসুবিধে হচ্ছে না কি আজকাল?

বিষ্ণুপদ বললেন— ও তুই? এত রাতে? কী খবর? কখন এলি কলকাতা থেকে? বলতে বলতে গ্রিলের দরজার তলাটা খুলে দিলেন।

ইন্দ্রনাথ বারান্দায় উঠে লাঠিটা দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে বললেন— এসেছি আজ রাত্রের গাড়িতে। খবর অত্যন্ত ভালো। আজ ভোর চারটে চব্বিশ মিনিটে তুই দাদু হয়েছিস। সাত পাউন্ডের ছেলে। মা আর ছেলে দু-জনেই ভালো আছে।

বিষ্ণুপদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল। কম্পিত কণ্ঠে বললেন— এত ভালো খবর জীবনে কখনো পাব ভাবিনি। এসব তোর জন্যে। মানসী যে দায়িত্ব আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, তুই আমার পাশে না থাকলে সে দায়িত্ব আজকের এই সার্থকতায় কোনোদিন পৌঁছতে পারত না।

ইন্দ্রনাথ বললেন— আমি আবার কী করলুম? যা করবার তো তুই-ই করেছিস। আমরা ছিলুম শুধু তোর পাশে। জ্ঞান ফিরে চেয়ে প্রথম কথা কী বলেছে কল্যাণী, জানিস? বলেছে, বাবা খবর পেয়েছে?

বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলালেন। তারপর বললেন— আয় ভেতরে আয়।

ইন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললেন— না, ভেতরে যাব না। এখন ঝামেলা করিসনি তো! ট্রেন থেকে নেমে সোজা তোর এখান আসছি। এবার বাড়ি যাওয়া দরকার। কিছু কাজ আছে।

—তুই এলি কেন? একটা টেলিফোন করে পঞ্চাননকে খবর দিতে পারলি না?

ইন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন— এলুম তোর এই আনন্দটা স্বচক্ষে দেখব বলে। এমন একটা খবর কি টেলিফোনে দেওয়া যায়। তা ছাড়া, দেবই বা কী করে? তোর তো ফোন নেই, তাই তুই জানিস না। গত তিনদিন যাবৎ গিরিডির সমস্ত ফোন খারাপ। সবচেয়ে বড়ো কথা আমার মা-টা আশা করে আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোকে খবরটা দিতে হবে। তার কথা না-ভেবে কী করি বল?

—স্টেশন থেকে এ পর্যন্ত এলি কী করে? সাইকেল রিকশা এল?

—তা কখনো আসে? জয়সোয়াল মার্কেট পর্যন্ত রিকশা পেলুম। সেখানে রামেশ্বর চৌকিদারের কাছ থেকে লাঠিটা ধার করে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম। বেশি সময় লাগেনি, মিনিট পনেরো।

—চমৎকার! এখন তো জয়সোয়াল মার্কেটেও রিকশা পাবিনে। আজ থেকে যা না এখানে, কাল সকালে যাস।

—অসম্ভব! অনেকগুলো কাজ আছে, বললুম না? কাল ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। এখন চল, তোর মদনকে ঘুম থেকে ওঠাই। আপত্তি করবে না আশা করি।

—না তা করবে না।

দরজায় তালা দিয়ে বিষ্ণুপদ যখন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পিচের রাস্তায় উঠে এলেন, সারা পৃথিবী তখন জ্যোৎস্নায় যেন ভেসে যাচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। যতদূর দৃষ্টি যায় রাস্তা জনপ্রাণীহীন। যেদিকে জয়সোয়াল মার্কেটের মোড়, তার উলটোদিকে মদনের ঘর। মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ। দুই বন্ধু গল্প করতে করতে সেই দিকে রওনা হলেন। রাস্তার একপাশে ছোটো ছোটো একতলা বাড়ি অথবা কুঁড়েঘর। সেগুলো সব কটা অন্ধকার। কারুর মধ্যেই কোনো জনমানব আছে বলে মনে হয় না। অন্যপাশে ঝোপঝাড় তারপর কিছুটা ফাঁকা মাঠ, মাঠের শেষে জঙ্গল।

লাঠিটা কাঁধে নিয়ে বীরদর্পে হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনাথ বললেন— বুঝলি বিষ্টু এইরকম একটা লাঠি হাতে থাকলে আমি দুনিয়ায় কাউকে ভয় পাইনে। বলে লাঠির নানারকম গুণগান শুরু করে দিলেন।

এটা বেশিক্ষণ চলল না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথ। গলা নামিয়ে বললেন— কেউ আমাদের ফলো করছে। তিনজন লোক। আমাদের পেছনে ফুট দশেক দূরে ঝোপের আড়ালে।

বিষ্ণুপদ ইন্দ্রনাথের মতো গলা নামিয়ে বললেন— বলিস কী? তুই কী করে বুঝলি?

—আমি ঠিকই বুঝেছি। আয় তো, একটু মজা করি লোকগুলোর সঙ্গে। বলে ইন্দ্রনাথ বিষ্ণুপদর হাত ধরে টেনে একটা মস্ত গাছের আড়ালে চলে গেলেন।



বিষ্ণুপদ হাঁসফাঁস করে বললেন— মজা করবি কী-রে? লোকগুলো যদি ডাকাত হয়?

—ডাকাতই তো। দ্যাখ না কী করি!

গাছের তলাটা অন্ধকার। বাইরের চাঁদের আলোয় ইন্দ্রনাথকে সিলুয়েটে দেখতে পাচ্ছিলেন বিষ্ণুপদ। ইন্দ্রনাথ একহাত থেকে দস্তানা খুলে ফেললেন। গায়ে জড়ানো কম্বলের তলায় একটা কাঁধঝোলা ছিল; তার ভেতর থেকে একটা সাদা চাদর বের করলেন। তারপর কী যে করলেন, হঠাৎ বিষ্ণুপদ দেখলেন একটা সরু হাড় জিরজিরে সাদা হাত গাছের ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে লম্বা হয়ে ছুটে চলে গেল কিছুদূরে একটা ঝোপের দিকে।

সেইসঙ্গে ইন্দ্রনাথের গলা থেকে বেরিয়ে এল একটা রক্ত জল-করা ভয়াবহ চিৎকার। মনে হল যেন একশোটা কাঁসর ঘণ্টা একসঙ্গে বেজে উঠল। যদিও সেই শব্দটা হাসিই বলা যেতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুপদর হৃৎপিণ্ডটা চমকে ওঠে গলার কাছে এসে ধড়ফড় করতে লাগল।

ঘটনার ফলটা হল অদ্ভুত। তিনটে কালো কম্বল-মুড়ি দেওয়া লোক ঝোপটার পেছন থেকে লাফ দিয়ে উঠল। তাদের একজনের হাতে দিশি গাদা বন্দুক অন্য দু-জনের হাতে চকচকে তলোয়ার। সে সব অস্ত্র ফেলে ভয়ংকর আতঙ্কে তারা 'বাপ-রে, মা-রে' করে চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের দিকে ছুট লাগাল।

ইন্দ্রনাথ লাঠিটা টেনে এনে তার ওপরে মোড়ান চাদরটা খুলে নিয়ে কাঁধঝোলায় রাখলেন আর দস্তানাটা খুলে হাতে পরে নিলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ মোটা গলায় হাসতে শুরু করলেন। সে হাসি আর থামতেই চায় না। দম নেওয়ার ফাঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন— দেখলি, কেমন ভয় দেখালুম ব্যাটাদের। আর জীবনে এদিক মাড়াবে না, ডাকাতি করবার জন্য।

বিষ্ণুপদ ততক্ষণে একটু সামলেছেন। বললেন— তোর ছেলেমানুষি আর গেল না। ডাকাতের সঙ্গে এরকম ফাজলামো কেউ করে? যদি ভয় না পেত?

—পাবে না মানে? এরা হল গেঁয়ো ডাকাত, এদের যে কতরকম কুসংস্কার তার ইয়ত্তা নেই। আর সেইসব কুসংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে ভূতের ভয়। যদি শহুরে ডাকাত হয় তো একটা কথা ছিল। তারা লেখাপড়া জানে, ভূত বলে যে কিছু নেই বা থাকতে পারে না, সেটা তারা জানলেও জানতে পারে। কিন্তু এরা? যত সব গোমুখ্যু লোক, এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভূতের ভয়। বলে আবার হা-হা করে হাসতে শুরু করলেন ইন্দ্রনাথ।

বিষ্ণুপদ-র মোটেই হাসি পাচ্ছিল না। তিনি একটু গম্ভীর হয়েই গাছের তলা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এলেন। বললেন— ঢের হয়েছে। এবার চল, মদনকে ঘুম থেকে ওঠাই।

ইন্দ্রনাথ বললেন— তার আর দরকার হবে না। তোর বাঁ-দিকে তাকিয়ে দেখ। একটা জিপ আসছে না? ওটা তোকেই নিতে আসছে।

সত্যিই একটা গাড়ির দুটো অত্যুজ্জ্বল হেডলাইটের আলো দেখতে পেলেন বিষ্ণুপদ। বললেন— একটা গাড়ি আসছে ঠিকই। এত রাতে আমাকে নিতে আসছে কেন?

—অত জানি না। তবে মার্কেট পুলিশ স্টেনের সাব-ইন্সপেক্টর রণধীর সিনহা আসছে বলে মনে হচ্ছে।

রণধীর বিষ্ণুপদর চেনা লোক, বিএ পরীক্ষার আগে তাঁর কাছে ইংরেজি পড়তে আসত। একটু আশ্চর্য হয়ে বিষ্ণুপদ স্বগতোক্তি করলেন— রণবীর আসছে? কী হল আবার?

দেখতে দেখতে গাড়িটা কাছে চলে এল। সেটা পুলিশের জিপই বটে। ভেতর থেকে রণধীর বেরিয়ে এলেন। বললেন— একী স্যার! এত রাতে আপনি এখানে! খবরটা কী পেয়েছেন?

—খবর? কী খবর বলো তো?

রণধীর মাথা নীচু করে বললেন— আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে স্যার। আপনার বন্ধু মি. ইন্দ্রনাথ রায় আজ রাত্রের ট্রেনে এখানে এসেছিলেন। স্টেশন থেকে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে বোধ হয় আপনার কাছেই আসছিলেন। জয়সোয়াল মার্কেটের কাছে একটা ছুটন্ত মালবোঝাই ট্রাক প্রথমে রামেশ্বর গোয়ালাকে চাপা দেয় তারপর ওঁর সাইকেল রিকশায় ধাক্কা মারে। দু-জনেই অন দি স্পট মারা যান। ওঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলুম। দেখলুম আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তাই, আপনার কাছে এসেছি।

বিষ্ণুপদ-র সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। কোনোরকমে বললেন— ইন্দ্র? বলে পেছনের গাছটার দিকে তাকালেন। চাঁদের আলোয় দেখলেন একটা নিশাচর পাখি প্রকাণ্ড ডানা মেলে ‘হা-হা’ করে ডাকতে ডাকতে ওঁর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।



নন্দিনী আর তার মা শিউলি হুগলি জেলার দোমালা গ্রামে থাকে। ওদের একতলা বাড়িটা খুব পুরোনো কিন্তু পাকাবাড়ি। বাড়িটা বানিয়েছিলেন নন্দিনীর ঠাকুরদাদার বাবা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঠিকেদারি করে অনেক টাকা করেছিলেন তিনি। সেই টাকাতেই প্রায় দশকাঠা জমির ওপরে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছিল। বাড়িটার সামনে বাগান আর কিছু ফাঁকা জমি, পেছনে গোয়ালঘর, কুয়োতলা, চানের ঘর ইত্যাদি।

দোমালা গ্রামে নন্দিনীদের বাড়িটার একটু বদনাম আছে। অনেকে অনেক কথা বলে। কিন্তু নন্দিনীরা মোটামুটি নিশ্চিন্তে আর নির্ভয়েই ওখানে থাকে। প্রতিবেশীরা কেউ কিছু বলতে এলে শিউলি বলেন— এখানে তেমন কেউ থাকলে তো তাঁরা নন্দিনীর পূর্বপুরুষ। তাঁরা আমাদের খামোখা ভয় দেখাতে বা কোনোরকম ক্ষতি করতে যাবেন কেন? ওঁদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো শত্রুতা নেই ; বরং সম্পর্কটা স্নেহের।

নন্দিনীর বাবা পঞ্চানন কলকাতার কাছে একটা কারখানায় কাজ করেন আর প্রত্যেক শনিবার তাঁর গ্রামের বাড়িতে আসেন। যখনই আসেন, মেয়ের জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসেন আর এসেই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কখনো যান নদীর ধারে, কখনো বা সাইকেল করে দিয়াড়া স্টেশনে। সারাদিন দু-জনের কথা আর ফুরোয় না। সোমবার খুব ভোরে পঞ্চানন ফার্স্ট ট্রেন ধরে তাঁর কাজের জায়গায় ফিরে যান। নন্দিনী তখন ঘুমিয়ে থাকে।

নন্দিনীর বয়েস ন-বছর, কিন্তু তাকে নিতান্ত শিশু ভাবলে ভুল করা হবে। যখন তার বাবা থাকেন না, তখন তাকে সংসারের কত কাজ যে করতে হয়, তার কোনো সীমা নেই। তারমধ্যে আবার স্কুলের পড়া আর একটুখানি পুতুলখেলা তো আছেই। ওদের রান্নাঘরের একপাশে তার খেলাঘর। সেখানেই তার পুতুলের সংসার।

সেবছর পুজোর সময়, পঞ্চানন মেয়ের জন্যে এনেছিলেন দশটা কৃষ্ণনগরের মাটির সেপাই। তাদের প্রত্যেকের মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, মাথায় উঁচু টুপি আর পরনে ঝকমকে লাল-সবুজ উর্দি। তাদের কারোর হাতে তরোয়াল, কারোর সঙ্গিন লাগান বন্দুক আবার কারোর হাতে বর্শা। বাক্স থেকে বের করা মাত্র তারা নন্দিনীর সবচেয়ে প্রিয় পুতুল হয়ে পড়ল। এখন তারা তাকের ওপরে সাজানো আছে। সে ছাড়া আর কারোর তাদের ধরবার অধিকার নেই। এমনকী নন্দিনীর বেস্টফ্রেন্ড দীপালিরও নয়। ওর ধবধবে সাদা বেড়াল 'বড়োসাহেব' আড়চোখে পুতুলগুলো দেখে কিন্তু তাদের কখনো বিরক্ত করে না। এমনকী নন্দিনী যখন ওদের নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে, বড়োসাহেব তখন চৌকাঠের বাইরে বিমর্ষভাবে চুপ করে বসে থাকে।

তবে হ্যাঁ, রাত একটু বাড়লেই নন্দিনী কিন্তু আর তার মায়ের কাছ থেকে সরতে চায় না। শিউলি মাঝেমাঝে বললেন— বড্ড ভীতু তো তুই! বাইরে অন্ধকার হলেই আমার গা ঘেঁষে থাকিস। কীসের ভয় তোর? ভূতের? পাড়ার লোকের এসব বাজে কথায় কান দিবি না তো।

নন্দিনী বলে— ভয় আবার কী? সারাদিন তো তোমার কাছে বসাই হয় না। কত কাজ করতে হয় না আমাকে? এই রাত্রি বেলায় তো তোমার কাছে আসতে পারি।

শিউলি মেয়ের কথা শুনে হাসেন কিন্তু তার সবটা বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। তিনি বোধ হয় বুঝতে পারেন যে নন্দিনী তাকে কিছু গোপন করে যাচ্ছে।

তাঁর ধারণাটা সত্যি। নন্দিনী তাঁকে যে কথাটা বলে না তা হল সে বেশ কয়েক বার চাঁদনি রাতে বারান্দায় আরামকেদারার ওপর ধুতি আর ফতুয়া পরা একজন বুড়োমানুষকে চুপ করে বাইরে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে দেখেছে। এই কথাটা সে কাউকে বলেনি, এমনকী দীপালিকেও নয়।

আরও একটা ঘটনা তার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। সন্ধে হলেই বড়োসাহেব কিছুতেই বারান্দায় যাবে না। একদিন বিকেল থেকে নন্দিনী বড়োসাহেবকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে ছিল। যেই সূর্য ডুবে গেল, অমনি বড়োসাহেব হাঁচোড়পাঁচোড় করে ওর কোল থেকে নেমে দৌড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

নন্দিনী মনে মনে ভাবে, ভূত যদি থাকে তো থাক না। সে তো তাদের কোনো ক্ষতি করছে না। আর কেনই বা করবে? তাকে তো আর কেউ বিরক্ত করতে যাচ্ছে না। এই জন্যেই সে একটা ইচ্ছেকে চেপে রেখে দিয়েছে। ইচ্ছেটা হল, ওই ফতুয়া পরা বুড়োমানুষটির সঙ্গে গিয়ে আলাপ করবার। কিন্তু, ওর ভয় হয় তাতে যদি উনি বিরক্ত হন। তখন যে কী হবে তা তো বলা যায় না। তার চেয়ে এই ভালো, যে যার আপন মনে থাকো।

বোধ হয়, এই জন্যেই ওর বাবা বাড়িতে এলে দিনের বেলা যদিও বা আরামকেদারায় বসেন, সন্ধের পর কক্ষনো বসেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলেন— আমার তো সর্দির ধাত। বাইরে বসলে যদি ঠান্ডা লেগে যায়, তাই বসি না।

সেবছর মাঘ মাসে খুব ঠান্ডা পড়েছিল। রাত্রে একটা কম্বলে কুলোচ্ছিল না, দুটোর দরকার পড়ছিল। সবাই শীতে জবুথুবু হয়ে পড়ছিল। দিনের বেলা রোদ ওঠে দেরিতে আর বিকেল হতে না-হতেই তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। সবাই তখন বাড়িতে ঢুকে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকে। এমনকী দোমালা পূর্বাচল ক্লাবে দু-চারজন মাংকি

ক্যাপের ওপরে কম্ফর্টার জড়ানো আগাপাস্তলা কম্বল মুড়ি দেওয়া বুড়ো দাবাড়ু ছাড়া আর কারোর দেখা পাওয়া যায় না।

একমাত্র শিউলির কোনো হেলদোল নেই। একটা আলোয়ান গায়ে দিয়ে খালি পায়ে সংসারের যাবতীয় কাজ অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছেন।

নন্দিনী তার বাবাকে বলল— দেখেছ বাবা, আমারা দুটো করে গরম জামা পরে তার ওপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। আর মা কেবল একটা গরম চাদর দিয়ে সব কাজ করে যাচ্ছে।

পঞ্চানন মেয়ের কানে কানে বললেন— হবে না কেন? তোর মা যে পাগল। পাগলের শীত লাগে না, জানিস না?

শুনে নন্দিনী হি হি করে হাসতে লাগল। শিউলি গোয়ালঘর থেকে মুখ বের করে বললেন— এ্যাই নন্দু, কী বলল রে তোর বাবা?

নন্দিনী বলল— কিছু না, মা। বাবা বলল যে তুমি যে আজকে আলু-ফুলকপির তরকারিটা করেছিলে, সেটা খুব ভালো হয়েছিল।

কিছুদিন বাদে সরস্বতী পুজো। সেদিনটা বুধবার। তার পরের শনিবার পূর্বাচল ক্লাবের উদ্যোগে কলকাতা থেকে এক বিখ্যাত যাত্রাপার্টি দোমালায় এসে উপস্থিত হল। এদিকে গ্রামে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। সরস্বতী পুজোর দু-সপ্তাহ আগে থেকে ক্লাবের উদ্যোক্তারা রিকশাভ্যানে চড়ে মাইক বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই 'বিজন বনের অচিন পাখি' যাত্রায় নায়ক-নায়িকা দু-জনেই বাংলার সিনেমা জগতের বিখ্যাত তারকা। নাচে আছেন মুম্বাইয়ের তারকা মিস জুলি। এঁদের অভিনয় দেখবার এমন সুযোগ যেন না-হারান। শিব মন্দিরের পাশের মাঠে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। গ্রামসুদ্ধ ছেলেমেয়ে সারাদিন সেখানেই পড়ে রয়েছে।

যাত্রার দিন বিকেল বেলা পাড়ার কয়েক জন মহিলা এসে পঞ্চাননকে বললেন যে রুনু মাসিমার শরীর খারাপ হয়েছে তাই তাঁদের একটা টিকিট বেশি হচ্ছে, শিউলি যদি সেই টিকিটে তাঁদের সঙ্গে যান তাহলে খুব ভালো হয়। ভোর না-হতেই সবাই ফিরে আসবেন।

পঞ্চানন তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন কিন্তু শিউলি বেঁকে বসলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রাজি হলেন বটে তবে যাবার আগে নন্দিনী আর পঞ্চাননকে একগুচ্ছ উপদেশ দিতে দিতে গেলেন।

পঞ্চানন বার বার বলতে লাগলেন— কোনো ভয় নেই তোমার। কোনো চিন্তা কোরো না। আমরা সব ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

বাগানের গেট খোলার ঘড়ঘড় শব্দে নন্দিনীর ঘুম ভেঙে গেল। মা এসেছে ভেবে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা ফাঁক করে বাইরে তাকিয়েই চট করে জানলাটা বন্ধ করে দিল। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ঠেলতে ঠেলতে বলল— বাবা, বাবা, কতগুলো মোটকামতন লোক হাতে কী সব নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকছে। ওরা ডাকাত নয় তো, বাবা?

পঞ্চানন ঘুম জড়িত গলায় বললেন— ডাকাতই তো। তুই শুয়ে পড়। ও নিয়ে ভাবিস না।

—আমি ডাকাত দেখব, বাবা।

পঞ্চানন হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে বললেন— ডাকাত দেখবি? ঠিক আছে, চল। আমিও দেখি।

বলে মেয়েকে নিয়ে পঞ্চানন আবার জানলার কাছে গিয়ে সেটা অল্প একটু ফাঁক করে বাইরে তাকালেন। দেখা গেল, পাঁচটি মুস্কো লোক হাতে তরোয়াল আর দেশি পিস্তল নিয়ে বাগানে ঢুকছে। একজন ফিস ফিস করে বলল— সাবধান, বাড়িতে লোক আছে। গলার আওয়াজ পেয়েছি।

নন্দিনী বলল— এবার ওরা কী করবে, বাবা?

পঞ্চানন আবার হাই তুলে বললেন— দ্যাখ-না কী করে!

লোকগুলো তখন গুঁড়িমেরে সাবধানে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ, মনে হল যেন ছাদের ওপর থেকে একটা ঘন কুয়াশার স্তূপ পাক খেতে খেতে বাগানের ওপরে নেমে এল আর লোকগুলো তার ভেতরে ঢাকা পড়ে গেল।

নন্দিনী বলল— ওই যাঃ, সবাই চাপা পড়ে গেল যে, বাবা। কিচ্ছু যে দেখতে পাচ্ছি না।

পঞ্চানন বললেন— তবে আর কী? চল শুয়ে পড়ি। ঠান্ডা লাগছে।

—আর একটু দেখি, বাবা?

পঞ্চানন একটা মোড়া টেনে এনে মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে বললেন— ঠিক আছে। তাহলে আমিও দেখি।

দেখবার আর কী আছে? জানলার বাইরে তখন একটা ম্যাড়মেড়ে সাদা কুয়াশার স্তূপ। তার ভেতরে বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, সেই স্তূপের ভেতরে ধুম-ধাম, ধপাস-ধপাস করে শব্দ হতে আরম্ভ করল। আর, প্রায় তার সঙ্গে-সঙ্গেই নানারকম গলায় চ্যাঁচামেচি শুরু হল, এ্যাই, কে আমাকে মারলি রে? উফ, আমাকে মারছিস কেন? এটা তো আমি রে। কে আমাকে খোঁচা মারছিস? লাগছে যে! ভ্যাঁ ভ্যাঁ, বাবারে, মেরে ফেললে রে। ওফ, এত জোরে মারলি কেন? আবার মারলি? গেলুম রে, মলুম রে!

নন্দিনী বলল— কে কাকে মারছে, বাবা?

পঞ্চানন বললেন— আমি কী করে জানব? দেখতে পাচ্ছি নাকি কিচ্ছু? বোধ হয় নিজেরাই মারামারি করছে।

শব্দ আর চ্যাঁচামেচি যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল।

নন্দিনী জিজ্ঞাসা করল— কী হল, বাবা? সব চুপ হয়ে গেল কেন?

পঞ্চানন বললেন— কী জানি, সবাই চলে টলে গেল, মনে হচ্ছে। চ, আমরাও শুয়ে পড়ি।

নন্দিনী আরও কিছুক্ষণ কুয়াশার ভেতরে কিছু দেখা যায় কি না সেই আশায় বসে রইল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ণমুখে বাবার পাশে কম্বলের তলায় গিয়ে ঢুকল।

সদর দরজায় প্রবল ধাক্কা দেবার শব্দে নন্দিনী আর তার বাবার ঘুম ভাঙল। পঞ্চানন লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন বাইরে শিউলি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্ক।

পঞ্চানন বললেন— কী ব্যাপার? দরজা ভেঙে ফেলবে নাকি?

শিউলি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন— কী ব্যাপার, মানে? তুমি কিছু জানো না? বারান্দায় বেরিয়ে এসো, তাহলেই জানতে পারবে।



মেয়ের হাত ধরে পঞ্চানন বারান্দায় এলেন। তখন সবে পুব আকাশে আলোর ছোঁয়া লেগেছে, একটা দুটো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। শীতের সকালের সেই আবছা আলোয় দেখা গেল বাগানের নীচু পাঁচিলের ওপাশে যাত্রা থেকে ফেরা দর্শকদের ভিড়, তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু কারোর মুখে কোনো কথা নেই। সবাই স্তম্ভিত বিস্ফারিত চোখে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেখানে ঘাসের ওপরে পাঁচজন লোক চিতপাত হয়ে পড়ে আছে। কেউ তাদের এমন মার মেরেছে যে তাদের আর ওঠবার বা নড়াচড়া করবার ক্ষমতা নেই। তাদের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র।

একটু বাদেই থানার দারোগাবাবু সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন। লোকগুলোর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে বললেন— একী, এরা তো দেখছি ডেঞ্জারাস ন্যাড়া ঘেন্টুর দল। কী সর্বনাশ, এরা এখানে কোত্থেকে এল? আর এদের এমন দশাই বা করলে কে?

নন্দিনী বলল— আমি জানি। ওরা আমাদের বাড়িতে এসেছিল ডাকাতি করতে। তারপরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে এই অবস্থা হয়েছে। ভীষণ কুয়াশা ছিল তো, তাই কেউ দেখতে পায়নি।

দারোগাবাবু কথাটা বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। একটা ধরাশায়ী ন্যাড়ামাথা লোকের মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বললেন— এ্যাই ঘেন্টু, তোদের এই দশা কে করল

রে?

ঘেন্টু কাতরাতে কাতরাতে বলল— সেপাই, সেপাই।

দারোগাবাবু সোজা হয়ে উঠে বললেন— এই রে, মার খেয়ে লোকটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, দেখছি। কাল তো থানার সব কটা সেপাই যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। তাদের দায় পড়েছে এই ঠান্ডায় মাঝরাত্তিরে ডাকাত দলের সঙ্গে মারামারি করবার। সে যাহোক, ওরে রামবিলাস, সব কটাকে জিপে তোল দেখি। আগে তো হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাই। তারপরে লকআপে ঢোকাব।

নন্দিনীর কাছে সবকথা শুনে শিউলি পঞ্চাননকে আড়ালে ডেকে বললেন— ওরা যে আসবে, সেটা তুমি জানতে, তাই না? কী করে জানলে? ঠাকুরদাদা বলেছেন, না?

পঞ্চানন চোখ পিটপিট করে বললেন— সে তো বলাই বাহুল্য। আর এইবার বুঝতে পারছি, ঠাকুরদাদা কেন আমাকে দশটা সেপাইপুতুল কিনে আনতে বলেছিলেন।



ওষুধের স্যাম্পেলের ব্যাগটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শ্যামল বলল— তুমি অকারণে ভয় পাচ্ছিলে, প্রতিমা। দ্যাখো তো, রুমা কী আনন্দেই না রয়েছে। সন্ধে হয়ে গেল, এখনও কেমন খেলে যাচ্ছে, বাড়ি আসার নাম নেই। অথচ তুমি ভেবেছিলে এরকম একটা নির্জন ফাঁকা জায়গায় ও হাঁপিয়ে উঠবে। শুনতে পাচ্ছ ওর হাসির শব্দ? আসতে চাইছিলে না। না-এলে এমন মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে মেয়েটা এরকম খেলবার সুযোগই হয়তো কোনোদিন পেত না।

প্রতিমা কিন্তু গম্ভীর হয়ে রইল। কোনো কথা না-বলে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল। চা খেতে খেতে শ্যামল প্রশ্ন করল— কী হল তোমার? এমন ব্যাজার হয়ে আছো কেন? মনে হচ্ছে যেন তুমি নিজেই হাঁপিয়ে উঠেছ। আর তো মোটে তিনটে দিন। এর মধ্যে আমি এই অঞ্চলের সব কটা ডাক্তার আর হাসপাতাল ঘুরে নেব। মাঝে একদিন যাব উশ্রী ফলস দেখতে। সেখানে পিকনিক করব। ব্যস, তারপর কলকাতা।

প্রতিমা বলল— আমি হাঁপিয়ে উঠিনি। আমার কেমন যেন ভয় করছে।

—ভয় করছে? সে কী, কেন? এই গণেশমুণ্ডায় না-আছে কোনো বাঘ-ভালুক, না-আছে চোর-ডাকাত। তোমার কীসের ভয়?

—আচ্ছা, শহরের ভেতরে স্টেশনের কাছে কোনো বাড়ি পেলে না?

মাথা নেড়ে শ্যামল বলল— নাঃ, পেলুম না। ওই প্রাণজীবন লজে হয়তো ঘর পাওয়া যেত। আমি একা এলে হয়তো ওখানেই থাকতুম। কিন্তু তোমাদের নিয়ে তো ওই নোংরা জায়গায় থাকতে পারি না। এই বাড়িটা কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চারদিক ফাঁকা। অথচ শহর তো বেশি দূরে নয়। আমি তো ভেবেছিলুম এখানে থাকতেই তোমাদের বেশি ভালো লাগবে।

—ভালো হয়তো লাগত, কিন্তু...

—কিন্তু কী? কীসের ভয় পাচ্ছ বলো তো? একা থাকতে?

—ভয় আমাকে নিয়ে পাচ্ছি না, পাচ্ছি রুমাকে নিয়ে।

—রুমাকে নিয়ে ভয়? কেন, কী করেছে সে?

—তুমি তো দেখো না। আমি সারাদিন ওকে খেলতে দেখি। সবসময় আমার মনে হয় যেন ওর সঙ্গে আর একজন কেউ আছে। ও তার সঙ্গে কথা বলে, হাসিঠাট্টা করে। এমনকী ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত করে। অথচ কাউকে দেখতে পাই না। জিগ্যেস করলে বলে, ওর একজন বন্ধু আছে। সে নাকি খুব সুন্দর দেখতে। তার খুব লম্বা চুল আর সুন্দর সুন্দর জামা পরে। আমি জানি ও খুব কল্পনাপ্রবণ। বাগবাজারেও ও যখন একা-একা খেলে, একটা পুতুল বা নিদেনপক্ষে একটা পাউডারের কৌটোর সঙ্গেও অনর্গল কথা বলে যায়, যেন সেটা একটা জ্যান্ত মানুষ। সে জন্য প্রথম প্রথম আমি ভয় পাইনি। কিন্তু, লক্ষ করছি,এখানকার ব্যাপারটা সেরকম নয়।

—কীরকম ব্যাপার?

—কীরকম জানো? হালে দেখছি, ওর কাল্পনিক বন্ধুর কাছে শুনে এসে ও যেসব কথা বলছে, সেসব কথা ওর জানার কথা নয়। পরশুদিন তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছিল বলে চিন্তা করছিলুম। রুমা এসে আমাকে বলল, চিন্তা কোরো না, বাবার সাইকেলরিকশার চাকা পাংচার হয়ে গেছে, তাই ফিরতে দেরি হচ্ছে। কথাটা নাকি ওকে ওর বন্ধু বলেছে এবং কথাটা দেখলুম সত্যি। আর আজ সকালে হঠাৎ দৌড়ে এসে বলল, চৌবাচ্চার জলে একটা বিছে পড়েছে, সাবধানে গায়ে জল ঢেলো। এও দেখলুম সত্যি এবং এটাও ওকে বলেছে ওর এই বন্ধু।

প্রতিমার কথা শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল শ্যামল। বলল— একটি পাঁচ বছরের কল্পনাপ্রবণ আর সংবেদনশীল বাচ্চার পক্ষে এই ধরনের কথা বলা বোধ হয় খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। টেলিপ্যাথি জানো? এটা বোধ হয় সেই ব্যাপার। যারা খুব সেনসিটিভ, তাদের মধ্যে এই ক্ষমতাটা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই থাকে। আমাদের দেশে মুনিঋষিদের আছে। তাঁদের বলে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। বিদেশে তো এ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলেছে।

প্রতিমা বলল— টেলিপ্যাথি হলে তো ভালোই। তবে কলকাতায় তো ওর এই ক্ষমতা কখনো দেখিনি। এখানে এসে সেটা চাগিয়ে উঠল কেন, কে জানে। আমার ভালো লাগছে না। টেলিপ্যাথিই হোক আর যে প্যাথিই হোক, এতে কোনো বিপদ-আপদ না হলেই হল। চল, আমরা কালই কলকাতায় ফিরে যাই।

মাথা নেড়ে শ্যামল বলল— তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। দেখি আজ আমি ওর সঙ্গে কথা বলে সমস্যাটা বোঝবার চেষ্টা করি।

যাওয়ার সময় কথাটা পাড়ল শ্যামল। রুমাকে জিগ্যেস করল— তোমার কেমন লাগছে এখানে?

মাথা নেড়ে রুমা বলল— খুব ভালো বাবা।

—বন্ধু হয়েছে?

—হ্যাঁ। আমি রোজ তার সঙ্গে খেলি।

—কী নাম তোমার বন্ধুর?

রুমা একগাল হেসে বলল— ওর নাম হাসি। ও না সবসময় হাসে। রাগ করলেও হাসে। খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে চিটিং করে আমাকে খেপায়।

—কোথায় থাকে তোমার বন্ধু?

—তা তো জানি না। এখানেই কোথাও হবে। আমি যখনই খেলতে যাই, দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে।

—ও যে তোমার সঙ্গে সারাদিন খেলে বেড়ায় তাতে ওর বাবা-মা রাগ করেন না?

—নাঃ। ওর বাবা-মা এখানে তো নেই। হাসি বলছিল, ওর বাবা-মা ওকে এখানে রেখে কলকাতায় চলে গেছে। ওর কী একটা অসুখ করেছিল। তারপরে ওর বাবা-মা ওকে রেখে চলে গেল।

—তুমি ওকে বাড়িতে ডেকে আনো না কেন? আমরা তো ওর সঙ্গে গল্প করতে পারি।

—তা হবে না। হাসি বলেছে, তোমরা ওকে দেখতে পাবে না।

কম্পিতকণ্ঠে শ্যামল বলল, কেন? আমরা দেখতে পাব না কেন?

—হাসি বলেছে, আমি তো ওর বন্ধু, তাই শুধু আমি ওকে দেখতে পাব। তোমরা পাবেই না। বলে রুমা হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল— জানো তো বাবা, হাসি না আমাকে একটা প্রেজেন্ট দেবে বলেছে। খুব সুন্দর প্রেজেন্ট। আর, খুব দামি।

—তাই নাকি? কী প্রেজেন্ট দেবে?

—তা জানি না। তবে খুব সুন্দর বলেছে। বলেছে, মাটির নীচে আছে। ওর মা যাওয়ার আগে রেখে গেছিল। মাটি কেটে বের করে আনতে হবে। আমরা যেদিন যাব, তার আগের দিন ও দেখিয়ে দেবে কোথায় মাটি কাটতে হবে।

রুমা ঘুমিয়ে পড়ার পর শ্যামল আর প্রতিমা বসবার ঘরে এসে বসল। প্রতিমা উদবিগ্ন গলায় জিগ্যেস করল— কিছু বুঝলে?

শ্যামল গম্ভীর মুখে, চিন্তিতভাবে বলল— আমি তোমার সঙ্গে একমত যে, ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের নয়। এই ঘটনাটা বোধ হয় টেলিপ্যাথির পর্যায়ে পড়ে না। এখানে কিছু একটা আছে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। তবে, ভরসার কথা এই যে, যা কিছুই থাক, সেটা অনিষ্টকর নয়। যদি তা হত তা হলে তোমাকে স্নানের আগে সাবধান করে দিত না।

—তা হোক, তবু আর থেকে কাজ নেই। চলো, আমরা কালই সকালের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাই।

শ্যামল মাথা নাড়ল। বলল— না কাল নয়। পরশুই চলে যাব। কাল একটা কাজ করতে হবে।

—আবার কীসের কাজ? থাক-না এখন! পরে একবার এসো না-হয়। দু-দিন দেরি হলে তোমার ওষুধ কোম্পানি উঠে যাবে না।

—আমি অফিসের কাজের কথা বলছি না। বলে শ্যামল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বলল— আমি ভাবছি প্রেজেন্টটা কী হতে পারে।

প্রতিমা যেন স্বগতোক্তি করছে এইভাবে বলল— আমিও ঠিক সেই কথা ভাবছিলুম। বলেছে, খুব সুন্দর আর খুব দামি। কী জানি কী জিনিস। নাঃ, এসবে লোভ করতে নেই। চলো, কালই চলে যাই।

শ্যামল একথার কোনো জবাব দিল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— যখ কাকে বলে জানো?

প্রতিমা কম্পিতকণ্ঠে বলল— জানি। মাটির তলায় মণিমুক্তো পুঁতে তার সঙ্গে একটা বাচ্চাকেও চাপা দিয়ে দিত আগেকার দিনে। সেই বাচ্চাটা নাকি যখ হয়ে সেই গুপ্তধন সামলাত। যে এই গুপ্তধনের দিকে হাত বাড়াত, সেই যখ তার ঘাড় মটকাত। ওরে বাবা! তুমি আর এসব কথা ভেব না তো। চলো, আমরা কালই চলে যাই।

শ্যামল হাত নেড়ে বলল— ধ্যাত্তেরি। তখন থেকে শুধু কাল চলে যাই, কাল চলে যাই করছে। সব ব্যাপারে অত ভয় পেলে চলে? আর ঘাড় মটকানোর তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা তো আর চুরি করছি না। ওই হাসি না কে, সে তো নিজের থেকে দেবে বলেছে। প্রেজেন্ট! প্রেজেন্ট দিয়ে কেউ ঘাড় মটকায়?

—হ্যাঁ, তাও তো বটে। আচ্ছা, প্রেজেন্টটা কী হতে পারে গো? আমার তো মনে হয় জড়োয়ার হার হবে। লাখখানেক টাকা দাম তো নিশ্চয়ই হবে। হবে না? আমি কিন্তু হারটা বেচে দেব। ওসব যখের ধন-টন বাড়িতে রেখে কাজ নেই বাবা!

—একটা হার হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। আগে বের তো করি। এখন আমাদের কী করণীয় সেটা তোমাকে বলছি, শোনো, তুমি রুমাকে বলে দাও যে, পরশু সকালে আমরা কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। দুখিয়া বলে যে কাজের লোকটি আছে, তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে আজ দুপুরের মধ্যে বিদেয় করে দাও। রুমাকে বলো যে প্রেজেন্টটা কোথায় আছে সেটা আজ বিকেলের মধ্যে জেনে নিতে। আমরা সন্ধে বেলা মাটি কাটা শুরু করব।

—তুমি নিজে মাটি কাটবে? পারবে? কোদাল চালানো বড়ো সহজ ব্যাপার নয়।

—জানি সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু পারতেই হবে। এসব ব্যাপারে অন্য কারুর সাহায্য নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

—তা বটে। আচ্ছা, সন্ধে বেলা মাটি না-কেটে দুপুরে কাটলে হয় না? সন্ধে বেলা যদি সাপখোপ বেরোয়?

—দূর! এই শীতকালে সাপ কোত্থেকে বেরুবে? বিছে-টিছে বেরোতে পারে। তবে, আমি জুতো-মোজা আর ফুলপ্যান্ট পরে মাটি কাটব। তা হলে আর কোনো ভয় থাকবে না। তুমি শুধু নজর রাখবে, কেউ যেন এসে না পড়ে। ওই প্রান্তিক বাড়িটার প্রফেসর নন্দদুলাল ঘোষ আর সন্ধ্যার কুলায় বাড়িটার যদুনাথ মিত্তিরকেই আমার ভয়।

—যা বলেছ। দুই বুড়োর কাজকর্ম কিছু নেই। দিনরাত সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে, বউমা, ভালো আছ তো? বলে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে।

—ওরা যদি আসে, কিছুতেই গেটের ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আমার কথা জিগ্যেস করলে বলবে যে, আমার স্বামীকে বাগানে পেয়েছে, তাই মাটি কোপাচ্ছে। আর অন্য কথা বলে আটকে রাখবে।

—তা না-হয় রাখব। কিন্তু রুমা কী করবে? সন্ধে বেলা তো আর তাকে ঘুম পাড়াতে পারব না।

—ঘুম পাড়াতে যাবে কেন? রুমা তো আমার সঙ্গেই থাকবে। ভালো করে গরম জামাকাপড় আর জুতো-মোজা পরিয়ে দিও। ও-ই তো আমাদের গ্যারান্টি যে, আমরা ওর

জন্যেই গুপ্তধন খুঁজছি। আমরা যে কোনো উটকো লোক নই, ওর উপস্থিতি তো সেটাই প্রমাণ করবে।

—আমার কেমন ভয় করছে। রুমার কোনো বিপদ-আপদ হবে না তো?

—না, না, কী বিপদ হবে? আমি তো সঙ্গে আছি। তা ছাড়া, এসব ব্যাপারে একটু ঝুঁকি তো নিতেই হয়। ভাগ্য তো আর এমনি-এমনি খোলে না। কিছু ভয় নেই তোমার।

সারারাত ঘুমোল না দু-জনে। পরদিন সকাল হতে না-হতেই ব্রেকফাস্টের জন্য তাড়া লাগাল শ্যামল। বলল— তাড়াতাড়ি করো। আমাকে যে বেরুতে হবে।

প্রতিমা বলল— এত সকালে বেরুবে? ডাক্তারবাবুদের তো ঘুমই ভাঙবে না এখন।

—দুত্তোর ডাক্তার! ডাক্তার-ফাক্তার নয়, আমি যাব মাটি কাটার যন্ত্রপাতি কিনতে।

চট দিয়ে মোড়া যন্ত্রপাতি নিয়ে শ্যামল সাইকেলরিকশা চড়ে ফিরল দশটা নাগাদ। ফিরেই গেটে একটা মস্ত তালা লাগাল। তারপর চলল উদগ্রীব প্রতীক্ষা। বিকেল বেলা রুমার কাছে খবর পেল যে, বাড়ির পিছনে একটা বটগাছের নীচে হাসির উপহার লুকোনো আছে।

সূর্যাস্তের একটু আগে, শ্যামল সপরিবারে বটগাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় কম্পিত হাতে শাবল বাগিয়ে ধরে রুমাকে প্রশ্ন করল— কোথায় খুঁড়তে শুরু করি বল তো?

—বলছি বাবা। বলে রুমা একদৌড়ে বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। একটু বাদে ফিরে এসে একটা ঢিবির ওপর বসে একটা আঙুল তুলে বলল— ওইখানে বাবা। ওই জায়গাটায় খোঁড়ো। তা হলেই পাবো।

শ্যামল একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু ম্লান হতে হতে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার একটু আগে ফুট দেড়েক গর্তের তলায় একটা শক্ত বিন্দুতে শাবলটা ঠেকল। আবছা আলোয় মনে হল সেটা একটা কাঠের বাক্স, লম্বা-চওড়ায় একটা জুতোর বাক্সের সমান হবে।



ঢিবির ওপর থেকে রুমা চেঁচিয়ে উঠল— ওই বাক্সটা বাবা! ওটা বের করো।

শ্যামল ধমকে উঠল, চুপ কর। চেঁচাসনি। বলে শাবলটা ফেলে দিয়ে পাগলের মতো কোদাল দিয়ে মাটি সরাতে লাগল। একটু বাদে গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা কাঠের বাক্স উঠিয়ে নিয়ে এল। তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে বাক্সটা বগলদাবা করে হনহন করে হাঁটা লাগাল বাড়ির দিকে। তার পিছনে পিছনে দৌড়ল প্রতিমা।

রুমা ঢিবির ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে বাবা-মার পিছনে পিছনে দৌড়তে দৌড়তে বলতে লাগল— ও বাবা! ওটা কিন্তু আমার, ওমা, তুমি নেবে না কিন্তু! ওমা! ওটা কিন্তু আমার।

শ্যামল পিছন ফিরে রক্তচক্ষু করে চেঁচিয়ে উঠল— চোপ! তোকে না চেঁচাতে বারণ করলুম। একটি শব্দ করবি না। চ্যাঁচালে ভীষণ মার খাবি।

রুমা তার বাবার এই রুদ্রমূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়ে ঢিবিটার ওপর বসে পড়ল।

রান্নাঘরে গিয়ে একটা কাটারি বের করে চাড় দিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলল শ্যামল। ভেতর থেকে বেরুল একটা বিবর্ণ খবরের কাগজের মোড়ক আর তার ভেতরে একটা অপূর্ব সুন্দর বিলিতি পুতুল। তার চুলগুলো সোনালি, নীল চোখ, টুকটুকে লাল ঠোঁট, গোলাপি গালে টোল পড়া আর মুখটি হাসি-হাসি।

বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে পুতুলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হেসে উঠল শ্যামল। বলল— কী আশ্চর্য! আমার খেয়ালই ছিল না যে হাসি একটা বাচ্চা মেয়ে। আমারই ভুল... হি হি হি... আমারই ভুল। কতদিন এখানে সে একা রয়েছে, কে জানে। তার নতুন বন্ধুকে সে এর চেয়ে দামি উপহার আর কী-ই বা দিতে পারে? এটা নিশ্চয়ই তার

সবচেয়ে প্রিয় পুতুল ছিল। ডাকো প্রতিমা, তোমার মেয়েকে ডাকো। তাকে প্রেজেন্টটা দেবে না?

কোথায় মেয়ে? সারা বাড়িতে কোথাও রুমাকে পাওয়া গেল না। পাগলের মতো দু-জনে ছুটে বাগানে বেরিয়ে এল। তারার আলোয় দেখা গেল একটা ঢিবির ওপরে পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছে ছোটো মানুষটি। দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কান্না চাপার প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্যামল দৌড়ে এসে মেয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। বলল— এ কী রুমা এখানে বসে রয়েছ কেন? তোমার প্রেজেন্টটা বের করেছি। নেবে না সেটা? ভীষণ সুন্দর প্রেজেন্ট।

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে রুমা বলল— না, নেব না। আমার চাই না প্রেজেন্ট।

—কেন? নেবে না কেন? আমি যে এত কষ্ট করে তোমার জন্যে মাটি খুঁড়ে বের করলুম।

—না, আমার চাই না। তুমি আমাকে বকেছ কেন? কী করেছি আমি?

শ্যামল দু-হাতে মেয়েকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়াল। বলল— তুই কিচ্ছু করিসনি রে, মা! আর বিশ্বাস কর, আমিও তোকে বকিনি।

—হ্যাঁ, বকেছ! বলেছ, মারবে আমাকে।

—সে কথা আমি বলিনি রে। আমার বুকের ভেতরে কতকগুলো ভূতপ্রেত দত্যিদানব ঢুকে পড়েছিল। ওসব কথা তারা বলেছে, বিশ্বাস কর।

কথাটা রুমা খুব যে বিশ্বাস করল তা মনে হল না, কিন্তু তার কান্নার বেগটা কমে এল। বলল— কী করে ঢুকল ওগুলো?

শ্যামল বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল— আমার নাক-চোখ-মুখ দিয়ে।

—সেগুলো এখনও আছে?

—নাঃ! একেবারে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবে অনেকগুলো ঢুকেছিল তো। দু-একটা হয়তো এদিক-ওদিক লুকিয়ে রয়েছে। তবে, সেগুলোকে ঠিক শায়েস্তা করব, দেখে নিস।

চোখের জল মুছে হেসে উঠল রুমা। নিশ্চিত নির্ভরতায় দু-হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল— তাহলে আর আমাকে বকবে না তো, বাবা?

এবার শ্যামলের চোখে জল আসার পালা। বলল— কখনো না। কোনোদিনও না। তারপর প্রতিমাকে বলল— চট করে তৈরি হয়ে নাও। রাত কিছুই হয়নি। চলো মি. মিত্র আর প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে আসি। কাল চলে যাচ্ছি তো।



দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নারায়ণপুর মৌজার মণিমোহনতলা এককালে নিতান্তই একটি সাধারণ গ্রাম ছিল। কলকাতার দশ-পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে এই গ্রামের বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ছিলেন দরিদ্র চাষি নয়তো কুমোর। একটাই পাকা বাড়ি ছিল। প্রায় দু-বিঘে জমির ওপরে নীচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সাধারণ দোতলা ইমারত। তার সামনে একটি বড়োসড়ো বাগান, পিছনে তরিতরকারির খেত। এ বাড়ির মালিক, সিংহ পরিবার। একসময় তাঁরাই ছিলেন গ্রামের জমিদার।

আজ মণিমোহনতলার চেহারাই আলাদা। কলকাতা শহর বাড়তে বাড়তে তাকে ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে চলে গেছে। ঝকঝকে নতুন বাড়িগুলো দেখলে তার অতীতের চেহারাটা কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। কুঁড়েঘরগুলোর আর কোনো চিহ্নই নেই।

এতসব প্রাচুর্যের মধ্যে অতীতের একমাত্র সাক্ষী হয়ে সসংকোচে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিংহদের বাড়িটা। ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ কনকলতা সিংহ আর তাঁর বড়ো ছেলে ইন্দ্রকুমার ছাড়া ওই পরিবারের কেউ-ই এখন আর সবসময়ের জন্য ও বাড়িতে থাকেন না। ইন্দ্রকুমার ওয়েস্টার্ন রেলের চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করে ফিরে এসেছেন পশ্চিমবাংলায়। কনকলতার নাতিনাতনিরা বছরে একবার পুজোয় সময় আসে। বছরের বাকি দিনগুলো যেন তাদের আশাতেই কাটিয়ে দেন তিনি।

আর একটি পরিবার ওই বাড়িতে থাকে। বিদ্যাধর পাত্র আর তার স্ত্রী মনোরমা। বিদ্যাধর প্রায় চল্লিশ বছর আগে মেদিনীপুর থেকে এ বাড়িতে এসেছিল চোদ্দো বছর বয়সে। সেই থেকে এখানেই রয়ে গেছে। কনকতলার সকল কাজের কাজি সে। তিনি তাঁর সব কাজের ভার ওর ওপরে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছেন। বাড়ির আর বাগানের দেখাশুনো থেকে শুরু করে টাকাপয়সার হিসাব— সবই তার দায়িত্বে।

মনোরমা কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত। তার জীবনের একমাত্র নেশা হল কাপড় কাচা, সেসব শুকোতে দেওয়া আর ইস্তিরি করা। আগে যখন বাড়িতে অনেক লোকজন থাকত, তখন তাকে অনেক কাপড় কাচতে হত, আজ তা হয় না— এটাই বোধ হয় তার জীবনের একমাত্র দুঃখ। তবে, এর ফলে বাড়ির সব কটা ঘরের বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদি সবসময় একেবারে ফিটফাট থাকে।

কনকলতার মেজোছেলে নন্দকুমার সিংহ সাগরের স্কুলের হেডমাস্টার। বছর পঞ্চাশেক বয়েস, দশাসই চেহারা আর প্রচণ্ড বদরাগী। এই রাগের জন্যেই নাকি তাঁর মাথাজোড়া টাক। শুঁয়োপোকার মতো তাঁর একজোড়া ভুরু সবসময়ই কুঁচকে আছে। বলাই বাহুল্য যে তাঁকে সবাই প্রচণ্ড ভয় করে। এন. কে. সিংহকে ছাত্ররা চিরকাল নরখাদক সিংহ বলেই জেনে এসেছে।

এইসব কারণে সাগরের যখন হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে ডাক পড়ল, তখন কেবল সে নয়, ক্লাসসুদ্ধু ছেলেমেয়ে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখন বাংলা ক্লাস চলছিল, ক্লাস নিচ্ছিলেন রমেনবাবু। তিনিও খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন— কী করছিস রে, সাগর? কী গণ্ডগোল পাকালি আবার? যা, শিগগির যা।

সাগরের বন্ধুরা ফিসফিস করে কেউ বলল— জুতো মুছে ঢুকবি। কেউ বলল— চুল আঁচড়ে নে। কেউ বলল— প্যান্টের ভেতরে ভূগোল বইটা ঢুকিয়ে নিয়ে যা, বেত মারলে লাগবে না।

সাগর কাঁপতে কাঁপতে হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে ঢুকল। উনি তখন চকচকে টাকমাথা নীচু করে কীসব কাগজপত্র দেখছিলেন। সাগরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে হাসলেন। তাই দেখে সাগর আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। তার মনে হল ভয়ংকর কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে, নইলে নরখাদক তাকে দেখে হাসবে কেন? কেউ যাঁকে কোনোদিন হাসতে দেখেনি, তাঁকে হাসতে দেখলে ভয় পাওয়ারই কথা।

হেডমাস্টারমশাই বললেন— বসো, সাগর। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

সাগর বলল— বসব স্যার? আমি বরং দাঁড়িয়েই থাকি। আপনি বলুন কী বলবেন।

—ঠিক আছে, আচ্ছা, আমি শুনেছি যে তুমি নাকি শখের ডিটেকটিভ। কথাটা কী সত্যি?

সাগর বিড়বিড় করে বলল— না, স্যার, তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে দু-একবার মাথা খাটাবার সুযোগ পেয়েছি, এইমাত্র।

—বেশ, বেশ। দ্যাখো, আমার একটা প্রবলেম আছে। সে ব্যাপারে মাথা খাটাতে রাজি আছ?

—নিশ্চয়ই, স্যার। আপনি বললে অবশ্যই রাজি আছি।

—বেশ। এবার তাহলে বসো। আমি তোমাকে আমার প্রবলেমটা বিস্তারিতভাবে বলি।

হেডমাস্টারমশাই তাঁর মণিমোহনতলায় পরিবার আর তার পুরোনো ইতিহাসের কথা বলেন। লর্ড কার্জনের আমলে জমিদারির পত্তন হয়। আদায়পত্র এমন কিছু গেয়ে বেড়াবার মতো কোনো কালেই ছিল না। কাজেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরিবারের সকলকেই লেখাপড়ার দিকে যেতে হয়েছে। তার ফলে, পরিবারে প্রায় সকলকেই কলকাতা বা ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে চলে যেতে হয়েছে। তবে যে যেখানেই যান না-কেন, তাঁদের শেকড়টা কিন্তু রয়ে গেছে মণিমোহনতলাতেই।

একমাত্র ব্যতিক্রম হেডমাস্টারমশায়ের বাবা বিষ্ণুপদ সিংহ। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী ডাক্তার। পাশ করে গ্রামে ফিরে আসেন এবং চিকিৎসা শুরু করেন। তাঁর খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা, পাটনা এমনকী লক্ষ্ণৌ থেকেও তাঁর ডাক আসত। কাজেই, তাঁকে কোনোদিন অর্থাভাবে ভুগতে হয়নি বা তাঁর গ্রামের গরিব মানুষদের বিনে পয়সায় চিকিৎসা করতেও কোনো অসুবিধে হয়নি।

বিষ্ণুপদর তিন ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেরা হলেন ইন্দ্রকুমার, নন্দকুমার আর নবকুমার। মেয়ের নাম ইরা, তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে, থাকেন চেন্নাইতে। ইন্দ্রকুমার বিপত্নীক। তাঁর ছেলেমেয়েরা মুম্বাই, পুনা আর বরোদায় থাকে। নন্দকুমারের দুই ছেলে। বড়োজন আর্কিটেক্ট, তাঁর হেয়ার স্ট্রিটে নিজস্ব অফিস আর ছোটোজন তার জ্যাঠামশায়ের মতো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, থাকেন কানপুরে। নবকুমার অবিবাহিত। তিনি আমেরিকায় থাকেন, তবে মাঝে মাঝে দেশে আসেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ান আর বাঙালি ছেলেমেয়েদের রবীন্দ্রসংগীত শেখান।

যে সমস্যা নিয়ে হেডমাস্টারমশাই সাগরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেটা শুরু হয় ইন্দ্রকুমার আর মণিমোহনতলায় পাকাপাকিভাবে চলে আসবার তিন-চারমাস পর থেকে, হঠাৎই সারা বাড়িতে একটা অদ্ভুত গন্ধ পেতে শুরু করে সবাই। গন্ধটা অম্বুরি তামাকের। হেডমাস্টারমশায়ের ছোটো ঠাকুরদা এই তামাক খেতেন। তাঁর বাবাও শেষবয়সে এই তামাক ধরেছিলেন। কেবল বাতাসে নয়, বিছানার চাদরে, পর্দায়, এমনকী তোয়ালেতেও এই গন্ধ পাওয়া যেতে লাগল। মনোরমা তটস্থ হয়ে উঠেছে আর অনবরত কাপড় কেচে যাচ্ছে। অথচ, সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও কোনো অম্বুরি তামাকের সন্ধান পায়নি কেউ।

এখানেই শেষ নয়। শেষরাত্রের দিকে মাঝে মধ্যে একটা আতরের গন্ধও ভেসে আসে। এটা সাধারণ আতর নয়। ডা. বিষ্ণুপদ সিংহের লক্ষ্ণৌ-এর এক রুগি তাঁকে এই বিশেষ আতরটি কখনো কখনো পাঠাতেন।

এই ঘটনার ফলে সিংহ পরিবারের সকলে আতঙ্কিত না হলেও, বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারুর যে-কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা তাঁরা মনে করছেন না। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটবে কেন?

একটা কারণ থাকবে তো ঘটনার পিছনে। আজ না হয় গন্ধের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, কাল যে আরও বিপজ্জনক কিছু ঘটবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়?

হেডমাস্টারমশাই বললেন— এই কারণটা খুঁজে বের করবার জন্য অনুরোধ জানাতেই তোমাকে ডেকে এনেছি। দেখবে নাকি একটু মাথা খাটিয়ে?

সাগর বলল— স্যার, দেখব তো বটেই। তবে, তার আগে কি আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—নিশ্চয়ই পারো। বলো কী জানতে চাও?

—আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত ডিটেকটিভকে না-ডেকে আমাকে ডাকলেন কেন?

হেডমাস্টারমশাই ম্লান হেসে বললেন— তার কারণ, একজন প্রতিষ্ঠিত ডিটেকটিভ ডাকলে ব্যাপারটা আমাদের পরিবারের বাইরের লোকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তা যদি হয়, তাহলে অনেকেই হাসাহাসি করবে আর বলবে, দেখেছ, সিংহ বাড়ির লোকেরা ভূতের ভয় পাচ্ছে। ঘটনাটা যে তা নয়, সেটা তাদের বোঝানো যাবে না।

—সে তো স্যার, আমিও কথাটা পাঁচজনকে বলে বেড়াতে পারি।

—না, তা পারো না। কারণ, তুমি ভালো করেই জানো যে তা করলে নরখাদক সিংহ তোমাকে জ্যান্তো চিবিয়ে খাবে।

অনেক কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সাগর বলল— এবার স্যার দ্বিতীয় প্রশ্ন। গন্ধটা কী বাড়িতে যখন অনেক লোকজন থাকে তখনও পাওয়া যায়, না কেবল মোটামুটি খালি বাড়িতেই পাওয়া যায়?

হেডমাস্টারমশাই বললেন— খালি বাড়িতেই বেশি পাওয়া যায়। তবে লোকজন থাকলেও যে পাওয়া যায় না, তা নয়।

—আপনাদের ওখানে তো জমির অনেক দাম। প্রোমোটাররা আসে না আপনাদের বাড়িটা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে?

—আসে না আবার? অনবরত আসছে। টাকার থলি নিয়ে বসে রয়েছে সবাই। কেউ দেখাচ্ছে লোভ, কেউ দেখাচ্ছে ভয়। বেশ কিছুদিন আগে একজন তো আমার মা আর দাদাকে বলে গেল, ইয়ে কোঠি আপকো ছোড়না পড়েগা। তারপরে একটু উৎপাতও শুরু করেছিল। দাদা তো বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন সদ্য এসেছেন ওখানে, ভয় পাওয়ারই কথা। পরে সেই প্রোমোটার যখন জানতে পারল যে ডিসি সাউথ সঞ্জয় বোস আমার ছাত্র, তখন সে গা ঢাকা দিল।

—আপনার বাবা বা ঠাকুরদাদার মুখে অতীতে এই ধরনের কোনো উপদ্রবের কথা কি শুনছেন কখনো?

—না। কখনো না।

—আপনার দাদা কি তামাক বা সিগারেট খান বা কখনো খেতেন?

—না, আমাদের ভাইয়েদের ওই নেশা কস্মিনকালেও ছিল না। দাদা তো সিগারেটের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

—আমি কি একবার আপনাদের বাড়িতে যেতে পারি, আর ওখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—অবশ্যই পারো। আমি আগামী শনিবার গাড়ি নিয়ে তোমার বাড়িতে যাব বেলা দুটো নাগাদ। তোমার বাবা-মাকে জানিয়ে রেখো, আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নেব। সন্ধে ছ-টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব আমরা।

—আর একটা কথা স্যার। আমার বোন শ্রীলতাও আমার সঙ্গে যাবে। সে এই স্কুলেই ক্লাস টেনে পড়ে। ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি না বললে মুখ খুলবে না। কোনো অসুবিধে হবে না তো?

—ক্লাস টেনের শ্রীলতা, মানে আমাদের ব্যাডমিন্টন টিমের শ্রীলতা চৌধুরি? না, না, কোনো অসুবিধে হবে না।

সাগর যখন ক্লাসে ফিরল, তখন বাংলা ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। অঙ্ক স্যার নিরঞ্জনবাবু তখনও এসে পৌঁছননি। ও ঢোকামাত্র সবাই ঘিরে ধরল। অজস্র প্রশ্ন— নরখাদক কেন ডেকেছিল, কী করেছিস তুই, খুব মেরেছে না কি ওঠ-বোস করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, স্কুলে নাম কেটে দেয়নি তো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাগর প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল— না, না, ওসব কিছু নয়। আমাকে শুধু বললেন, এ বছরটা খেলাধুলো বন্ধ রেখে পড়াশুনোয় বেশি করে মন দিতে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।

ফার্স্টবয় সুপ্রতীক বলল— আর কাউকে না-ডেকে শুধু তোকে ডাকল কেন? আমাকেও তো ডাকতে পারত।

মনীষা বলল— বোকার মতো কথা বলিস না তো। ওকে ডেকেছিল খেলতে বারণ করবার জন্য। সেজন্য তোকে ডাকবে কেন? তুই কোনোদিন ফুটবলে পা লাগিয়েছিস?

বেশ একটা ঝগড়া বেঁধে গেল। ভালোই হল। সাগর আর বলবার কোনো সুযোগই পেল না যে নরখাদক সিংহের বাইরেটা যতই ভয়ংকর হোক না-কেন, তার ভেতরে একটা রসিক মানুষ লুকিয়ে আছে। অবশ্য বললেও কেউ বিশ্বাস করত না।

হেডমাস্টারমশাই-এর পিছনে পিছনে তাঁদের বাড়িতে ঢোকামাত্র গন্ধটা পেল সাগর আর শ্রীলতা। একটা মিষ্টি-মিষ্টি অথচ সোঁদা-সোঁদা গন্ধ।

হেডমাস্টারমশাই বললেন— একটা গন্ধ পাচ্ছ তোমরা? এটা অম্বুরি তামাকের গন্ধ।

শ্রীলতা ফিসফিস করে বলল— আমার কেমন ভয় করছে রে, দাদা।

সাগরও ফিসফিস করে বলল— দূর, দিনদুপুরে আবার ভয়ের কী আছে? গন্ধ তো নয় মন্দ।

সাগরের শেষ কথাটা হেডমাস্টারমশাই-এর কানে গেল। মৃদু হেসে বললেন— যা বলেছ। এসো, এবার তোমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। চা-এর সময় হয়েছে, সকলকেই এখন বসবার ঘরে পাওয়া যাবে।

বসবার ঘরটা একতলায়। আয়তনে বেশ বড়ো, মেঝে জুড়ে কার্পেট আর দেওয়ালে অজস্র ছোটো-বড়ো ফোটোগ্রাফ আর অয়েলপেন্টিং। সেখানে কয়েকটি প্রাচীন অতিকায় সোফার ওপরে তিনজন বসে ছিলেন। একজন বৃদ্ধ মহিলা আর অন্য দু-জন সুদর্শন ভদ্রলোক। তাঁদের একজন প্রৌঢ় আর অন্যজন মনে হল যৌবনের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। স্পষ্টতই, প্রথম জন ইন্দ্রকুমার আর অপরজন নবকুমার। তাঁদের মা বৃদ্ধা হলেও অত্যন্ত শক্তপোক্ত আর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর মেজোছেলে যে তাঁর কাছ থেকে চরিত্রটি পেয়েছেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অথচ, ইন্দ্রকুমারকে মনে হল নিতান্ত নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। অনবরত নখ খেয়ে যাচ্ছেন। নবকুমার আবার অন্যরকম। তিনি রসিক মানুষ, মুখে সবসময় একটি রহস্যপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে আছে।



নবাগতরা ঘরে ঢোকামাত্র নবকুমার প্রশ্ন করলেন— এই তোমার বাচ্চা শার্লক হোমস, ছোড়দা? আর ইনি? বাচ্চি ওয়াটসন? এঁরাই রহস্যভেদ করবেন বুঝি?

প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন খোঁচাটা এড়িয়ে গেলেন হেডমাস্টারমশাই। বললেন— বুড়ো শার্লক হোমস যখন পাচ্ছি না, তখন বাচ্চা শার্লক হোমস ছাড়া উপায় কী বল? বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নবকুমার বললেন— পরিচয় তো হল, এবার কী-কী প্রশ্ন আমাকে করবার আছে সেগুলো করে ফেলুন মি. হোমস।

মৃদু হেসে সাগর বলল— আপনাকে নয়, আগে ওঁকে প্রশ্ন করব। বলে, ইন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করল— আপনি তো রেলওয়ের চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। আপনি ভালো বলতে পারেন। এই বাড়িটা বিক্রি করলে এখন কীরকম দাম পাওয়া যাবে?

প্রবল বেগে নখ খেতে খেতে ইন্দ্রকুমার বললেন— তা প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা হবে খোলা বাজারে। আর যদি প্রেমোটারকে দেওয়া হয় তাহলে আমরা ভাইবোনেরা আর মা প্রত্যেকে একটা করে ফ্ল্যাট আর চোদ্দো লক্ষ করে টাকা পাব।

—তার মানে, সকলের একটি আধুনিক ফ্ল্যাট থাকবে আর বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবার মতো সুযোগ পাওয়া যাবে, তাই তো?

কিঞ্চিত উত্তেজিতভাবে ইন্দ্রকুমার হাত নেড়ে বললেন— ঠিক তাই। আমি তো সে কথাই সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কিন্তু বুঝতে চাইছে না। আর এখন তো সে প্রশ্ন আর ওঠেই না। আমরা সবাই যখন বাবার উপস্থিতি সর্বদাই অনুভব করছি তখন এ বাড়ি কি বিক্রি করা সম্ভব?

ইন্দ্রকুমার হয়তো আরও কিছু বলতেন কিন্তু তাঁর মা-র চোখে চোখ পড়ায় চুপ করে গিয়ে পুনরায় প্রবল বেগে নখ খেতে শুরু করে দিলেন।

কিছুটা যেন তাঁর দাদাকে চুপ করানোর জন্য নবকুমার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন— এবার কী আমার পালা?

সাগর বলল— আমি একটু বাড়িটা ঘুরে দেখব তারপরে হয়তো আপনার পালা আসবে। তবে, তার আগে আপনাদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। রোজ আপনাদের মধ্যে সকলের আগে ঘুম থেকে কে ওঠেন?

প্রশ্নটা শুনে শ্রোতারা সকলেই একটু আশ্চর্য হলেন। কনকলতা বললেন— আমি। সূর্য ওঠার আগে স্নান করি তারপর পুজোয় বসি।

—ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে কি চা খান?

বেশ বিরক্তভাবে কনকলতা বললেন— হ্যাঁ, খাই। তবে আমি চা খাই কী না-খাই তার সঙ্গে গন্ধের কী সম্পর্ক?

—সেটা পরে বলব। চা কি আপনি নিজে করেন?

—না। মনোরমা করে এনে দেয়। কনকলতাকে আরও বিরক্ত মনে হল।

অবিচলিত সাগর হেডমাস্টারমশাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল— স্যার, এই বাড়িতে ঢোকার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা একতলা দু-কামরার ছোটো বাড়ি দেখলুম। ওটা কী?

হেডমাস্টারমশাই বললেন— ওটা বিদ্যাধরের কোয়ার্টার্স বলতে পারো। একটা ঘরে ও আর মনোরমা থাকে, অন্যটা ওদের পুজোর ঘর।

—আমি ওই বাড়িটা একবার দেখব স্যার। আপনি শ্রীলতাকে এই বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিন, আর বিদ্যাধরকে বলুন ঘরটা খুলে দিতে।

শ্রীলতা শঙ্কিত মুখে বলল— আমি স্যারের সঙ্গে যাব?

—হ্যাঁ, তুই যা। দুটো তলারই সব কটা ঘর দেখবি। কোন-কোন ঘরে গন্ধের তীব্রতাটা বেশি সেটা নোট করে নিবি।

ঘর থেকে বেরুনোর সময় ঘাড় ঘুরিয়ে সাগর দেখল নবকুমার ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মুখের ব্যঙ্গাত্মক হাসিটি অনুপস্থিত। হেডমাস্টারমশাই-এর মুখেও আষাঢ়ের মেঘ। বিদ্যাধরের বাড়িটা সাগরের একা দেখতে যাওয়াটা তিনি পছন্দ করছেন না বলে মনে হল।

পরিদর্শন সেরে সকলে প্রায় একইসঙ্গে বসবার ঘরে ফিরে এল। সাগর শ্রীলতাকে জিগ্যেস করল— সব ঘর দেখলি?

শ্রীলতা বলল— হ্যাঁ, দেখেছি। বাড়ির ওই কোণায় দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁ-পাশের ঘরেই গন্ধটা সবচেয়ে বেশি। দোতলার দুটো ঘরেও আছে তবে অতটা বেশি নয়।

কনকলতা ব্যাজার মুখে বললেন— সিঁড়ির বাঁ-পাশের ঘরটা আমার। দোতলার যে ঘরদুটোর কথা মেয়েটি বলছে, তার একটা আমার মেয়ে ইরার আর অন্যটা নন্দর। এ ব্যাপারটা আমি অনেকদিনই লক্ষ করেছি।

সাগর অভিব্যক্তিহীন মুখে কথাটা শুনল, কোনো মতামত প্রকাশ করল না। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে মুখ তুলে ঘাড় নেড়ে বলল— না! আমি পারলুম না স্যার। এ রহস্য

ভেদ করা আমার সাধ্য নয়।

গাম্ভারি হেসে নবকুমার বললেন— পারলে না তো মি. হোমস? আমি জানতুম পারবে না। আমি যেখানে পারিনি, তুমি তো সেখানে শিশু।

সাগর সহাস্যে কথাটায় সায় দিল।

গাড়িতে উঠে হেডমাস্টারমশাই বললেন— তুমি কি সত্যিই রহস্যটা সমাধান করতে পারোনি?

সাগর বলল— পেরেছি, স্যার।

—তবে তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন?

—তার কারণ, যে জন্য রহস্যটা তৈরি করা হয়েছ সেটা একটা ভালো উদ্দেশ্যে, কোনো অসদুদ্দেশ্যে নয়। এ ব্যাপারটা প্রকাশ করলে শুধু যে সেই উদ্দেশ্যটা অসফল হতে পারত তাই নয়, আপনারও অসম্মান হতে পারত।

—আমার অসম্মান? আমি আবার এর মধ্যে কোত্থেকে এলুম? কী তুমি বুঝেছ বলো তো?

—স্যার, আমি যা বুঝেছি তা হল, আপনাদের বাড়িটা বিক্রি হওয়া বন্ধ করবার জন্যই এই রহস্যটা তৈরি করা হয়েছে। আপনার দাদার, ন্যায় বা অন্যায় যেকোনো কারণেই হোক, এখন অনেক টাকার দরকার। বাড়িটা বিক্রি হলে সেই টাকাটার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারত। সম্ভবত, তার পরিমাণটা এতই বেশি যে আপনারা দুই ভাই মিলে যে তাঁকে টাকাটা দেবেন, সেটা হয়ে উঠছে না। অথচ, বাড়িটা বিক্রি হোক, তাও আপনারা বা আপনাদের মা মনেপ্রাণে চাইছেন না। সে কথাটা আবার মুখ ফুটে বলতেও পারছেন না পাছে আপনাদের দাদার মনে আঘাত লাগে। কাজেই এমন একটা রহস্য সৃষ্টি করা হল যাতে যতই প্রয়োজন থাকুক না-কেন আপনাদের দাদা এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে না পারেন।

হেডমাস্টারমশাই চিন্তিত মুখে সাগরের কথা শুনছিলেন। বললেন— আশ্চর্য! তুমি ঠিকই ধরেছ। আমরাও বুঝতে পারছি যে দাদার এখন অনেক টাকার দরকার। কিন্তু, কত টাকা বা কীসের জন্য দরকার সেটা কিছুতেই বলছেন না। আমরাও জিগ্যেস করতে পারছি না। এদিকে এখানে এসেই বাড়ি বিক্রির জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। কয়েক জনকে কথা পর্যন্ত দিয়ে ফেলে ভয়ানক গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলেন। এখন অবশ্য সেসব বন্ধ হয়েছে।... তবে রহস্যটা আমারই তৈরি, সে কথাটা তোমার মনে হল কেন।

—লকেষ্নী-এর আতর থেকে স্যার।

—খুলে বলো।

—আপনি ভেবেছিলেন যে আমি রহস্যটা ভেদ করতে পারব না এবং ঘটনাটা যে অতীন্দ্রিয় সেটা মোটামুটি প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি অলৌকিক কাণ্ড, প্রেতাত্মা কাণ্ড, প্রেতাত্মা, ভূত ইত্যাদি বাদ দিই, তাহলে স্যার ধরে নিতে হয় যে, কোনো মানুষই এই গন্ধ ছড়াচ্ছে। সে কে হতে পারে? আপনার মা যেরকম রাশভারি মহিলা, তাতে এ ধরনের ব্যাপার থেকে তাঁকে বাদ দিতেই হয়। আপনি বা আপনার ছোটোভাই ওখানে

সবসময় থাকেন না। আর, আপনার দাদাকে দেখে বোঝাই যায় যে তিনিও হতে পারেন না। তাহলে বাকি থাকে বিদ্যাধর বা মনোরমা।

—আমি কিন্তু বাদ পড়ে গেছি।

—না, স্যার, যাননি। বিদ্যাধর আর মনোরমার ঘটে এত বুদ্ধি নেই যে তারা এমন চমৎকার একটি প্ল্যান ফেঁদে ফেলবে। তাদের দিয়ে এই কাজ কেউ করাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হল এটা তারা করেছে কীভাবে? ধোঁয়ার মাধ্যমে এটা হয়তো করা যেত কিন্তু তা করলে তৎক্ষণাৎ তারা ধরা পড়ে যেত। তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই মেনে নিতে হয়, আর তা হল বিছানায় চাদর বা পর্দার সাহায্যে এটা করা হচ্ছে। তার মানে, মনোরমা কাচার সময় এই গন্ধ এগুলোতে লাগিয়ে দিচ্ছে এবং সেটা অম্বুরি তামাকের গন্ধ।

—আতর নয় কেন?

—তার কারণ, আতর দামি জিনিস। সারা বাড়িতে তার গন্ধ ছড়াতে গেলে সেটা অনেক খরচের ব্যাপার হয়ে যায়। কাজেই, কোনো কোনো ঘরে সে একফোঁটা দু-ফোঁটা করে মাঝে মাঝে দিয়ে আসে। ভোর বেলায় যখন সবাই ঘুমোন আর আপনার মা থাকেন পুজোর ঘরে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েও সে এ কাজ করছেই বা কেন? এখানে স্যার, আপনি ওর কাপড় কাচার পাগলামিটা কাজে লাগিয়েছেন। সে বুঝেছে যে এ বাড়ি বিক্রি করে সবাই যদি ছোটো ফ্ল্যাটে উঠে যায়, তাহলে তার কাপড় কাচা প্রায় বন্ধই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারটা তার পক্ষে সহ্য করা প্রায় অসম্ভব।

হেডমাস্টারমশাই হাসতে হাসতে বললেন— সেটা অত্যন্ত সত্যি কথা। কিন্তু এটা যে আমিই তাকে বুঝিয়েছি, একথা তোমার মনে হল কেন?

—স্যার, এটা তো ঠিক যে তামাক বা আতর তাকে কেউ এনে দেয়। তামাকটা জোগাড় করা কঠিন নয়, সেটা হয়তো বিদ্যাধরই করতে পারত। শুধু যদি তামাকের গন্ধই পাওয়া যেত, তাহলে আপনি এবং আপনার ছোটোভাই, দু-জনকেই সন্দেহ করতুম। কিন্তু ব্যাপারটা জোরদার করবার জন্য আতরটা এনেই আপনি ধরা পড়ে গেলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে ওই আতরটি এনে এখানে ব্যবহার করা আপনার ছোটোভাই-এর পক্ষে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। অন্যদিকে, আপনার ছোটো ছেলে যে কানপুরে থাকে, তার কাছে এই আতর জোগাড় করে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার।

হেডমাস্টারমশাই সপ্রশংস গলায় বললেন— চমৎকার! অমন অ্যানাটিক্যাল বুদ্ধি তোমার অথচ অঙ্কে সত্তরের ওপরে পাওনা কখনো। কেন? এমন করলে কখনো ফাইনালে স্ট্যান্ড করতে পারব না। শোনো সাগর, কাল থেকে তুমি স্কুলের পরে রোজ একঘণ্টা আমার কাছে অঙ্ক শিখবে, বুঝেছ?



সন্ধে হয়ে এসেছে। সাগর সবে বসেছিল পড়ার টেবিলে। ঠিক তখনই দরজায় বেল বাজল। একটু পরে শ্রীলতা ঘরে ঢুকে বলল— দাদা, গুরুদাসবাবু এসেছেন। বাবা তোকে বসবার ঘরে ডাকছে।

তৎক্ষণাৎ তড়াক করে উঠে পড়ল সাগর। বসবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনল সি আই ডি-র বড়োকর্তা গুরুদাসবাবু বলছেন— আমি একেবারেই বেশি সময় নেব না, মিসেস রায়চৌধুরি। আমি কী জানি না যে সাগরের ফাইনাল পরীক্ষার আর দেরি নেই? কিন্তু, কী করব, বলুন? একজন নিরীহ, নির্বিরোধ, পরোপকারী মধ্যবয়স্কা মহিলা নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। কে খুন করেছে বা কেন, তা আমরা এখনও বের করতে পারিনি। আমাদের সরকারি পদ্ধতিতে এই রহস্যের সমাধান হতে দেরি হবেই আর সেই সময়ের মধ্যে যারা অপরাধী, তারা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। সেটা কি আপনি চাইবেন? আমার দৃঢ় ধারণা আপনার ছেলে অন্যান্য বারের মতোই খুব কম সময়ের মধ্যেই অপরাধীদের মুখোশ খুলে দিতে পারবে।

অতসী হাঁড়িপানা মুখ করে বললেন— কোথায় ঘটেছে এই ব্যাপারটা?

আরামবাগের কাছে শিবনাথপুর বলে একটা গ্রাম আছে। নামেই গ্রাম, এখন রীতিমতো শহর। আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেই।

—ও বাবা, সে যে অনেক দূর!

—দূর বেশি নয়, তবে আমি সাগরকে কখনোই ওখানে যেতে বলব না। ও যদি এখানে বসে সব কথা শুনে রহস্যভেদ করতে পারে, ভালো। নইলে, কোতুলপুর থানার ওসি আর আমি মিলে যা পারি তাই করব।

অতসীর গভীর ভ্রূকুটি একটু নরম হল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন— এখানে বসেই করবে? তবে তাই করুক। তবে দেখবেন যেন বেশি সময় নষ্ট না করে।

—আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমি সমস্ত ডিটেলস নিয়ে এসেছি। ফটোগ্রাফও আছে। আশা করি এতেই হয়ে যাবে। আর, যদি না-হয়, তাহলে আর কিছু করবার নেই।

এই কথার মধ্যে সাগর ঘরে ঢুকল।

গুরুদাসবাবু বলতে শুরু করলেন— যে ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন, তাঁর নাম মিস মেরী অনুরাধা পল। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। শিবনাথপুর গার্লস হাই স্কুলের অঙ্কের টিচার। স্কুলটা বিরাট আর তার খুব সুনাম। ওই তল্লাটের এক নম্বর স্কুল বলা যায়। প্রায় পঁচিশ বছর আগে এমএ পাশ করে এই স্কুলে ঢুকেছিলেন মিস পল। সেই থেকে এখানেই থেকে গেছেন। সিনিয়ার মোস্ট টিচার ছিলেন, প্রিন্সিপাল মিসেস বন্দনা ঘোষাল ছুটি নিলে উনিই ইনচার্জের কাজ করতেন।

সাগর বলল— এই স্কুলে আসবার আগে কোথায় ছিলেন? মানে বাড়ি কোথায় ছিল?

—সেটা আজ আর কারোর মনে নেই। তবে, স্কুলের জিয়োগ্রাফির টিচার অর্পিতা ভট্টাচার্য বললেন যে, সম্ভবত উনি বাঁকুড়া থেকে এসেছিলেন। ওঁর কথায় সেরকম একটা টান ছিল। স্কুলের রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ওঁর পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল কেয়ার অফ ডাক্তার জন বার্তোস, আরামবাগের একটা ঠিকানায়। সেখানে খোঁজ করে দেখা গেছে ডা. বার্তোস ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে মারা যান। তখন তাঁর বয়েস হয়েছিল একাশি বছর। তারপর থেকে মিস পলের ঠিকানা রঘুনাথপুরের নেতাজি কলোনির একটি একতলা বাংলো।

—আরামবাগের এঁদের প্রতিবেশীরা কী বললেন এঁদের সম্পর্কে?

—ডা. বার্তোস ছিলেন মিতভাষী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তবে, রোগীর সেবায় কোনো ত্রুটি রাখতেন না। সকলেই তাঁকে ভালোবাসত কিন্তু কেউই তাঁর ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। অনুরাধা খুব সম্ভবত তাঁর ভাগনি। উনিও মামার মতোই গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। স্কুল থেকে ফিরে মামার ক্লিনিকে নার্সের কাজ করতেন আর অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করতেন। মামা মারা যাওয়ার পর, অনুরাধা শিবনাথপুরে নেতাজি বাসস্ট্যান্ডের কাছে বাংলোটা ভাড়া নিয়ে একাই থাকতেন। সকালে বাগান করতেন, রাত্রে পড়াশুনো। প্রত্যেক রোববার বাসে করে আরামবাগের সেন্ট ক্রিস্টোফার চার্চে যেতেন। শান্ত নির্বিরোধ নিয়মানুবর্তী জীবনযাত্রা। তবে প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের কারোর কোনো বিপদ হলে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। রাত জেগে সেবা করতেন। কিন্তু গায়ে পড়ে কারোর উপকার করতে যেতেন না।

—বুঝতে পেরেছি। উনি কি আর কিছু করতেন বলে জানা আছে?

—আছে। ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝেই ইংরেজি কাগজে বা ম্যাগাজিনে অঙ্কশাস্ত্রের ওপরে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতেন। শুনেছি, উনি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ পরীক্ষায় প্রথম আর এমএ-তে তৃতীয় হয়েছিলেন।

—ওঁর টাকা পয়সা কীরকম ছিল? একা মানুষ, মাইনে অবশ্যই ভালোই পেতেন। বিলাসিতাও বিশেষ কিছু ছিল না মনে হয়। কাজেই, জমানো টাকা বেশ ভালোই থাকার কথা।

—তা ঠিক, কিন্তু তা ছিল না। ওঁর মাইনের একটা মোটা অংশ যেত আরামবাগের চার্চ পরিচালিত একটি হাসপাতালে। বাকিটার অনেকটাই খরচ হত শিবনাথপুরে স্থানীয় জনসেবায়। জামানো টাকা বলতে ছিল ওঁর স্কুলের পাশে একটা ব্যাঙ্কে হাজার পাঁচেক টাকা।

—বাড়িতে ক্যাশ কিছু ছিল?

—ছিল কিছু, কিন্তু যথাস্থানেই ছিল। তুমি ভাবছ যে টাকা পয়সার জন্যে কেউ ওঁকে খুন করেছে, তা বোধ হয় না। যদিও কোতলপুর থানার ওসি অরূপ কুণ্ডুর এইরকম ধারণা। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমি কেন অন্যরকম ভাবছি সেটা মিস পল কীভাবে খুন হয়েছিলেন তা শুনলে বুঝতে পারবে।

—কীভাবে?

গুরুদাসবাবু একটা ফোটোগ্রাফ টেবিলের ওপর রেখে বললেন— এটা মিস পলের বাংলো। পেছনে যে উঁচু পাঁচিলটা দেখা যাচ্ছে তার ওপাশে নেতাজি বাসস্ট্যান্ড। বাংলোর সামনে বাগান তার আগে রাস্তা। তিন দিকে বাউন্ডারি ওয়াল বলতে একটা ফুট তিনেক উঁচু বাঁশের বেড়া। বাংলোর দু-পাশে ফাঁকা জমি। অনুরাধা নিহত হন গত পরশুর আগের দিন, ২৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার, সকাল ন-টায়। তখন নেতাজি বাসস্ট্যান্ড আর অন্য জায়গায় নেতাজির জন্মদিন পালন করা হচ্ছিল। চারদিকে মাইকে নানারকম দেশাত্মবোধক গান বাজছিল, বক্তৃতা হচ্ছিল। অনুরাধা তখন বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল গাছগুলো দেখাশুনো করছিলেন। সেইসময় তাঁকে গুলি করা হয়।

—কোথা থেকে গুলি করা হয় বোঝা গেছে?

—হ্যাঁ, রাস্তা থেকে। রাস্তায় তখন অনেক লোক যাতায়াত করছিল। কেউ যাচ্ছিল বাসস্ট্যান্ডে, কেউ বাজারে। অনেকে আবার বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে অনুরাধার সঙ্গে দুটো কথা বলে নিচ্ছিল। হঠাৎ তাঁকে পড়ে যেতে দেখে তাদের দু-চারজন গেট খুলে ভেতরে ঢুকে ব্যাপারটা দেখতে পায়। গুলি লেগেছিল গলায়। সঙ্গেসঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল।

—দু-পাশের ফাঁকা জমিতে কেউ ছিল না?

—না।

—না থাকারই কথা। থাকলে তার ওপরে লোকের নজর পড়ত। কেউ গুলির শব্দ শুনেছিল?

—না। মাইকের শব্দে সেই শব্দ বোধ হয় চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবুও বলব, বেড়ার এপাশ থেকে যদি গুলি করা হয়ে থাকে তাহলে সে শব্দ কারোর না-কারোর শোনবার কথা। আর একটা কথা। যে গুলিটা অনুরাধার শরীরে পাওয়া গেছে সেটা একটা বিদেশি পিস্তল থেকে ছোড়া হয়েছিল, দিশি ওয়ান-শটার নয়। তার মানে, অবশ্যই কোনো সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার ব্যবহার করা হয়েছিল। সেটা একটা বেশ বড়ো লম্বাটে জিনিস। শীতকালে বলে তখন পথচারীদের অনেকের গায়েই আলোয়ান। তার মধ্যে সেটা লুকিয়ে রাখা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু অতগুলো লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা কাউকে না দেখতে দিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি চালানো তা-ও এমনভাবে যে এক গুলিতেই কাজ শেষ, সেটা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়।

—মানে, এক্সপার্ট প্রফেশনাল ভাড়াটে খুনির কাজ। ডাকাতির ব্যাপার নয়।

গুরুদাসবাবু মাথা নেড়ে বললেন— ঠিক তাই। কিন্তু কেন? মিস পলের মতো একজন নিতান্ত সাধারণ মাঝবয়সি শিক্ষিকাকে একগাদা টাকা খরচা করে ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে মারবার দরকার পড়ল কার, বা কেন?

সাগর অন্যমনস্কভাবে থেমে থেমে বলল— আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—অবশ্যই।

—এক নম্বর প্রশ্ন। মিস পলের কি কোনো বন্ধুবান্ধব ছিলেন যাঁদের বাড়িতে উনি যাতায়াত করতেন বা তাঁদের কেউ কেউ ওঁর বাড়িতে আসতেন?

—না, ওঁর কোনো বন্ধুবান্ধব বা ইয়ারদোস্ত কেউই ছিল না, থাকবার কথাও নয়।

—স্কুলের শিক্ষিকাদের কেউ?

—কেউ না। তাঁরা অনুরাধাকে অপছন্দ কখনোই করতেন না, কিন্তু ঘনিষ্ঠতাও করতে পারতেন না।

—কেউ আসত না এই বাড়িতে?

—আসত। তিনজন। প্রথম, নাসিমা খাতুন, রান্না করত। দুপুর বেলা টিফিন ক্যারিয়ারে স্কুলে লাঞ্চ নিয়ে যেত। দ্বিতীয়, তার হাসব্যান্ড আইনুল হক। তার কাজ ছিল ঘরদোর পরিষ্কার করা, দুধ আনা, ট্যাক্স জমা দেওয়া আর অন্যান্য বাইরের কাজ করা। তৃতীয়, সুবিমল সরকার, স্কুলের অ্যাকাউন্টেন্ট। ইনি মাসের প্রথমে মিস পলের মাইনেটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে তাঁর পাসবইটা আপডেট করে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।

সাগর বেশ চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করল— এদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

গুরুদাস বললেন— নাসিমা বাংলাদেশের মেয়ে। বয়েস তিরিশের বেশি নয়। সাদামাটা ভালো মানুষ। আইনুলের বয়েস পঁয়তাল্লিশ, আদি বাড়ি বিহারের ছাপরায়। তিন-চার পুরুষ আছে আরামবাগের কাছে মাঝডাঙা গ্রামে। পুলিশের খাতায় আইনুলের নাম আছে। বছর কুড়ি আগেও সে আরামবাগ, কোতুলপুর, শিবনাথপুর অঞ্চলে ডাকাতি করে বেড়াত। কয়েক বার জেলও খেটেছে। কিন্তু, নাসিমা আর অনুরাধা মিলে ওকে সৎপথে ফিরিয়ে আনে। অনুরাধা তাকে বর্ধমানে একটা ইনস্টিটিউটে ভরতি করে দরজির কাজ শেখান। এখন অনেক বছর হল সে আর নাসিমা দিনে অনুরাধার বাড়িতে কাজ করে আর সন্ধে বেলা বাড়ি ফিরে রাতে দরজির কাজ করে।

—আইনুল বোধ হয় এখন হাজতে।

—ঠিক। অরূপের দৃঢ় বিশ্বাস যে একবার অপরাধ জগতে ঢোকে সে আর বেরোতে পারে না। তার থিয়োরি হল যে আইনুল তার পুরোনো বন্ধুদের দিয়ে সে আর নাসিমা ওখানে ঢোকবার আগেই মিস পলকে খুন করিয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তাদের ওপরে কারোর কোনো সন্দেহ না পড়ে আর গোলমাল মিটে গেলে এই বাংলোটা অবলীলাক্রমে দখল করা যায়। আমার মনে হয় এই থিয়োরিটা আদালতে ধোপে টিকবে না। বাংলোটা যে ভাড়া বাড়ি ছিল, এই তথ্যটা অরূপ পাত্তা দিতে চাইছে না।

—আপনি কিন্তু একজনের কথা এখনও বলেননি।

—কে, অ্যাকাউন্টেন্ট সুবিমল সরকার? তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলবার নেই। ষাটের কাছাকাছি বয়েস, চোখে মোটা কাচের চশমা, রোগা কোলকুঁজো ডিসপেপটিক চেহারা। অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির লোক। অল্পেই বেশি বিচলিত হয়ে পড়েন। ঘটনার দিন সকাল বেলা একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে অনুরাধার বাংলোয় এসেছিলেন হত্যাকাণ্ডটা ঘটে যাবার মিনিট কুড়ি বাদে। এসে এত লোকজন, পুলিশ, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স আর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দার ওপর শুয়েই পড়লেন। তখন আবার তার মাথায় জল-টল দিয়ে একটু সুস্থ করে রিকশা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সাগর মুখ তুলে বলল— ২৩ তারিখে সকাল বেলা পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে তিনি মিস পলের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করেননি মি. কুণ্ডু?

—না। ও অঞ্চলে সকলেই সরকারবাবুকে চেনে। নিতান্ত নিরীহ মানুষ, বিশাল পরিবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তাঁর পক্ষে কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটানো আর এভারেস্টের ডগায় ওঠা একই ব্যাপার। আর ব্যাগটা? একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের বগলে পোর্টফোলিওব্যাগ থাকবে, সেটা কারোর অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি।

একটু চুপ করে থেকে সাগর বলল— আপনি যে মিস পলের নিয়মানুবর্তী জীবনযাত্রার কথা বললেন, তাতে কি সম্প্রতি কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল?

গুরুদাসবাবু হাত নেড়ে বললেন— এটা আমার জানা নেই। কুণ্ডুকে বলছি নাসিমা আর আইনুলকে জেরা করে জেনে নিতে। কাল তোমাকে জানাব।

—সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয় জেনে নিতে বলবেন। এক, মিস পল স্কুলে কোনো টাকাপয়সা সংক্রান্ত গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলেন কি না। দুই, ওঁর স্বভাবে কোনো দুর্বলতা ছিল কি না। যেমন— মিষ্টি খাওয়ার প্রতি অতিরিক্ত লোভ বা অল্পেই রেগে যাওয়া বা এই ধরনের কিছু। তিন, ব্রেকফাস্ট কি উনি নিজেই বানিয়ে নিতেন না নাসিমা এসে বানাত? সকালে কখন আসত নাসিমা আর কখন যেত? চার, স্কুল শুরু হয় ক-টার সময় আর শেষ হয় কখন।

—তোমার শেষ দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। নাসিমা আর আইনুল আসত সাড়ে ন-টা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে। ঘটনার দিনও দু-জনে পৌনে দশটা নাগাদ এসেছিল। তবে মিস পল ব্রেকফাস্ট মনে হয় নিজেই বানাতেন। কারণ, নাসিমারা এলে তাদের হাতে বাড়ির চাবি দিয়ে স্কুলে চলে যেতেন। কাছেই রিকশস্ট্যান্ড, সেখান থেকে দশ মিনিটের মধ্যে স্কুলে পৌঁছে যেতেন। স্কুলের সময় দশটা থেকে চারটে, শনি আর রবিবার স্কুল বন্ধ। অনুরাধা রোজ সাড়ে চারটের ভেতরে বাড়ি পৌঁছতেন আর সাতটা নাগাদ নাসিমা বাড়ি যেত। আইনুল তার আগেই চলে যেত। আর তোমার দু-নম্বর প্রশ্ন, মানে স্কুলে টাকাপয়সার কোনো গণ্ডগোলের ব্যাপারে বলতে পারি, মিস পল এত সৎ ছিলেন যে তাঁর পক্ষে, বিশেষত সুবিমল সরকারের মতো একজন ভীরুপ্রকৃতির লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, এই ধরনের কোনো স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়া একেবারেই অসম্ভব।

বলে উঠে দাঁড়িয়ে জোরগলায় বললেন— দেখুন মিসেস রায়চৌধুরি, আমি মোটেই বেশি সময় নিইনি। তবে, সাগরের কতগুলো প্রশ্নের জবাব পেলে কাল আমি সারাদিনে কোনো একসময়ে আসব।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন— আজ রাত্রেই কুণ্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। মনে হয়, কাল সকালেই উত্তর পেয়ে যাব।

গুরুদাসবাবু চলে গেলে, দীপঙ্কর বললেন— কিছু বুঝতে পারলি?

সাগর মাথা নাড়ল। বলল— না, পারিনি। তবে, একটা খুব আবছা ছবি দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, খুনটা যে করেছে সে যে ভাড়াটে খুনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে খুন করিয়েছে, সে একটি ভয়ংকর ক্রিমিন্যাল। হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না।

শনিবার সাগর বসবার ঘরেই বসেছিল। গুরুদাসবাবু এগারোটার মধ্যে এসে গেলেন। একটু চিন্তিত মুখে কোনোরকম ভনিতা না-করে বললেন— তোমার প্রশ্নের উত্তরগুলো এনেছি। ব্যাপারটা যে একটু গোলমেলে হয়ে গেল।

সাগর হেসে উঠে বলল— কী জানলেন বলুন, গুরুদাসকাকা।

—এক নম্বর উত্তর। নাসিমা জানিয়েছে যে গত মাস তিনেক হল, মিস পলের নিয়ম-বাঁধা জীবনযাত্রায় একটা পরিবর্তন হয়েছিল। এই সময়ে মাঝে মাঝেই সন্ধে ছ-টা সাড়ে ছ-টা নাগাদ সুবিমল সরকার পোর্টফোলিয়ও ব্যাগে ভরে কিছু ফাইল তাঁকে দিতে আসতেন আর দিয়েই চলে যেতেন। অনুরাধা অনেক রাত অবধি সেই ফাইলগুলো পড়তেন আর খাতায় কী সব লিখতেন। দু-চারদিন পরে সেই ফাইলগুলো একটা বাজারের থলেতে ভরে নিয়ে স্কুলে যেতেন।

সাগর ভুরু কুঁচকে বলল— অনেক রাত অবধি ফাইল দেখতেন, সেটা নাসিমা জানল কী করে?

—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে নাসিমার একটি কথায়। মিস পল নাকি সুবিমল সরকারের ফাইল যে ক-দিন কাছে রাখতেন, সে ক-দিন বিকেল বেলা ঘুমুতেন। অন্যান্য দিন নয়।

—যে খাতায় মিস পল কাজ করতেন সেই খাতাগুলো আপনারা পেয়েছেন?

—পেয়েছি তা জোর করে বলি কী করে? ভদ্রমহিলার পড়বার ঘরে অসংখ্য খাতা আর তাদের সব কটাতেই নানা রকমের ভয়ানক জটিল অঙ্ক কষা। সেসব অঙ্কে দাঁত ফোটানো ক্ষমতা আমাদের নেই। কাজেই সেসব কার অঙ্ক, কীসের অঙ্ক তা বোঝা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তিনি ইদানীং কোনো একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছিলেন ঠিকই। কিন্তু সেটা স্কুলে না অন্যত্র তা বোঝা যাচ্ছে না।

—কী কী বোঝা যাচ্ছে?

—নাসিমা বলেছে যে গত কয়েক মাস যাবৎ তার মনিব খুব চিন্তিত হয়ে থাকতেন। ফাইল দেখতে দেখতে চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করতেন। কখনো একটা ইজিচেয়ারে বসে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সেসময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে বিরক্ত হতেন। উনি আগে এরকম ছিলেন না। আর তোমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হল যে মিস পল ভীষণ একরোখা মানুষ ছিলেন। এটা একরকম দোষই বলতে পারো। নিজে যা ভালো মনে করতেন সেটা করে ছাড়তেন।

—তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওই ফাইলগুলোয় এমন কিছু ছিল যা মিস পলকে বিচলিত করেছিল এবং খুব সম্ভবত সেই জন্যেই এই ঘটনাটা ঘটে গেল। সুবিমল সরকারকে আপনারা এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?

—হ্যাঁ, করেছি। কাল রাত্রেই। সুবিমল বলছেন যে কিছুদিন যাবৎ তিনি স্কুলকে না-জানিয়ে সন্ধ্যে বেলা ভুবনেশ্বরী কোল্ডস্টোরেজে একটা পার্টটাইম কাজ নিয়েছেন। কিন্তু আলুর হিমঘরের হিসাবপত্রের ব্যাপারটা তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। অনুরাধা মিস খুব ভালো অঙ্ক জানে। তাই তাঁর কাছে ব্যাপারটা বুঝে নিতে যেতেন সুবিমল। বিরাট সংসার, শুধু স্কুলের মাইনেতে চলে না। তাই এই কাজটা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যেই তিনি অনুরাধা মিসের সাহায্য চেয়েছিলেন। তিনিও খুশি হয়ে রাজি হয়েছিলেন।

—এর মানে হল এই হিসাবপত্রের মধ্যে এমন একটা গরমিল মিস পল দেখতে পেয়েছিলেন যা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। এখন কথা হল একটা কোল্ডস্টোরেজের হিসাবের গণ্ডগোল থাকলে মিস পল কি এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়বেন আর এমন কাজ করে বসবেন যাতে তাঁর প্রাণটা চলে যায়?

—ঠিক বলেছ। তার মানে, সুবিমল সত্যি কথা বলছেন না। তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কী? সুবিমলকে গ্রেপ্তার করব? তাতে কিন্তু আমার মন থেকে সমর্থন পাচ্ছি না।

সাগর বলল— আজ শনিবার, কালও স্কুল ছুটি। আমার মনে হয় এই সুযোগে স্কুলের সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে সোমবার থেকে একটি স্বতন্ত্র অডিটর বা হিসাবরক্ষক সংস্থাকে দিয়ে সেগুলো আপনারা পরীক্ষা করান। আমি নিশ্চিত যে তাহলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা দরকার; নইলে সব কাগজপত্র হয় আগুন লেগে পুড়ে যাবে নয়তো চুরি হয়ে যাবে। অরূপবাবু আইনুলকে হাজতে ঢুকিয়ে একটা ভালো কাজ করছেন। পুলিশ ভুলপথে যাচ্ছে দেখে বোধ হয় আসল অপরাধী হুড়োতাড়া করে হিসাবের খাতাগুলো লোপাট করেনি। আর সামনেই যে রিকশাস্ট্যান্ড আছে সেখানে খোঁজ নিন যে গত রবিবার, ২১ তারিখে, মিস পল চার্চ থেকে ফিরে কোথাও গিয়েছিলেন কি না।

গুরুদাসবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন— বুঝেছি। আমি এখনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আর এর ফলশ্রুতি কী দাঁড়াল, সেটাও দু-এক দিনের মধ্যেই তোমাকে জানিয়ে যাব। তোমার কি মনে হয় যে সুবিমল সরকার এর মধ্যে আছেন?

—থাকতে পারেন। তবে আমার এখনও পর্যন্ত ধারণা যে উনি এর মধ্যে নেই। থাকলে কোল্ডস্টোরেজে পার্টটাইম কাজ নিতেন না। মনে হয়, সুবিমলবাবু নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

বুধবার স্কুল থেকে ব্যাডমিন্টন খেলে বাড়ি ফিরে সাগর দেখল বসবার ঘরে গুরুদাসবাবু আর অন্য একজন কমবয়সি পুলিশ অফিসার বসে রয়েছেন।

গুরুদাসবাবু সহাস্যে বললেন— এসো সাগর, আমরা তোমার জন্যেই বসে রয়েছি। আর এই যে ইনি তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন, ইনি হলেন...

সাগর একটা চেয়ারে বসে বলল— জানি, অরূপবাবু, কোতুলপুর থানার ওসি। বলুন, রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে?



গুরুদাসবাবু বললেন— শোনো, বলছি। রবিবার সকালে আমরা স্কুলে গিয়ে সমস্ত হিসাবের খাতাপত্র বাজেয়াপ্ত করি। সঙ্গেসঙ্গে হুলুস্থুল পড়ে গেল। স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট গৌরহরি সাহা আর সেক্রেটারি বিজন সামন্ত থানায় এসে হাজির। গৌরহরি সাহা ধর্মপ্রাণ সৎ লোক বলে ওই অঞ্চলে পরিচিত। শিবনাথপুর গার্লস আর বয়েজ হাই স্কুল দুটোই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বাবা কৃষ্ণহরি সাহার দান করা জমির ওপরে। গৌরহরি কম বয়সে দুটো স্কুলেই পড়াতেন। স্কুলের সব ফাংশনেই তিনি হাজির থাকেন। সেক্রেটারি বিজন সামন্ত স্থানীয় লোক কিন্তু নামকাটা সেপাই। অল্প বয়েসে নানারকম বেআইনি আর অসমাজিক কাজকর্ম করে অনেক টাকা করেন। তারপরে পলিটিক্স। তখন তাঁর রমরমা দেখে কে? কামারপুর আর শিবনাথপুরে দুটো কোল্ডস্টোরেজ, আরামবাগে একটা শপিং সেন্টার। তারপরে এম এল এ। এখন জনপ্রতিনিধি হয়ে স্কুলের সেক্রেটারি হয়ে বসেছেন, কেউ আটকাতে পারেনি। একজন রিকশাওয়ালার কাছে জানা গেল যে রবিবার বিকেলে এই বিজন সামন্তর কাছেই গিয়েছিলেন অনুরাধা।

—বাঃ। উনিই তো তাহলে নাটের গুরু। উনিই স্কুলের অ্যাকাউন্টস-এ কারচুপি করে হাজার হাজার টাকা সরিয়েছেন আর একরোখা মিস পল যে সেটা ধরে ফেলেছেন সেটা রবিবার জানতে পেরে মঙ্গলবারেই তাঁকে খুন করিয়েছেন। তাঁর বোধ হয় আরও ভয় ছিল যে মিস পল খবরের কাগজে লেখেন যখন, তখন সেখানে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিতে পারেন। ঠিক বলেছি?

—একদম। শুধু তোমার অনুমানে একটু ভুল আছে। বিজন সামন্ত হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা সরিয়েছেন। আমাদের জেরায় সুবিমল সে কথা স্বীকার করেছেন। কোথাও যে একটা বিরাট গোলমাল আছে সেটা সুবিমল আন্দাজ করতে পারেন মাস চারেক আগে। সেটা কনফার্ম করবার জন্যে মিস পলের কাছে গিয়েছিলেন। উনি স্কুলটাকে এত ভালোবাসতেন যে সুবিমলের কথা শুনে হিসাব পরীক্ষা করতে রাজি হন। সুবিমল

ভাবতেই পারেননি যে স্কুলের টাকা নয়-ছয় হচ্ছে দেখে অনুরাধা এত রেগে যাবেন যে একেবারে খোদ বিজন সামন্তর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে ধমকে দিয়ে আসবেন। সুবিমলের সে সাহস ছিল না। না থাকারই কথা। এই তল্লাটে সবাই সামন্তকে যমের মতো ভয় পায়। সুবিমল ফেঁসে যাবার আগেই সময় বুঝে পালাবার পথ হিসেবেই কোল্ডস্টোরেজের চাকরিটা নিয়েছিলেন।

—গৌরহরি সাহা এর মধ্যে ছিলেন না?

—না, উনিই মিস পলের খুনের খবর পেয়ে সঙ্গেসঙ্গে মন্ত্রী শক্তিপদ নস্করকে কেসটা সি আই ডি-র কাছে পাঠাতে বলেন। শক্তিপদবাবু গৌরহরিবাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধ করেন, তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন, শিবনাথপুর স্কুল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়েই আমরা বিজন সামন্তকে গ্রেপ্তার করেছি।

সাগর বলল, কিন্তু খুনটা করল কে?

গুরুদাসবাবু সহাস্যে বললেন, চিন্তা কোরো না। মাথাটা যখন ধরেছি, তখন কানটা ধরতে বেশি দেরি হবে না।



পর্যটকরা বাস থেকে নামতেই তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য টুরিস্ট অফিসার এগিয়ে এলেন। লম্বা-চওড়া-টাকমাথা-মাঝবয়েসি ভদ্রলোক, পরনে রংচঙে বুশশার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স, মুখে ভুবনমোহন হাসি। কেতাদুরস্তভাবে হাত নেড়ে বললেন— টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি হরিসিং রাঠোর, আপনাদের টুরিস্ট অফিসার। আপনাদের এই বাঘেলাগড় দুর্গ দেখাবার দায়িত্ব আমার।

বলে খুব বিনীতভাবে সবাইকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন।

নিজের টেবিলে বসে হরিসিং বললেন— আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছেন, কাজেই আপনাদের সবকিছু বেশ বিস্তারিতভাবে দেখাতে হবে। ফাঁকি দিলে চলবে না। এই দুর্গের শুধু দ্রষ্টব্যগুলো দেখালেই তো হবে না, তার রাজবংশের ইতিহাস, স্থাপত্য ও শিল্পকলার ইতিহাস, এসবও তো জানাতে হবে। তা, এই ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ, তাঁকেই আপনাদের গাইড হিসেবে দিচ্ছি। এর পরিবার বংশানুক্রমে এই দুর্গেই বাস করে আসছেন। কাজেই, এই দুর্গের সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। ওই যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনিই আপনাদের গাইড হবেন— শ্রীবিজয়কুমার মীনা।

বিজয়কুমার ছোটোখাটো, রোগাটে মানুষ, পরনে ধুতি আর ছাইরঙের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটি অতি প্রাচীন শেরওয়ানি। তবে, তাঁর গালভাঙা মুখে একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ তাঁর অতীত আভিজাত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হরিসিং-এর প্রশংসাবাক্যে বিজয়কুমার কিছুমাত্র পুলকিত হয়েছেন বলে মনে হল না। গম্ভীর মুখে বললেন— আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

দুর্গটা যেন কেমনধারা। অনেকটা গোলকধাঁধার মতো। ঘরের ভেতর দিয়ে ঘর, এখানে-ওখানে সরু সরু অন্ধকার সিঁড়ি কোনোটা ওপরে কোনোটা নীচে চলে গেছে, বারান্দা বা করিডরগুলো একটু গিয়েই এদিক-ওদিক বাঁক নিয়েছে। বিজয়কুমার বললেন যে এসবই করা হয়েছিল রাজপরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে। ফলে, সারা দুর্গটাতেই একটা গা-ছমছম করা ভাব। মনে হয় যেন সব ঘরেই ষড়যন্ত্রীরা ফিসফিস করে কথা বলছে নয়তো ওঁত পেতে বসে আছে।

সমস্ত দুর্গটা ঘুরিয়ে বিজয়কুমার তাঁর টুরিস্টদের দল নিয়ে প্রশস্ত একটা বারান্দা পেরিয়ে অন্দরমহলের একতলায় একটা ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরে তখন বিকেল হয়ে এসেছে।

কাজেই ঘরের ভেতরে কিছুটা অন্ধকার। ঘরটা চৌকোনা আর বেশ বড়ো। তার নিরেট দেওয়ালে জানলা-টানলা নেই, তবে সমকোণে দুটো দরজা— একটা অবশ্যই বারান্দার দিকে, অন্যটায় মোটা কাঠের কারুকার্য করা পাল্লা বন্ধ করা ছিল। বারান্দার দিকের দরজাটা দিয়েই ঘরের ভেতরে যা আলো আসবার আসছে।

বিজয়কুমার বললেন— এটা মহারানি নন্দাবাই-এর সংগীতকক্ষ। মহারানি কেবল অসাধারণ গানই করতেন না, সংগীত রচনাও করতেন। তাঁর রচিত বহু গান শুধু এই রাজ্যেই নয়, সারাদেশে আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর স্বামী মহারাজ দয়ানাথ সিং তাঁর প্রতিভার সমঝদার ছিলেন। তিনি তাঁর রানির গান এই বাঘেলাগড় দুর্গের বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই রাজবংশ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাই পর্দানশীন রানির পক্ষে সবার সামনে বসে গান গাওয়া সম্ভব ছিল না। সেইজন্যে, মহারাজ এই দুর্গের ভেতরে এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে অন্দরমহলের এই ঘরে বসে মহারানি গান গাইতেন আর রাজসভায় বসে সবাই সেই গান শুনত।

টুরিস্টদের ভেতর থেকে লেকটাউনের মিসেস গৌরী মিত্র বললেন— সে কী কথা? রাজসভা তো আমরা দেখে এলুম। সে তো এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। অতদূরে গলা পৌঁছুত কী করে? সে যুগে কি মাইক-টাইক ছিল?

বাঁশদ্রোণী কলেজের ছাত্র সমীর ব্যানার্জি বলল— পৌঁছবে না কেন? সে যুগের মহিলাদের বাজখাঁই গলা হত, বুঝলেন? আপনাদের মতো মিনমিনে ছিল না। তাঁরা অমায়িক হয়ে গান গাইতেন, রাজ্যসুদ্ধু লোক শুনতে পেত।

বিজয়কুমার সমীরকে পাত্তা না-দিয়ে মৃদু হেসে বললেন— মাইক তখন কোথায়? ইলেকট্রিসিটিই কী ছিল নাকি? কিন্তু আমাদের দেশে সেই সময়ে যাঁরা বাস্তুকার ছিলেন, মানে আজ যাঁদের আপনারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলেন, তাঁদের ছিল অসম্ভব কে সম্ভব করার অদ্ভুত ক্ষমতা। ওই যে বন্ধ দরজাটা দেখছেন, ওর পেছনে একটা করিডর রয়েছে। ওখান দিয়ে রাজসভায় যাওয়া যায়। করিডরটা এমনভাবে তৈরি যে এই ঘরে কারও হাতের কাচের চুড়ির টুংটাং শব্দও রাজসভায় পরিষ্কার শোনা যায়। গান আর তার সূক্ষ্ম গলার কাজ যে শোনা যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? অথচ, রাজসভার কোনো কথাই এ-ঘরে শোনা যায় না।

সমীর বলল— বলেন কী? তার মানে, রাজামশাই এ-ঘরে তাঁর রানিকে কোনো গোপন কথা বলতেন, সেটা সভাসদরা সবাই শুনতে পেত?

বিজয়কুমার দরজাটা খুলে দিতে দিতে বললেন— না। এই দরজাটা পুরো খুলে না-দিলে ওপাশে কিচ্ছু শোনা যাবে না। এবার আপনাদের মধ্যে যিনি গান করতে পারেন, তিনি এখানে থাকুন আর বাকি সবাই এই পথে রাজসভায় চলে যান। আমি এখানেই আছি। ব্যাপারটা কী ঘটত, এবার আপনারা দেখতে পাবেন বা শুনতে পাবেন।

কে গান গাইতে পারেন এবং কে থাকবেন, তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হল। শেষপর্যন্ত শ্রীলতাকেই সবার পছন্দ হল। গাইড বললেন— না। পুরুষদের মধ্যে একজন থাকুন।

শ্রীলতার বাবা সাংবাদিক দীপঙ্কর চৌধুরি বললেন— কেন? অসুবিধে আছে?

—হ্যাঁ, আছে। আপনারা শুনেছেন কি না জানি না, এই বাঘেলাগড় দুর্গের একটা বদনাম আছে। এই ঘরেই মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে গুরুতর আহত মহারাজ দয়া সিং মারা যান আর সতী নন্দাবাই আত্মহত্যা করেন। তারপর থেকে— সে যাকগে, নানা লোকে নানা কথা বলে।

দীপঙ্কর বললেন— ভূত? আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।

মা-মেয়ে অতসী আর শ্রীলতা সমস্বরে বলল— আমি করি। আমি করি।

বিজয়কুমার সহাস্যে বললেন— দেখলেন তো? তাহলে, আর একজনকে ঠিক করুন। কিছুই হবে না, কোনোদিন হয়নি। তবে, সাবধানের মার নেই।

এবার গানের জন্য নির্বাচিত হলেন যাদবপুর গৌরীশঙ্কর স্মৃতি হাই স্কুলের মাস্টারমশাই কল্যাণময় গুহ। অত্যন্ত নিরীহ আর শান্তপ্রকৃতির এই অকৃতদার মাঝবয়েসি ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে রাজি হলেন।

রাজসভার দিকে যেতে যেতে সমীর বলল— ভালো করে গাইবেন, মাস্টারমশাই। ভুলভাল হলে নন্দাবাই-এর ইয়ে কিন্তু আপনার ঘাড়ে চড়ে বসতে পারে।

চারদিক ঢাকা টানেলের মতো করিডর দিয়ে সকলে রাজসভায় চলে এলেন। একটু বাদেই করিডরের ভেতর থেকে পরিষ্কার বিজয়কুমারের গলা শোনা গেল— এবার সবাই শুনুন, গান শুরু হচ্ছে।

একটা গলা খ্যাকারি শোনা গেল। তারপরেই একটা ভয়ংকর আর্তনাদ।

আর্তনাদটা শুনেই সাগর বলল— শ্রী, আমার সঙ্গে আয়। আর, আপনাদের মধ্যে কেউ এক্ষুনি গিয়ে টুরিস্ট অফিসারকে খবর দিন। বলে দু-জন করিডর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল। পিছনে পিছনে গেল সমীর।

রানির ঘরে ঢুকে দেখা গেল মাস্টারমশাই একপাশে মেঝের ওপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, বিজয়কুমারের চিহ্নমাত্র নেই। সাগর বলল— শ্রী, তুই ওই দরজাটা দিয়ে বাইরের বারান্দায় যা। এখানে আসার সময় দেখেছি বাঁ-দিকে একটা ছোটো বাথরুম আছে। ওখান থেকে তোর টুপিটা ভিজিয়ে নিয়ে আয়। মাস্টারমশাই-এর মুখে জলের ছিটে দিতে হবে। শিগগির যা।

শ্রীলতা একটু ইতস্তত করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। সাগর সমীরকে বলল— আপনি মাস্টারমশাই-এর পাশে থাকুন, সমীরদা। আমি এদিকটা দেখছি।

সমীর একটু আশ্চর্য হয়ে বলল— এদিকটা মানে? কোন দিকটা?

সাগর উত্তর দেবার আগেই ওদের দলের সবাই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল। সাগর বেশ জোরের সঙ্গে বলল— সবাই ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, কেউ দেওয়ালের কাছে যাবেন না।

সাগরের কথায় কাজ হল। সকলে হুড়মুড় করে ঘরের মাঝখানে চলে এলেন। তারপর শুরু হল প্রশ্নের বন্যা— মাস্টারমশাই বেঁচে আছেন কি না, গাইডসাহেব কোথায় গেলেন, নিশ্চয়ই কেটে পড়েছেন, টুরিস্ট-অফিসারের পাত্তা নেই কেন, দেওয়ালের কাছে গেলে কী হবে, ওই বাচ্চা ছেলেটি এসব কথা বলবার কে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সবাই তারস্বরে কথা বলছেন, সে এক মহা গণ্ডগোল।

সাগর এই প্রশ্নমালার উত্তর দেবার চেষ্টাই করল না। বলল— বাবা, তোমার টর্চটা দাও তো।

দীপঙ্কর তাঁর কাঁধ-ঝোলার ভেতর থেকে ছোটো টর্চ বের করে সাগরের হাতে দিলেন। সঙ্গেসঙ্গে নতুন প্রশ্নের ঝড় উঠল— টর্চ দিয়ে কী হবে, ছেলেটা কী ডিটেকটিভ না কি, যতসব চালিয়াতি বাজে কায়দা দেখাবার আর জায়গা ছিল না ইত্যাদি।

এরমধ্যে শ্রীলতা তার টুপি ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে। সমীর সেটা নিংড়ে মাস্টারমশাই-এর চোখে-মুখে কিছুক্ষণ জলের ছিটে দেওয়ার পর তাঁর জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলেই মাস্টারমশাই খাবি খেতে খেতে বললেন— ভূত... ভূত।

সমীর ব্যথিত গলায় বলল— আমি ভূত নই, মাস্টারমশাই। জলজ্যান্ত মানুষ।

মাস্টারমশাই বললেন— আহা, তুমি ভূত হতে যাবে কেন। ঘরের ভেতরে সত্যিকারের ভূত এসেছিল। বিজয়কুমারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল।

দুর্গাপুরের মিসেস সুগতা গাঙ্গুলি মাস্টারমশাই-এর মতোই কম্পিতকণ্ঠে বললেন— ওরে বাবারে! কীরকম দেখতে ছিল ভূতটা, মাস্টারমশাই?

—আমি কী আর ভালো করে দেখেছি? তবে, কোনো রাজা-টাজার ভূত হবে। বিশাল চেহারা, মাথায় পাগড়ি, পরনে সলমা-চুমকি বসানো রাজার মতো পোশাক।

—ও মা গো! ওই বারান্দা দিয়ে ভূতটা এল?

সাগর টর্চটা জ্বেলে দেওয়ালের কাছে মেঝেটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। বলল— না। ভূতটা দেওয়ালে ফুটো করে বেরিয়ে এসেছিল, তাই-না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই বললেন— ঠিক তাই। আমি আর বিজয়কুমার ঘরের মধ্যিখানে করিডরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলুম। কাজেই ওপাশের বারান্দা দিয়ে যা কিছুই আসুক না-কেন, আমরা দেখতে পেতুম। ভূতটা এসেছিল আমাদের পেছন থেকে। তার মানে দেওয়ালে ফুটো করেই বটে। তা, সে কথাটা তুমি কী করে জানলে?

ঢাকুরিয়ার সবজান্তা উকিল কান্তিভূষণ কুণ্ডু বললেন— এতে আবার না জানার কী আছে? বারান্দা দিয়ে এলে শুধু আপনি কেন, বাইরে দুর্গের যেসব লোকজন ঘোরাঘুরি করছে, তারাও দেখতে পেত। আমার তো মনে হয়, ভূত-টূত কিছু নয়। একটা লোক এই ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ছিল।



কান্তিভূষণের স্ত্রী গীতা বললেন— বাজে কথা বোলো না তো। এই ঘরে লুকোবার মতো কোনো জায়গা আছে? যা এসেছিল, সেটা ভূতই, মানুষ হতে পারে না। মাস্টারমশাই খুব জোর বেঁচে গেছেন। ভূতটা গাইডসাহেবকে তুলে নিয়ে ওই দেওয়াল ভেদ করেই বেরিয়ে গেছে। দ্যাখো গিয়ে, এতক্ষণে তাঁকে বোধ হয় কড়মড় করে...

মিসেস গাঙ্গুলি তাঁর স্বামী ডি. এস. পি.-র ইঞ্জিনিয়ার প্রবালকে বললেন— আমি এখানে আর একমুহূর্তও থাকব না। আমি এক্ষুনি বাড়ি যাব।

বারান্দায় কতগুলো ভারী জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গেসঙ্গে সকলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকলেন টুরিস্ট-অফিসার রাঠোর, একজন রোগা, লম্বা পুলিশের দারোগা আর দু-জন মোটাসোটা কনস্টেবল।

ঘরে ঢুকেই রাঠোর বললেন— এ কী! বিজয়কুমার কোথায় গেল? তার এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হয়নি।

মিসেস গাঙ্গুলি বললেন— ইচ্ছে করে কী আর গেছেন? তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

তারপর সবাই একসঙ্গে ঘটনাটা রাঠোরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে আরম্ভ করে দিলেন। কেউ শুরু করলেন রাজসভা থেকে গান শুনতে পাওয়ার কাহিনি থেকে। কেউ সকাল বেলা টুরিস্ট বাংলো থেকে রওনা হওয়া থেকে। আবার কেউ-বা একেবারে হাওড়া স্টেশনে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়া থেকে। সবাই একসঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন, কে যে কার কথা শুনেছেন তা বোঝে কার সাধ্যি।

অনেক কষ্টে ব্যাপারটা বুঝে রাঠোর বললেন— আপনারা ভয় পাবেন না। এ কথাটা ঠিকই যে এখানে নানা রকমের অতিপ্রাকৃত গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু সেগুলো গল্পই। এখানে আজ যা ঘটেছে বলে আপনারা মনে করছেন, সেটা ঠিক নয়। আমার তো মনে হচ্ছে যে বিজয়কুমার মাস্টারমশাইকে ভয় দেখিয়ে অজ্ঞান করে তাঁর টাকাপয়সা হাতিয়ে নেবার ধান্দায় ছিল। মাস্টারমশাই চিৎকার করে ওঠায় সে পালিয়েছে। রাজার সাজে যাকে

উনি দেখেছেন, হয় সেটা তাঁর চোখের ভুল নয়তো বিজয়কুমারের কোনো সাগরেদের কাণ্ড। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাংলোয় ফিরে যান। বিজয়কুমার এই দুর্গেই এদিক-ওদিক কোথাও আছে। বাইরে কোথাও যায়নি। ওকে ধরা কঠিন হবে না। কি বলেন দারোগাসাহেব?

দারোগাসাহেব মাথা নেড়ে বললেন— সহি বাত।

সাগর বলল— বিজয়কুমার এদিক-ওদিক কোথাও নেই আর এক্ষুনি ব্যবস্থা না-নিলে ওঁকে ধরা সত্যিই কঠিন হবে। মাস্টারমশাই যা দেখেছেন, সেটা তাঁর চোখের ভুল নয়।

সস্নেহ হাসি হেসে রাঠোর বললেন— বাঃ, তুমি তো সব জেনে গেছ দেখছি। বিজয়কুমার কোথায় আছে বা সে সেখানে গেল কী করে, সেটাও কি জানতে পেরেছ? তবে তো দারোগাসাহেবের কাজ খুব-ই সহজ হয়ে গেল। না কি বলেন দারোগাসাহেব?

দারোগাসাহেব মাথা নেড়ে বললেন— সহি বাত।

সাগর বলল— বিজয়কুমার কোথায় আছেন তা আমি সঠিক না জানলেও আন্দাজ করতে পারি আর তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই দেওয়াল ভেদ করে।

রাঠোর এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন— ওই নিরেট পাথরের দেওয়াল ফুটো করে একটা মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এটা কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কথা হল না। আমি বলি কী, আপনারা এবার বাড়ি যান। পুলিশ এবার তার কাজ শুরু করবে। তাই তো, দারোগাবাবু?

দারোগাসাহেব মাথা নেড়ে বললেন— সহি বাত।

সাগর বলল— শুনুন মি. রাঠোর, আমাদের কিন্তু দেরি করা চলবে না। তাহলে হয়তো বিজয়কুমারকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।

রাঠোরের গলায় এবার বিদ্রূপের সুর। বললেন— একেবারে খুন? কী করে বুঝলে?

—দেওয়ালের ধারে এই বৃত্তচাপের মতো বাঁকা দাগটায় আর ন্যাফথালিনের গন্ধে।

—এসব কী আজেবাজে কথা বলছে এই ছেলেটি? বেশি ডিটেকটিভ গল্প পড়ার এই ফলই হয়। চলুন সবাই, আপনাদের বাংলোয় ফেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বিজয়কুমারকে নিয়ে পুলিশকে মাথা ঘামাতে দিন।

সমীর এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই কথোপকথন শুনছিল। রাঠোরকে বাধা দিয়ে বলল— একটু দাঁড়ান। সাগর, তুমি কী বলতে চাইছ, বলো তো?

সাগর বলল— আমি যা বলতে চাইছি সেটা জানতে হলে আগে এইখানে আসুন। বাবা, তুমিও এসো।

—তা না-হয় যাব। তারপর কী করতে হবে?

—আমরা তিনজনে মিলে দেওয়ালের এই জায়গাটা ঠেলব।

রাঠোর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন— না, এসব এখানে চলবে না। বিজয়কুমার একজন অত্যন্ত শয়তান লোক। অনেকদিন ধরেই আমি সেটা জানি। কাজেই, কোনো বাচ্চা ছেলে নয়, পুলিশই তার খোঁজ করবে।

দারোগাসাহেব মাথা নেড়ে বললেন— সহি বাত।

টুরিস্টদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন।

সমীর বলল— পুলিশ তার কাজ করুক-না। ছেলেটি তো শুধু চাইছে দেওয়ালের একটা জায়গায় ধাক্কা দিতে। তাতে যে কী মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে, তাই তো আমি বুঝতে পারছি না। এতে কী পুলিশের কাজে কোনোরকম বাধা দেওয়া হচ্ছে? তা যদি না-হয়, তাহলে তো পুলিশের তরফ থেকে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। তাই না দারোগাসাহেব?

দারোগাসাহেব মাথা নেড়ে বললেন— সহি বাত।

এই কথার মধ্যে সমীর সাগরের কাছে চলে এসেছে এবং দু-জনে দেওয়াল ঠেলতে শুরু করে দিয়েছে। দীপঙ্করের দরকার হল না, দু-জনের ঠেলাতেই একটা স্ল্যাব বেশ মসৃণভাবে ঘুরে গেল। দেখা গেল, সেটা আসলে একটা গোপন দরজা আর তার পেছনে একটা অন্ধকার সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে।

দরজাটা বেরোনোমাত্র রাঠোর হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠলেন— আর্কিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অনুমতি ছাড়া ওখান দিয়ে কেউ যাবে না।

কে কার কথা শোনে। সাগর সমীরকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে নামতে চেঁচিয়ে বলল— বাবা, রাঠোরকে আটকে রাখো। দারোগাসাহেব, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।

এইবার দারোগাসাহেবের মধ্যে কিছু ব্যস্ততা দেখা গেল। তাড়াতাড়ি দৌড়লেন সিঁড়িটার দিকে। বাকি সবাই রাঠোরের চারদিকে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

হরিসিং রাঠোর ভাঙেন কিন্তু মচকান না। টুরিস্ট অফিসে নিজের চেয়ারে বসে বাঁকা হেসে বললেন— আমিই যে বিজয়কুমারকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচে চোরকুঠুরিতে মুখ-হাত-পা বেঁধে আটকে রেখেছিলুম, তার কোনো প্রমাণ আছে?

সাগর বলল— বিজয়কুমার পুলিশকে যা বলেছে সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

—না, বিজয়কুমার যা বলছে তার একটি শব্দও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে একটা মহা পাজি লোক। অনর্গল মিথ্যেকথা বলে থাকে। অন্য কোনো প্রমাণ থাকে তো বলো।

—অন্য প্রমাণও আছে। সেটা আপনার গায়ে তীব্র ন্যাফথালিনের গন্ধ। আপনি পরে রয়েছেন কটন বুশশার্ট। ও জিনিস কেউ ন্যাপথালিন দিয়ে রাখে না। আর, বিজয়কুমারের পাশে যে সলমা-চুমকি বসানো প্রিন্সকোর্টটি পাওয়া গেছে তারমধ্যেও এই একই গন্ধ। সারকামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স হিসেবে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব জোরালো। তা ছাড়া, এই কোটের পকেটে যে থিয়েটারের পোশাক ভাড়া দেবার দোকানের রসিদটি পাওয়া গেছে সেখান থেকে ওটা কে ভাড়া নিয়েছিল সেটা বের করতে পুলিশের বেশি সময় লাগবে না।

সাগরের কথা শুনে রাঠোর গুম হয়ে চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ বাদে সাগর প্রশ্ন করল— এই কাজ আপনি করতে গেলেন কেন, মি. রাঠোর?

রাঠোর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন— এত কথা জেনে বসে আছ আর একথাটা জানো না?

—বিজয়কুমার গুপ্তধন সম্পর্কে কী যেন বলছিলেন বটে। তা, সেটা কি এমন একটা কাণ্ড করবার জন্য খুব জরুরি ছিল?

—নিশ্চয়ই। যে গুপ্তধনের কথা ও বলছিল সেটা আমার পরিবারের সম্পত্তি। রাজা দয়ানাথ সিং আর রানি নন্দাবাই নিঃসন্তান ছিলেন। দয়ানাথের মৃত্যুর পর তাঁর শ্যালক

সিংহাসন দখল করে রাজা হয়েছিলেন। তিনিই আমার পূর্বপুরুষ। ওই বিজয়কুমারের বংশ ছিল এখানকার রাজপরিবারের দেহরক্ষী। আলমগীর যখন এই দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন, তখন দয়ানাথের আদেশে তাঁর প্রধান দেহরক্ষক সমস্ত রাজকীয় ধনরত্ন লুকিয়ে ফেলেছিল। যুদ্ধে দয়ানাথ মারা যান, ফলে এই বিশাল সম্পদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। নতুন রাজা প্রধান দেহরক্ষকের ওপর অনেক অত্যাচার করেছিলেন কিন্তু তার পেট থেকে কথা বের করতে পারেননি।

—বেশ, ব্যাপারটা এইবার স্পষ্ট বোঝা গেল। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। আপনার বিশ্বাস, বিজয়কুমারের পরিবারে প্রচলিত কাহিনির মাধ্যমে সেই সম্পদ কোথায় থাকতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর একটা ধারণা ছিল। দুর্গের ভেতরে দর্শকদের ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে তিনি তাঁর খোঁজ পেয়ে গেছেন আর সেটা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন, যদিও আপনার মতে সেটা আপনার হক্কের ধন। অতএব, আপনি বিজয়কুমারকে জোর করে গোপন কুঠুরিতে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর গলা টিপে তার পেটের খবর বের করে নেবার জন্য এত কাণ্ড করলেন। অথচ এটা ভেবে দেখলেন না যে ওই গুপ্তধন যদি থাকেও, তবে আজ সেটা জাতীয় সম্পত্তি, তাতে কারুর ব্যক্তিগত অধিকার নেই। আর, যদি মনে করেন যে ওসব আইনের অর্থহীন কথা তাহলেও আপনি সেটা হজম করতে পারতেন না। কারণ, তা করতে গেলে যে পরিমাণ এলেম থাকা দরকার তা আপনার নেই। যদি থাকত তাহলে এমন নির্বোধের মতো একটা প্ল্যান করতেন না আর পত্রপাঠ ধরাও পড়ে যেতেন না।

টুরিস্ট বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে সমীর বলল— হরিসিং রাঠোরের এলেম থাক বা না-থাক, তোমার তো বেশ আছে বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি ধরলে কীভাবে একটু বুঝিয়ে বলো তো।

কান্তিভূষণ কুণ্ডু বললেন— এতে আবার বোঝাবার কী আছে? খুবই সহজ ব্যাপার। আমি তো প্রথমেই বলেছিলুম যে ভূত-টূত নয়, একটা লোকই ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। অবশ্য পাথরের দেওয়ালে চোরা দরজার কথাটা তখন মাথায় আসেনি। আর, ন্যাফথালিনের গন্ধটা পেলে তো রাঠোরকে সঙ্গেসঙ্গে ধরে ফেলতুম। কিন্তু পাবো কোত্থেকে? আমি একটু বেশি সিগারেট খাই কিনা, তাই এসব গন্ধ-টন্ধ আমার নাকে বড়ো একটা আসে না।

শ্রীলতা জনান্তিকে বলল— আমারও ছিল মনে, কেমনে ব্যাটা পেরেছে সেটা জানতে।

সাগর বলল— যে দুর্গে এত চোরা পথ, সেখানে রানিমহলে তা থাকবে না সেটা ভাবাই যায় না। তাহলে সেটা পাথরের দেওয়ালেই কোথাও-না-কোথাও হবে। সেখান দিয়ে কেউ এলে তার কোনো একটা চিহ্ন দেওয়ালের খুব কাছেই থাকার সম্ভাবনা। সেইজন্যেই আমি কাউকে দেওয়ালের কাছে আসতে বারণ করেছিলুম। ধুলোর ওপরে বৃত্তচাপের মতো একটা হালকা দাগ দেখে বুঝতে পারলুম যে কোন পাথরের স্ল্যাবটা আসলে একটা চোরা দরজা আর তার কোন দিকটা ঠেললে সেটা খুলে যাবে। হরিসিং এখানকার ভূতের ভয়ের কথা জানতেন। ভেবেছিলেন যে ঘরে যখন মাত্র দু-জন লোক থাকবে তখন রাজার পোশাক পরে পেছন থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে তারা অজ্ঞান হয়ে যাবে আর তিনি বিজয়কুমারকে নিয়ে চোরাকুঠুরিতে বিনা বাধায় চলে যেতে পারবেন। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল তবে মাস্টারমশাই যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠবেন আর আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ও ঘরে পৌঁছে যাব সেটা ভাবতে পারেননি।

—তোমার কি মনে হয় যে বিজয়কুমার গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন?

—আমার তো মনে হয় না। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রাঠোরের উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা। এই দুর্গের গলিঘুঁজির সব খবর রাঠোরই রাখেন, বিজয়কুমার নয়। আজকের ঘটনাটা সেই ইঙ্গিতই করে। সম্ভবত, অনেক দিন ধরেই মহারাজার গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাঠোর। না-পেয়ে হতাশার রাগটা গিয়ে পড়েছে বেচারা বিজয়কুমারের ওপরে। তবে, বিজয়কুমার গুপ্তধনের সন্ধান যদি পেয়েও থাকেন তাহলেও উনি সেটা প্রকাশ করবেন না কারণ, ওই যে বললুম, সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।



শশীশেখর লাহিড়ি ভুরু কুঁচকে তাঁর চশমার মোটা কাচের ভেতর দিয়ে সাগরকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে বললেন— তুমি রহস্যভেদ করে থাকো? এই বয়েসে?

সাগর হেসে বলল— চেষ্টা করি। সবসময় যে পেরে উঠি, তা নয়।

—বটে? আমার ছেলে অর্ণব কিন্তু বলছিল যে তোমার নাকি বেশ ভালোই ক্ষমতা আছে। ও-ই তো তোমাকে ডেকে এনেছে।

—অর্ণব আমার বহুদিনের বন্ধু। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়ছি। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার প্রতি ওর পক্ষপাতিত্ব থাকাই স্বাভাবিক।

—তা বটে। যাই হোক, এসেছ যখন, তখন আজকের মিটিং-এ থেকেই যাও। ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর গুরুদাস হাজরা এখুনি এসে পড়বেন। তাঁর আগে ব্যাপারটা তোমাকে বলি।

—সেই ভালো।

শশীশেখর যা বললেন সেটা এইরকম—

উত্তর কলকাতার বসাকপাড়ায় শশীশেখরের পৈত্রিক বাড়ি। গঙ্গার ধারে দোতলা; প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো ইমারত। শশীশেখরের পূর্বপুরুষ হেমশঙ্কর লাহিড়ি বগুড়া থেকে কলকাতায় এসে কাগজের ব্যাবসা শুরু করেছিলেন। টাকাপয়সা হয়েছিল অনেক। তাই দিয়েই বাড়িটা বানানো। তারপর পরিবার যত বড়ো হয়েছে, ততই ও বাড়িতে থাকবার জায়গা কমে এসেছে। শেষপর্যন্ত, শশীশেখরের বাবা ডাক্তার বিধুশেখর লাহিড়ি দক্ষিণ কলকাতার চারুচন্দ্র স্ট্রিটের বর্তমান বাড়িটা বানিয়ে সেখানে উঠে আসেন। বসাকপাড়ায় তাঁর ছোটোকাকার পরিবার এখনও থাকেন। তাঁদের কপালে একটা ঘর আর একটা বারান্দা জুটেছে।

মাসছয়েক আগে, শশীশেখরের স্ত্রী গৌরী দেবী তাঁর খুড়শ্বশুড়ের ছোটোছেলে চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে একটা টেলিফোন পান। চন্দ্রশেখর তাঁকে বলে যে তাঁর সামনে ভয়ংকর বিপদ আসছে, অতএব তিনি যেন সাবধানে থাকেন, আর এই ফোনের কথা যেন কাউকে না জানানো হয়। তিনি অবশ্য কথাটা তৎক্ষণাৎ শশীশেখরকে বলেন। পরের

দিনই শশীশেখর বসাকপাড়ায় গিয়ে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করেন। সে ফোনের কথাটা অস্বীকার তো করেই আর যেন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছে, এরকম একটা ভাব করে।

এর দু-দিন পরে আবার ফোন আসে। এবার শশীশেখরকে কথাটা বলে দেওয়ার জন্য গৌরী দেবীকে রীতিমতো শাসানো হয়। আর বলা হয় যে তাঁদের দু-জনের গোপন কুকীর্তির কথা এবার ফাঁস করে দেওয়ার সময় হয়েছে। সেটা যদি আটকাতে চান, তাহলে তিনি যেন দশহাজার টাকা জোগাড় করে রাখেন। এই কথা শুনে শশীশেখর অবিলম্বে লোকাল থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসেন।

তদন্ত করে পুলিশ তাঁকে যে খবর দেয় তাতে তাঁরা খুব চিন্তায় পড়ে যান। চন্দ্রশেখর নাকি একজন মারাত্মক লোক। সে ভালোমানুষির মুখোশ পরে নানা অসামাজিক কাজকর্ম করে থাকে। হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে করতে পারে না। মানে, যাকে বলে, সে একটা হার্ডকোর ক্রিমিনাল। পুলিশ অনেকবারই ও-বাড়িতে হানা দিয়েছে, যদিও কিছুই ধরতে পারেনি।

এই ঘটনার দিনতিনেক বাদে হঠাৎ খবর আসে যে চন্দ্রশেখর আত্মহত্যা করেছে। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাও অদ্ভুত। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে খাটে বসে টাকা গুনছিল। সেই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দরজা ভেঙে পুলিশ যখন ভেতরে ঢোকে, তখনও তাঁর হাতে পাঁচ-শো টাকার কুড়িটা নোট।

স্বভাবতই, পুলিশ প্রথমে ধরে নিয়েছিল যে চন্দ্রশেখর হার্টফেল করে মারা গেছে। কিন্তু পোস্টমর্টেমের পর দেখা গেল যে তাঁর মৃত্যুর কারণ পটাশিয়াম সায়ানাইডের বিষক্রিয়া। তাঁর মানে এটা আত্মহত্যা। কিন্তু, সেখানে কয়েকটা প্রশ্ন উঠল।

প্রথমত, টাকা গুনতে-গুনতে সে আত্মহত্যা করতে গেল কেন? দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘরে যে পটাশিয়াম সায়ানাইডের শিশিটি পাওয়া গেছে, সেটা ছিল তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে। পটাশিয়াম সায়ানাইড খেলে তাঁর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হওয়ার কথা। তাহলে, শিশিটি ওখানে গেল কী করে? তৃতীয়ত, সে যদি কোনো চামচে সেটা মুখে ঢেলে দিয়ে থাকে, তাহলে সেই চামচটা বা গেল কোথায়?

এইখানে পুলিশের সন্দেহ এসে পড়ল শশীশেখরের ওপরে। চন্দ্রশেখর শশীশেখরের কাছে দশহাজার টাকা দাবি করেছিল। তাঁর হাতেও ছিল দশহাজার টাকা। এটা হতে পারে যে শশীশেখর একটা নোটের ওপরে পটাশিয়াম সায়ানাইডের গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখে তাকে টাকা দিয়েছিলেন। জিভ দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে টাকা গুনতে গিয়ে সেই বিষ তাঁর মুখে চলে যায়, আর তার মৃত্যু হয়। এই সন্দেহের ওপরে পুলিশ হয়তো তাঁকে গ্রেপ্তার করত। করেনি, কারণ তাঁর হাতে যে টাকাগুলো ছিল, তাঁর কোনোটাতেই কোনো বিষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেই রহস্যের সমাধান করতেই লালবাজার থেকে মি. হাজরা আসছেন শশীশেখরকে জেরা করবার জন্য।

সবকথা শুনে সাগর বললেন— আমি কি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

শশীশেখর বললেন— করো।

—আপনি বললেন যে, চন্দ্রশেখর আপনার ছোটোকাকার ছোটো ছেলে। ওঁর আর ক-টি ভাইবোন? তাঁরা কে কী করেন?

—ছোটোকাকার দুই ছেলে এক মেয়ে। বড়ো ছেলে হিমাদ্রিশেখর। সে আত্মভোলা মানুষ, গানবাজনা নিয়ে আছে। শ্যামবাজারে তাঁর একটা গানের স্কুল আছে। স্কুলটা বেশ

ভালোই চলে। তারপরে মেয়ে প্রতিমা। সে এমএসসি পাশ করে বরানগরে একটা ওষুধের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত। সম্প্রতি সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে বসে আছে আর চাকরি খুঁজছে।

—আপনার কাকা আর কাকিমা কি বেঁচে আছেন?

—কাকা বেঁচে নেই। কাকিমা বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। ঘটনার সময় তাঁকে নিয়ে প্রতিমা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল আর হিমাদ্রি ছিল গানের স্কুলে।

—ওই পরিবারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

—সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বসাকপাড়ার বাড়িতে বিয়ে বা ওই ধরনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান হলে দেখা হয়, এই পর্যন্ত।

—তখন চন্দ্রশেখর বা তাঁর ভাইবোনেরা আপনাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেন?

—বলবার মতো কিছু নয়। চন্দ্রশেখরকে তো প্রায় কখনোই দেখি না। হিমাদ্রি বা প্রতিমা হেসে কথা বলে, এই আর কী।

—আপনি তো মহারাজা স্বর্ণকুমার কলেজে ইকনমিক্স পড়ান। মাসিমা ঘরসংসার নিয়েই আছেন। এখন, আপনার বা মাসিমার কী এমন কোনো অতীত ইতিহাস আছে যা কোনোমতেই প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়? আমি ইতিহাসটা জানতে চাই না, শুধু জানতে চাই যে সেরকম কিছু আছে কিনা।

—কখনোই নয়। আমি বা আমরা কখনো কোনো বেআইনি কাজ করিনি।

—বেশ। তাহলে দেখুন, চন্দ্রশেখরবাবু যদি আত্মহত্যা করে না-থাকেন, তাহলে তাঁর মৃত্যু ঘটানোর জন্যে চারজনের ওপরে সন্দেহ হওয়ার কথা। এক নম্বর, আপনি। টেলিফোনে খবরটা পেয়েই আপনি বসাকপাড়ায় গিয়েছিলেন। হয়তো, টাকা দিতে। টাকায় সামান্য বিষের গুঁড়ো মেশানো ছিল যেটা আপনি আপনার কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে জোগাড় করেছিলেন। সেটা হাওয়ায় উড়ে গেছে। বিছানার চাদরটা পরীক্ষা করলে সেটা জানা যাবে। দু-নম্বর, হিমাদ্রিশেখর। একটা ঘরের মধ্যে চারজনে মিলে থাকেন। তাঁর ওপরে অসুস্থ মা। খুবই অসুবিধে হওয়ার কথা। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া, পুলিশের ঝামেলা। ছোটোভাইয়ের যা সুনাম, তাতে বোনের বিয়ে দেওয়াও কঠিন। কাজেই, চন্দ্রশেখর সরে গেলে সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিন নম্বর, প্রতিমা। তাঁরও একই সমস্যা। তা ছাড়া, তিনি ওষুধের কারখানায় কাজ করতেন। হয়তো সেখান থেকে পটাশিয়াম সায়ানাইড গোপনে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। চার নম্বর, অন্য কেউ।

সাগরের কথা শেষ হওয়ামাত্র দরজার পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়স্ক বেঁটেখাটো ভদ্রলোক। তাঁর পরনে নীলরঙের শার্ট আর কালো ট্রাউজার্স।

ভদ্রলোক বললেন— আমার নাম গুরুদাস হাজরা। আমি লালবাজার থেকে আসছি।

প্রাথমিক অভ্যর্থনা আর পরিচয়পর্ব শেষ হলে হাজরা বললেন— আমি আপনাদের অনুমতি ছাড়াই দরজার বাইরে থেকে এই ছেলেটির কথা শুনছিলুম। আপনার ছেলে ঠিক কথাই বলেছে, প্রফেসর লাহিড়ি। স্বীকার করতেই হবে যে রহস্যভেদে এর একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।... এবার তাহলে বলো তো সাগরবাবু, আমাদের এখন কী কর্তব্য?

সাগর অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলল— আমি কখনো আপনাকে তা বলতে পারি?

—খুব পারো। তুমি তো এখন আমাদের সঙ্গে আছ। তাহলে বলো তো, যে চারজনের কথা বললে, তাদের ব্যাপারে কীভাবে এগোনো যেতে পারে?

—মেসোমশায়ের ব্যাপারে বলতে পারি যে তাঁর অতীত জীবনের ওপরে একটা বিশদ তদন্ত হওয়া দরকার। সেইসঙ্গে মাসিমারও। কোনো একজন তাঁদের ব্ল্যাকমেল করতে উদ্যত হয়েছিল। কেন? সেটা কি কোনো কারণ ছাড়াই করা হয়েছিল? আর ফোনগুলো কে করেছিল? চন্দ্রশেখর না অন্য কেউ।

—তাহলে তোমাকে বলি, চন্দ্রশেখরের মোবাইল ফোন থেকে জানা গেছে যে ফোনগুলো সেই করেছিল।

—ভালো কথা। বাকি তিনজনের ব্যাপারে কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারব না। কারণ, আমি তাদের চিনিও না, তাদের সঙ্গে কথাও বলিনি।

—তুমি কি তাদের সঙ্গে আলাদা-আলাদা কথা বলতে চাও?

—তাহলে তো খুব ভালোই হয়। তবে আমি আপনার সামনেই কথা বলতে চাই।

—সে ক্ষেত্রে, বসাকপাড়ার বাড়িতে কথা বলা যাবে না। একটাই ঘর। সেখানে হিমাদ্রিশেখরের মা রয়েছেন। তিনি একে সুস্থ নন, তাঁর ওপরে পুত্রশোকে পাগলের মতো হয়ে খুব চ্যাঁচামেচি করছেন। ওই পরিবেশে শান্তভাবে কোনো আলোচনা চালানো একেবারেই অসম্ভব। আমি তাহলে হিমাদ্রিশেখর আর প্রতিমাকে লালবাজারে আসতে বলি। আমার ঘরে বসেই কথা বলা যাবে। আজ থেকে দিনপনেরো-বাদে কুড়ি তারিখে তুমি আর শশীশেখরবাবু এগারোটার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। সেইসময় তোমার কি স্কুল আছে?

—না, এখন তো গরমের ছুটি।

—বেশ, তাহলে তো কোনো অসুবিধে নেই। তোমার বাড়ি থেকে কোনো আপত্তি উঠবে না তো?

—বাবা কোনো আপত্তি করবেন না, তবে মা করবেন। উনি আমার এইসব কাজ একেবারেই পছন্দ করেন না।

—সেটা তুমি ম্যানেজ করে নিও।

—তা নেব। তবে আমি ঠিক কোন অধিকারে ওখানে উপস্থিত থাকব? যাঁদের আপনি জেরা করবেন, তাঁরা তো আপত্তি করতে পারেন।

—সেটা আমি ম্যানেজ করব। তবে, তোমার যদি অস্বস্তি হয়, তুমি তোমার প্রশ্নগুলো আমাকে একটা চিরকুটে লিখে দেবে, আমি সেগুলো ওদের জিগ্যেস করব।

—সেটা ভালো কথা। আমি মূল প্রশ্নগুলো খাতায় লিখে আপনাকে দিয়ে দেব। আর তার ওপরেও যদি কোনো জিজ্ঞাস্য থাকে সেগুলো আলাদা করে আপনাকে লিখে দেব।

—তাই হবে। আর ইতিমধ্যে শশীশেখরবাবু আর তাঁর স্ত্রীর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেক করা হয়ে যাবে।

শশীশেখর হাত নেড়ে বললেন— ভালো রে ভালো। সাগরকে ডেকে এনে দেখছি মহা উপকারই করল আমার পুত্র। কোথাও কিছু নেই, মাঝখান থেকে পুলিশ আমারই পেছনে পড়ে গেল। তাও আবার খুনের দায়ে। আচ্ছা গুরুদাসবাবু, সাগরকে যে আপনি এতটা

পাত্তা দিচ্ছেন, সেটা কী খুব আইনসংগত হচ্ছে? আপনার ওপরওয়ালারা কি এটা ভালো চোখে দেখবেন?

—আমার ওপরওয়ালারা জানতেই পারবেন না। আসলে কী জানেন, সাগরের বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। আমি দেখতে চাই ও কতদূর যেতে পারে। তা ছাড়া, এটা একটা খুনের ব্যাপার। এখানে আমার প্রিন্সিপল হল, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পেলেও পাইতে পারো অমূল্যরতন। আমার মনে হচ্ছে, এই ছেলেটি একটি অমূল্যরতন।

অমূল্যরতন সহাস্যে বলল— ছাই আবার কোথায় দেখলেন, স্যার?

কুড়ি তারিখে আলোচনা শেষ হল প্রায় একটার সময়।

গুরুদাস বললেন— কিছু বুঝলে, সাগর?

সাগর বলল— ছাড়া-ছাড়াভাবে বুঝেছি। সবটা সাজাতে দিনদুয়েক ভাবতে হবে। তারপরে আপনার সঙ্গে বসব।

—সেই ভালো। আমিও কিছুটা বুঝেছি। দেখি, তোমার সঙ্গে মেলে কি না।

তিনদিন পরে শশীশেখরবাবুর বাড়ির বসবার ঘরে কথাবার্তা শুরু হল। শশীশেখর, গুরুদাস আর সাগর ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন শশীশেখরবাবুর স্ত্রী অনুরাধা আর অর্ণব।

গুরুদাস বললেন— শশীশেখরবাবু আর মিসেস লাহিড়ির ব্যাপারে যেটুকু জানতে পারা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রজীবনে দু-জনেই বেশ ভালোভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শশীশেখরবাবু আন্দোলন করতে গিয়ে একাধিকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন আর বারদুয়েক হাজতবাসও করেছেন। তবে মিসেস লাহিড়ির সেরকম কোনো রেকর্ড অবশ্য পাওয়া যায়নি। এটা এমন কোনো ঘটনা নয় যাতে তাঁকে কেউ ব্ল্যাকমেল করতে পারে। এরপর, হিমাদ্রিশেখর। রগচটা বলে তাঁর ছাত্রমহলে বদনাম থাকলেও, তাঁর কোনো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। প্রতিমাও তথৈবচ। ইনিও তাঁর দাদার মতো রগচটা। তবে, উনি যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ছিলেন, তাঁরা কখনোই পটাশিয়াম সায়ানাইড ব্যবহার করে না। বলা যেতে পারে যে নরহত্যা করবার মতো মানসিকতার ইতিহাস এঁদের নেই। তবে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'আন্ডার এক্সট্রিম প্রোভেকেশন' তাঁরা যে এরকম কিছু করতে পারেন না, সে কথা জোর করে বলা যায় না।

অনুরাধা বললেন— আর চন্দ্রশেখর?

—সে একটা নামকাটা সেপাই। হেন ক্রাইম নেই যা সে করেনি বা করতে পারে না। পুলিশ তাকে ধরবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। প্রত্যেকবারই সে পাঁকাল মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গেছে। এইবার, সাগর, তুমি বলো যে কুড়ি তারিখের আলোচনায় ওরা যা-যা বলেছেন তাতে কোন ব্যাপারটা তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

সাগর বলল— একটা তো নয়, অনেকগুলো ব্যাপারই আমার কাছে অত্যন্ত দরকারি বলে মনে হয়েছে।

—যথা?

—প্রথমত, চন্দ্রশেখরের ব্যাবসায় ইদানীং অত্যন্ত মন্দা যাচ্ছিল। পুলিশের উপদ্রব এবং অন্যান্য কারণে তার চিত্তে সুখ ছিল না। ফলে, আগে তিনি বাড়িতে যদিও সবসময়ে খুব হাসিখুশি থাকতেন, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ খুব গম্ভীর আর চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো এই জন্যেই তাঁর বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ না-হলেও কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঘটনার দিন আটটা নাগাদ তিনি ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলেন আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর মৃত্যু ন-টার সময়। তৃতীয়ত, সেদিন সকাল থেকেই প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। চতুর্থত, ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়, তাঁর কাছে ঘন্টু নামের একটি লোক এসেছিল। লোকটি তাঁর বিজনেস পার্টনার মধুকর মণ্ডলের সাগরেদ, মাঝে-মাঝেই সে তাঁর কাছে আসত। তাঁদের রান্না আর খাওয়ার জায়গা বরান্দার একটি ঘেরা অংশে। উনি সেখান থেকে ঘন্টুকে নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে যান। মিনিটদুয়েক বাদে বেরিয়ে আসেন হাসতে হাসতে। এসে বলেন, ‘যাক বাবা,বাঁচা গেল। এবার দেখব, ব্যাটা আর কতদিন রোয়াবি দেখাতে পারে।’ আর সব শেষে, চন্দ্রশেখর আজকাল একটা অদ্ভুত পেটের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, কোনো ডাক্তারই সেটা সারাতে পারছিলেন না।



ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গুরুদাস বললেন— সেদিন যে খুব গরম পড়েছিল, এটাও তোমার মতে একটা খুব প্রয়োজনীয় তথ্য? তুমি কি বলতে চাও, সেদিন গরম না পড়লে চন্দ্রশেখর খুন হতেন না।

—না, আমি তা বলতে চাই না। সেদিন গরম না পড়লে, রহস্যটা এতটা জটিল হত না।

—বটে? যাহোক, তুমি একের-পর-এক তোমার পয়েন্টগুলো ব্যাখ্যা করে বলো।

—বেশ। প্রথমে ধরা যাক চন্দ্রশেখরবাবুর ব্যাবসার কথা। তাঁর কাজ ছিল, প্রথমত লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করা। পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি, তাঁর গতিবিধিও বন্ধ

হয়নি। তাহলে তাঁর রোজগারপাতি কমে গিয়েছিল কেন? এর জন্যে কী পুলিশের ঝামেলা দায়ি, না অন্য কোনো কারণ?

গুরুদাস বললেন— একটা কারণ হতে পারে তাঁর দলের মধ্যে গণ্ডগোল। দলের যে মদত তাঁর পাওয়ার কথা, তা সে পাচ্ছিল না।

—ঠিক তাই। এরপর দেখুন, ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়, ঘন্টু নামক একটা লোক এসেছিল। খাওয়া বন্ধ করে তাকে নিয়ে চন্দ্রশেখরবাবু ঘরে চলে যান। সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন হাসতে হাসতে। তার মানে, ঘন্টু তাঁকে এমন কিছু দিয়েছিল যা তাঁকে খুশি করেছিল। সেটা, ধরে নেওয়া যেতে পারে, দশহাজার টাকা যা গুনবার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর টাকার টানাটানি চলছে। বাড়িতে আগে থেকে গুনে না-রাখা দশহাজার টাকা না-থাকাই স্বাভাবিক। ঘন্টুই যে সেই টাকাটা এনে দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ থাকে না। কোত্থেকে এল সেই টাকা?

—তুমি কি সেটাও ধরতে পেরেছ?

—ঠিক ধরতে পেরেছি কি না জানি না, তবে অনুমান করতে পারি।

—কী করে অনুমান করলে?

—চন্দ্রশেখরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যে মন্তব্য করেন, তার থেকে। উনি বলেছিলেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। এবার দেখব, ব্যাটা আর কতদিন রোয়াবি দেখাতে পারে।' 'যাক বাবা, বাঁচা গেল' থেকে বোঝা যায় যে ঘন্টু তাঁকে যে টাকা দিয়ে গেছে সেটা তাঁর খুব দরকার ছিল। আর 'এবার দেখব, ব্যাটা আর কতদিন রোয়াবি দেখাতে পারে' থেকে অনুমান করা যায় টাকাটা যে ব্যাটার কাছ থেকে এসেছে তাঁর রোয়াবি চন্দ্রশেখরবাবুর একেবারেই পছন্দ নয়। এই ব্যাটা যে মেসোমশাই সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। চন্দ্রশেখরবাবু মেসোমশাই-এর কাছে দশহাজার টাকাই দাবি করেছিলেন আর মেসোমশাই-এর স্বচ্ছলতা যে বসাকপাড়ার পরিবার ভালো চোখে দেখে না সেটা আমরা জানি।

—তোমার এই অনুমান কিন্তু কিছু প্রশ্ন ওঠে।

—আমি জানি। আর একটু বিশদভাবে বলি। 'এবার দেখব' কথাটা থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়। প্রথমত, চন্দ্রশেখরবাবু খুব একটা নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে টাকাটা আদায় করা যাবে কি না। আর আদায় যখন হল, তখন তিনি বুঝতে পেরে গেলেন যে এবার মেসোমশাইকে দোহন করা যাবে বেশ ভালোভাবে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে।

গুরুদাস উত্তেজিতভাবে সোফার ওপরে সোজা হয়ে বললেন— কী বলতে চাইছ তুমি?

—আমি বলতে চাইছি যে চন্দ্রশেখরবাবু যখন মাসিমাকে ফোন করেছিলেন তখন তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন না যে মেসোমশাইয়ের সত্যিই প্রকাশ করার অযোগ্য কোনো অতীত ইতিহাস আছে কি না। টাকাটা পাওয়া যেতে সে ব্যাপারে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। অর্থাৎ কেউ তাঁকে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়েছিল মাসিমাকে ফোন করবার জন্য। সে কে হতে পারে?

গুরুদাস দাঁতে দাঁত চেপে বললেন— মধুকর মণ্ডল। সেই ঘন্টুর হাত দিয়ে টাকাটা পাঠায়। সে জানত যে তাঁর পরামর্শটা ভিত্তিহীন, কাজেই সেটা তাঁর নিজের টাকা। আর

ঘন্টুই বিষটা চন্দ্রশেখরের হাতে তুলে দেয় আর কোনোভাবে সায়ানাইডের শিশিটা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেয়।

সাগর হেসে বলল— ঠিক তাই। তবে আমার ধারণা, শিশিটা ড্রয়ারের ভেতরে রাখাটা বোধ হয় ওরিজিনাল প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। ঘন্টু নার্ভাস হয়ে ওই ভয়ানক বিষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের পকেট থেকে বের করে দেওয়ার জন্যই কর্মটি করে।

—নোটগুলোর ওপরে সায়ানাইড ছিল না কেন? মধুকর বোধ হয় জানত না যে চন্দ্রশেখরের জিভ দিয়ে আঙুল ভিজিয়ে টাকা গোনার অভ্যাস আছে কি না, তাই না?

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। মধুকরই গোপনে চন্দ্রশেখরবাবুর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিচ্ছিল। তাকে মাঝেমধ্যেই গণ্ডগোলে ফেলছিল যাতে সে ব্যাবসাটা কুক্ষিগত করতে পারে। কিন্তু তাতে দেরি হচ্ছিল বলেই সে অনেক আঁটঘাঁট বেঁধে, নিজের পকেট থেকে টাকাটা পাঠিয়ে, তাঁর বন্ধুকে খুন করে। আমার ধারণা, আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন যে সে-ই পুলিশকে খবর দিয়ে ঝামেলাগুলো করাত। পুলিশ কিছু করতে পারেনি তার কারণ তাঁরা সঠিক বা পুরো খবর পেত না। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তা পেলে তো মধুকরও ফেঁসে যেতে পারত। সে শুধু চন্দ্রশেখরবাবুকে দুর্বল করে দিচ্ছিল যাতে তাঁর আত্মহত্যাটা পুলিশ মেনে নেয়।

—বিষটা সে চন্দ্রশেখরকে খাওয়াল কী করে?

—দেখুন, সকাল আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট শেষ করে সবাই হাসপাতালে চলে গেল। তখন, চন্দ্রশেখরবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করে টাকা গুনতে বসলেন। ন-টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হল। ঠিক এক ঘণ্টা বাদে। কেন?

শশীশেখর রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন— কেন?

—সেটা বোঝা তো কঠিন নয়। মনে রাখতে হবে যে চন্দ্রশেখরবাবু আজকাল এমন একটা অদ্ভুত পেটের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যেটা কোনো ডাক্তারই সারাতে পারছিলেন না। এমন অবস্থায় আমরা কী করি? হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধ ট্রাই করি। এই হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধ কোনোকিছু খাওয়ার এক ঘণ্টা বাদে খেতে হয়। এটা পাওয়া যায় ছোটো শিশিতে গ্লোবিউলে নয়তো কাগজের পুরিয়ায় সাদা পাউডার হিসেবে। এই পাউডারের সঙ্গে সায়ানাইড মিশিয়ে দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ। তাই করা হয়েছিল। চন্দ্রশেখরবাবু মধুকরকে সন্দেহ করতেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁর দেওয়া মেসোমশাই সংক্রান্ত খবরটা যখন ঠিক প্রমাণিত হল আর তাঁর লোক টাকাটাও এনে দিল, তখন তাঁর পাঠানো ওষুধটা খেতে আর তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

গুরুদাস বললেন— আচ্ছা, তাই তুমি গরমের কথা বললে? ঘরে জোরে ফ্যান চলছিল। চন্দ্রশেখর মারা যেতে পুরিয়ার কাগজটা তাঁর হাত থেকে পড়ে যায় আর ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে চলে যায় খাট বা আলমারির নীচে। ঘর সার্চ করলেও সেটা কারুর নজরেই পড়ত না। বাঃ, বাঃ, চমৎকার। অসাধারণ। আমি ভাবতেই পারিনি... সে যাক। এবার তাহলে আমরা ঘন্টুকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করি?

সাগর হাসল। বলল— তাকে বোধ হয় পাবেন না। সে হয় গা ঢাকা দিয়েছে নয়তো আর ইহজগতে নেই।

—আর মধুকর?

—তাকে হয়তো পাবেন। সে থাকে কোথায়?

—বসাকপাড়াতেই থাকে। গঙ্গার দিকে।

—তাহলে, পাড়ার কোনো হোমিয়ো ওষুধের দোকানে খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে ঘন্টু সম্প্রতি সেখান থেকে কোনো ওষুধ কিনেছিল কি না। এর ভিত্তিতে, দেখুন, তাঁর পেটের থেকে কথা বের করতে পারেন কিনা।

গুরুদাস হাজরা হেসে উঠে বললেন— ও তুমি ভেব না। পেটের কথা টেনে বের করাই তো আমাদের কাজ। তাঁর অনেক রাস্তা আছে। সেটা আমি ম্যানেজ করব।



চিন্ময় গুহর মৃত্যুরহস্য

উত্তরাঞ্চল প্রদেশের ভোগরাই গ্রামের নাম এখনও সর্বত্র খুব পরিচিত নয় তবে ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। হিমালয়ের এই অঞ্চলে যারা ট্রেকিং করে, তারা এর নাম জানে। আগে এখানে হেঁটে যেতে হত, এখন বাস চলাচলের উপযোগী রাস্তা হয়ে গেছে।

গ্রামটি একটি প্রশস্ত উপত্যকার ওপরে। তার চারপাশে গাঢ় সবুজ জঙ্গলে ঢাকা আকাশছোঁয়া পাহাড়গুলো মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে দেবতাত্মা হিমালয়ের অনেকগুলো শুভ্র তুষারমণ্ডিত চুড়ো উঁকি দিয়ে গ্রামটির সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখে। গ্রামটির কাছেই একটি বেশ উঁচু ঝরনা আছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে মিনিট পনেরো লাগে। তার পাশেই রয়েছে মহাকাল শিবের একটি অতি প্রাচীন মন্দির।

সরকারি তৎপরতায় গ্রামটিকে একটি পর্যটনকেন্দ্র করে গড়ে তোলার কাজ চলছে কয়েক বছর ধরে। একটা ইউথ হস্টেল আগে থেকেই ছিল, তার ওপরে আরও কয়েকটা হোটেল তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। বছর দুয়েক হল, কলকাতার প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল ইন এখানে রিট্রিট নামে একটি সুদৃশ্য চারতারা হোটেল বানিয়েছে। তবে লোকজন আশানুরূপ আসছে না। সেজন্য তারা সপরিবারে সাংবাদিক দীপঙ্কর চৌধুরিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যাতে তিনি কলকাতায় ফিরে কাগজে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো রিট্রিট সম্পর্কে কিছু লেখেন। পুজোর ছুটি চলছিল। কাজেই অতসীর সঙ্গে সাগর আর শ্রীলতাও দীপঙ্করের সঙ্গী হয়ে গেল।

রিট্রিট ভোগরাই গ্রামের থেকে একটু দূরে জঙ্গলের ভেতরে। হোটেলের চৌহদ্দি বেশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে একটা বাড়ি নয়, অনেকগুলো কটেজ গাছপালার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কটেজগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্যে রয়েছে পাথরে বাঁধানো সরু পায়ে চলার পথ। প্রত্যেকটি কটেজের সামনে ফুলের বাগান আর ভেতরে আরামপ্রদ থাকবার ব্যবস্থা। এ ছাড়াও রয়েছে সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, লাইব্রেরি, বই-এর দোকান, কিউরিও শপ ইত্যাদি।

কাঠগুদাম থেকে জিপে ভোগরাই পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল। রাত্রের খাওয়া সেরে বিছানায় শোওয়ামাত্র সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ঘুম ভাঙল। না, পাখির ডাকে নয়,

লোকজনের চ্যাঁচামেচিতে। ব্যাপারটা কী জানবার জন্য দরজা খুলে বাইরে এলেন দীপঙ্কর, সঙ্গে সাগর। দেখা গেল হোটেলের কিছু উত্তেজিত কর্মচারী কলরব করতে করতে তাঁদের কটেজের সামনে দিয়ে চলেছে, আর তাদের পেছনে পেছনে আসছেন ওই সাতসকালেই স্যুটেড-বুটেড হোটেলের ম্যানেজার ভবানীপ্রসাদ রায়, একজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ ইন্সপেক্টর আর জনা চারেক বন্দুকধারী কনস্টেবল।

আগেরদিন রাত্রে ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে দীপঙ্করের পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে ডেকে দীপঙ্কর জিগ্যেস করলেন— কী হয়েছে মি. রায়? এতসব পুলিশ-টুলিশ এসেছে কেন?

ভবানীপ্রসাদ টাকমাথা মোটাসোটা মানুষ। দীপঙ্করের প্রশ্ন শুনে টাই-এর নট ঠিক করতে করতে বললেন— আর বলবেন না মশাই। যতসব বিচ্ছিরি ঝামেলা। এসব একটু মিটে যাক। আপনারা ব্রেকফাস্ট করে আমার অফিসে আসুন, তখন সব বলব।

ব্রেকফাস্টের পর, কিচ্ছু কিনবেন না বলতে বলতে অতসী কিউরিও শপে চলে গেলেন। সাগর আর শ্রীলতাকে নিয়ে দীপঙ্কর গেলেন রিসেপশন কাউন্টারের পেছনে ভবানীপ্রসাদের অফিসে। রায়সাহেব তখন গম্ভীরভাবে কতগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন। অতিথিদের ঢুকতে দেখে সেসব সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন।

দীপঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে রায়সাহেব জানালেন যে তাঁর একজন গেস্ট অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে মারা গেছেন। না, হোটেলে নয়, বাইরে জঙ্গলে। গেস্টটির নাম ড. চিন্ময় গুহ, বাড়ি শ্যামবাজারের মুনীন্দ্র মিত্র লেনে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ড. গুহ এর আগেও কয়েক বার এই হোটেলে এসেছেন। অত্যন্ত নিরীহ, নির্বিরোধ মানুষ। সারাদিন পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। কেবল রাত্রে ঘরে শুতে আসতেন। মাঝে মাঝে দু-তিনদিন তাও আসতেন না। গতকাল দুপুরে যথারীতি উনি হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। রাত্রে ফিরে না-আসায় কেউ উদবিগ্ন হয়নি। তাঁর যে-কোনো বিপদ হয়েছে তা কারোরই মনে হয়নি।

আজ ভোর না-হতে ভোগরাই থানার ওসি সুলেমান কুরেশি সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে এসে হাজির। কাল রাত্রে একজন কনট্রাক্টরের লোক একটা রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন শার্ট আর ড. গুহর একটা ব্যাগ থানায় জমা দেয়। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা বড়ো লেবার কলোনি আছে। তার পেছনে জঙ্গলের ভেতরে সে ওগুলো কুড়িয়ে পায়। কুরেশি ড. গুহর ঘর সার্চ করে সেটা সিল করে দিয়ে গেছেন। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যে ড. গুহ কোনো হিংস্র বন্যজন্তুর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন।

সাগর জিজ্ঞাসা করল— এ অঞ্চলে বন্যজন্তুর আক্রমণের ঘটনা কি আগে কখনো ঘটেছে?

ভবানীপ্রসাদ বললেন— আমি কখনো শুনিনি। তবে চারদিকে এত ঘন জঙ্গল। ওপর থেকে ভালুক বা নীচ থেকে বাঘ এখানে চলে আসতেই পারে।

—আপনি যে লেবার কলোনিটার কথা বললেন সেটা ঠিক কোথায়?

—ওটা এখানে আসার বাস-রাস্তার ধারে একটা টিলার ধারে। চারদিকে যত কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে, তার ওয়ার্কাররা ওখানে থাকে।

—ওখানে যারা থাকে তারা কি কখনো বাঘ-ভাল্লুকের উপস্থিতি টের পেয়েছে?

—মনে হয় না। সেরকম কিছু হলে খবর পেতুম।

—ইতিহাসের অধ্যাপক পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন কেন?

—এখানে নাকি কোনো এককালে একটা বৌদ্ধবিহার না কী যেন ছিল? সেটারই সন্ধান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

ভবানীপ্রসাদের অফিস থেকে বেরিয়ে সুইমিং পুলের কাছে এসে দেখা গেল তার ধারে হোটেলের বাসিন্দাদের একটি উত্তেজিত জটলা। সকলেই অবাঙালি, সবাই সমস্বরে ড. গুহর মারা যাওয়া নিয়ে কথা বলছেন। কার কথা কে শুনছেন বোঝা দুষ্কর।

এই জটলার থেকে একটু দূরে একটা টেবিলে দু-জন মাঝবয়সি ভদ্রলোক অত্যন্ত চিন্তিতমুখে চুপচাপ বসে ছিলেন। একজন কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চোখে রিমলেস সোনার ফ্রেমের চশমা আর পরনে পাজামা-পাঞ্জাবির ওপরে মহার্ঘ কাশ্মীরি শাল। অন্যজনের দোহারা চেহারা, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি-জহরকোট আর শাল। তাঁরা কেন যে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেননি, সেটা বোঝা গেল না।

এই দু-জনের পাশে একটা খালি টেবিলে দীপঙ্কর ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসে পড়লেন। সাগরকে প্রশ্ন করলেন— ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনায় কিছু বুঝলি?

সাগর গলাটা একটু উঁচু করে বলল— কিছুই না। কেবল, কতগুলো জায়গায় খটকা লেগেছে।

—যথা?

—এক নম্বর, পুলিশ অত সকালে এল কেন? এরকম তো সাধারণত হয় না। দু-নম্বর, দু-মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে কোনো বন্যজন্তুর শিকার; একজনের ঘর সার্চ করতে চারটে রাইফেলধারী সেপাই আনবার দরকার পড়ল কেন? দারোগা কি আশঙ্কা করছিলেন যে বন্যজন্তুটা ওই ঘরের মধ্যে বসে আছে? তিন নম্বর, ড. গুহ যে বৌদ্ধবিহার খুঁজছিলেন, সেটা কার কাজ? নিজের না বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের? বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি হত, তাহলে তারা তাঁকে নিশ্চয়ই চারতারা হোটেলে রাখত না। তাহলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটা নিজের জন্যই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে এত খরচ করে কোনো সহকারী ছাড়াই তিনি এই কাজটি করছিলেন কেন? চার নম্বর, ড. গুহ যে মৃত তার প্রমাণ হিসেবে যা দেখানো হয়েছে সেটা তাঁর একটা রক্তমাখা শার্ট। কেন? বাকি জামাকাপড় কোথায় গেল? সেগুলো কি ভালুকবাবাজি তাঁর ছেলেকে দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছেন?

সাগর তার বক্তব্য শেষ করা মাত্র পাশের টেবিলের ভদ্রলোক দু-জন হাততালি দিয়ে উঠলেন। রিমলেস চশমা বললেন— সাবাস! তুমি তো বড়ো হলে মস্ত ডিটেকটিভ হবে হে। এ তো রীতিমতো প্রতিভা।

বলতে বলতে দু-জনে তাঁদের চেয়ার টেনে এনে দীপঙ্করের টেবিলে বসে পড়লেন। পরিচয়পর্ব শেষ হলে জানা গেল যে রিমলেস চশমার নাম প্রফেসর জয়নারায়ণ বসাক, মৌলানা আব্দুল মজিদ কলেজে ইতিহাস পড়ান আর অন্যজনের নাম ড. রমারঞ্জন সিংহ। ওঁরা দীর্ঘদিনের বন্ধু, সবসময় একসঙ্গে বেড়াতে বের হন।

প্রফেসর বসাক বললেন— তুমি যে রহস্যের লিস্ট দিলে তাতে আমরা আরও গোটা দুয়েক আইটেম যোগ করতে চাই। হয়তো তাতে তোমার অ্যানালিসিস-এ সুবিধে হবে।

সাগর সহাস্যে বলল— কী আইটেম?

—তুমি তো চার নম্বরে শেষ করেছিলে, এবার পাঁচ নম্বর। হোটেলের খাতায় চিন্ময় গুহর যে ঠিকানা দেওয়া আছে, সেটা ভুয়ো। আমি খাস শ্যামবাজারের লোক, আমাদের

ওখানে বন কেটে বসত বলতে পারো। শ্যামবাজার-বাগবাজারের প্রতিটি গলিঘুঁচি আমার নখদর্পণে। আমি হলফ করে বলতে পারি যে শ্যামবাজারে মুনীন্দ্র মিত্র লেন বলে কোনো রাস্তা নেই, কস্মিনকালেও ছিল না। তারপর ছ-নম্বর। আমার এই বন্ধুটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছর যাবৎ অর্থনীতি পড়াচ্ছে। ও বলছে যে ওখানে চিন্ময় গুহ নামের কোনো অধ্যাপক নেই। চারবছর আগে যদি থেকে থাকেন তো সেটা আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে জানা দরকার যে, এতবছর বাদে সেই পরিচয় জাহির করবার কারণটা কী?

সাগর জিগ্যেস করল— আপনারা কবে এখানে এসেছেন? ওই লোকটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কি?

—আমরা পরশু রাত্রে এসেছি, সস্ত্রীক। কাল ব্রেকফাস্ট করবার জন্য ডাইনিং রুমে যখন যাই, তখন লোকটা আমাদের পাশের টেবিলেই বসেছিল। লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান লোক, তামাটে গায়ের রং, উশকো-খুশকো কাঁচা-পাকা চুল, পরনে জিনস আর গলাবন্ধ রংচঙে সোয়েটার। বয়েস তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে। দেখে বাঙালি বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু যেচে আলাপ করতে যাইনি। আমার গিন্নির আবার কৌতূহল বড্ড বেশি। তিনি নাকি দেখেছেন যে লোকটা খেতে খেতে একটা ম্যাপ দেখছিল। তারপরে আর তাঁকে দেখিনি।

—আচ্ছা, আপনি তো ইতিহাস পড়ান। আপনার কি মনে হয় যে এখানে কোনো প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ থাকা সম্ভব?

—হ্যাঁ, সেটা খুব সম্ভব। চীন থেকে ফা-হিয়েন বা হিউ-এন-সাঙের মতো যেসব পরিব্রাজক অতীতে ভারতবর্ষে আসতেন বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রগুলো দর্শন করতে, তাঁদের একাধিক পথের মধ্যে একটির ওপরে এই ভোগরাই গ্রামটি পড়ে। যাঁরা আফগানিস্তান বা গান্ধার থেকে খাইবার পাস পেরিয়ে পুরুষপুর বা পেশোয়ার হয়ে কুশীনগর, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি দেখে গৌড় বা কর্ণসুবর্ণ হয়ে তাম্রলিপ্তে গিয়ে দেশের জাহাজ ধরতেন, তাঁরা চাইলে এখানে বিশ্রাম নিতে পারতেন। এ-অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রাচীন ভাষায় ভোগরাই শব্দের মানে— খুব ভালো সরাইখানা। অবশ্য সেই রাস্তাটা আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে।



অধ্যাপক বসাকের কথা শুনতে শুনতে সাগর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেটা অধ্যাপক লক্ষ করলেন। বললেন— কী হল? আমার কথায় চিন্তার খোরাক পেলে বলে মনে হচ্ছে যেন?

—না, না, ও কিছু নয়। আপনাদেরও তো দেখে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল। সেটা কি ঠিক?

—হ্যাঁ, আজ সকালে সব খবর শুনে আমরা চিন্তা করছিলুম যে পুলিশের কাছে গিয়ে সবকথা বলা আমাদের উচিত হবে কি না। আবার এও ভাবছিলুম যে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসে গায়ে পড়ে পুলিশ ছুঁয়ে যদি ছত্রিশ-ঘা হয়, তখন এই বিদেশ-বিভুঁয়ে সেটা সামলাতে পারব তো?

দীপঙ্কর বললেন— না, না, আপনারা কেন যাবেন? আপনারা যা বললেন, সে তো পুলিশ তদন্ত শুরু করলেই বেরিয়ে আসবে। খামোকা ওদের পরিশ্রম লাঘব করতে যাবেন কোন দুঃখে? তা ছাড়া সত্যিই তো, এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আপনাদের হাঁড়ির হাল হয়ে যেতে পারে। আর লোকটা যখন বাঘের পেটেই গেছে তখন সে পাজিই হোক বা জালই হোক, পুলিশ আর তা নিয়ে মাথা খামাবে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা শুনে দুই বন্ধু নিশ্চিন্ত হলেন বলে মনে হল। ড. সিংহ বললেন— আপনি সাংবাদিক, এসব ব্যাপার আপনিই ভালো জানবেন। এবার আমরা তাহলে উঠি? আমাদের গৃহিনীরা গেছেন মাউন্ট ভিউ হোটেলে শাড়ির একজিবিশন দেখতে। এখন সেখান থেকে তাঁদের উপড়ে বের করে আনা বিশেষ প্রয়োজন।

অধ্যাপকদের প্রস্থানের পর দীপঙ্কর বললেন— তুই বুঝেছিলি যে ওঁরা বাঙালি, আর এ-ব্যাপারে ওঁদের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে, তাই জোরে জোরে কথা বলছিলি, তাই না?

সাগর বলল— ঠিক ধরেছ।

—আমি যেটা বুঝতে পারছি না, তা হল যে ওই লোকটা যদি বর্ধমান ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত নাই হয় তাহলে সে ড. সিংহকে চিনল কী করে আর কেটে পড়তেই বা গেল কেন?

—সেটা দু-ভাবে হতে পারে। এক, লোকটা এখানে কোনো একজন আসতে পারে জেনে রোজ হোটেলের রেজিস্টার চেক করতে গিয়ে ড. সিংহের পরিচয় পায় অথবা দুই, রিসেপশনিস্ট তাঁকে ডেকে বলে যে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে আর একজন অধ্যাপক এখানে এসেছেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই আমার ঠিক বলে মনে হয়।

শ্রীলতা বলল— আহা রে, পালাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিল লোকটা।

সাগর বলল— তোর দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার ধারণা যে লোকটা মরেনি, এখানেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।

—তা কী করে হয়, দাদা? ওর ছেঁড়াখোঁড়া শার্টটাই কি প্রমাণ করে না যে, লোকটা আর বেঁচে নেই?

—না, বরং তার উলটোটাই প্রমাণ করে।

অতসী বললেন— কতবার বারণ করেছি যে ছেলেটাকে এইসব খুনখারাবির মধ্যে যেতে দিও না, তা শুনবে কী কেউ আমার কথা? সুপ্ত প্রতিভা জাগাতে গিয়ে যে লেখাপড়া লুপ্ত হতে বসেছে সে-কথা কী কেউ ভাবে? সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, সেটা কি কারুর মনে আছে?

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললেন— আবার কী হল? ছুটিতে বেড়াতে এসে লেখাপড়ার কথা উঠছে কেন? পরীক্ষা-টরীক্ষা কলকাতায় ফিরে। এখন একটু রিল্যাক্স করুক না।

—রিল্যাক্স? এই রিল্যাক্স করার ছিরি? সকাল থেকে চোখ কপালে তুলে বসে আছে ছেলেটা, কথা বললে সাড়া দেয় না। হাঁ করে বসে রহস্যভেদ করছেন। দেখলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

শ্রীলতা বলল— আঃ, মা। দেখছ দাদা চিন্তা করছে। এইসময় চ্যাঁচামেচি করো না তো।

—তুই আর পোঁ ধরিসনি বাপু। দাদা চিন্তা করছে, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে তাড়িয়ে হন্যে হয়ে গেল।

দীপঙ্কর বললেন— ঠিক, ঠিক। তা হ্যাঁরে, সাগর, অনেক তো চিন্তা করলি। আর কত করবি?

সাগর বলল— দ্যাখো বাবা, সকাল বেলায় প্রফেসর বসাক আমাদের একটা মোক্ষম ক্লু দিয়েছেন, কিন্তু সেটা যে কী তা কিছুতেই ধরতে পারছি না।

শ্রীলতা একটা চকোলেটের বার এগিয়ে দিয়ে বলল— এটা খা। খেতে-খেতেই দেখবি বুদ্ধিটা ফট করে খুলে যাবে।

সাগর চকোলেট নিয়ে খেতে শুরু করল। একটু বাদেই লাফ দিয়ে বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে উঠল— পুরুষপুর! পেয়ে গেছি। বুঝতে পারছিলুম যে পুরুষপুরটা খুব ইম্পর্টান্ট, কিন্তু কীভাবে সেটা ধরতে পারছিলুম না।

শ্রীলতা একচক্কর নেচে নিয়ে বলল— এখন ধরতে পেরেছিস তো? পারতেই হবে। বলেছিলুম না যে চকোলেট খেলেই বুদ্ধিটা ফট করে খুলে যাবে?

অতসী বললেন— তোদের এই পাগলামি বন্ধ করবি? এত আদিখ্যেতা আর সহ্য হচ্ছে না।

সাগর বলল— বাবা, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। কয়েকটা জায়গায় একটু ফাঁক রয়ে গেছে। সেগুলো ভরাট না-করা পর্যন্ত কিছু বলা বোধ হয় উচিত হবে না।

দীপঙ্কর বলল— ফাঁকগুলো ভরাট করার জন্য কী করা দরকার?

—চিন্ময় গুহের শার্টটা একবার দেখা দরকার।

—বেশ তো, চল এখন একবার থানায় গিয়ে কুরেশির সঙ্গে কথা বলে দেখি। আমার পরিচয় পেলে দেখতে দিলেও দিতে পারে।

অতসী আর্তনাদ করে উঠলেন— এই ভর সন্ধে বেলায় তোমরা থানায় যাবে?

দীপঙ্কর মাথা চুলকিয়ে বললেন— যাই-না। কাছেই তো, হাঁটাপথ। যাব আর আসব।

ওসি সুলেমান কুরেশি থানায় ছিলেন না, তাঁকে কোয়ার্টাস থেকে ডেকে আনা হল। বেশ খাতির করেই দীপঙ্কর আর তাঁর ছেলেমেয়েদের বসালেন। দীপঙ্করের কথা শুনে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে বললেন— এই ছেলেটি সখের ডিটেকটিভ? খুব ক্রাইমের ওপরে বই পড়ে বুঝি? আমি ওকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কিন্তু এই কেসে রহস্য তো তেমন কিছু নেই। ওই চিন্ময় গুহ নামের লোকটা একটা ফ্রড। এখানে সে যে কী করছিল তা আমি জানি না। তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে যে সেটা জানব তারও উপায় নেই, কারণ তার ঘর সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে, চেনা লোকের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে, সেটা জানতে পেরেছি। ভালোই হয়েছে, আপদ চুকেছে।

দীপঙ্কর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সাগর বাধা দিয়ে বলল— সে তো বটেই। তবে আপনি যদি আমার দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দেন তো খুব ভালো হয়।

—নিশ্চয়ই দেব। বলো, কী জানতে চাও?

—আপনি কী করে জানলেন যে লোকটা ফ্রড? আর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে পালিয়েছে?

—আজ দুপুরে কলকাতায় মেসেজ পাঠাই চিন্ময় গুহর বাড়িতে তার মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার জন্য। একটু পরেই খবর পাই যে ঠিকানাটা ভুল। তখন বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে ফোন করি। সেখান থেকে জানা গেল যে ওই নামে কোনো অধ্যাপক ওখানে নেই। তখন হোটেলে ফোন করে জানতে পারি যে ওখানে ওই ইউনিভার্সিটিরই একজন অধ্যাপক আছেন আর রিসেপশনিস্ট মহিলা গুহকে সেই খবরটা দেয়। এরপর দুয়ে-দুয়ে চার।

—মি. রায়ের কাছে জানা গেল যে বাসরাস্তার ধারে লেবার-কলোনির পিছনে জঙ্গলের ভেতরে চিন্ময় গুহর রক্তমাখা শার্ট আর ব্যাগ পাওয়া গেছে। আপনি যদি অনুমতি করেন তো সেগুলো আমি একবার দেখতুম।

—সেগুলো তো এখানে নেই। এই কিছুক্ষণ আগে আমার লোক সেগুলো নিয়ে দিল্লি চলে গেল ফোরেনসিক পরীক্ষা করানোর জন্য। ফোরেন্সিক পরীক্ষা কাকে বলে জানো তো?

সাগর সহাস্যে বলল— হ্যাঁ, জানি। আচ্ছা, কোনো হিংস্র জন্তু গুহসাহেবকে আক্রমণ করেছিল বলে আপনার মনে হয়? ভালুকদের তো এখন ঘুমোনোর সময়। আর, হতে পারে বাঘ। এখানে যে বাস-রাস্তা দিয়ে সারারাত বড়ো বড়ো মালবোঝাই ট্রাক, ট্র্যাক্টর, ক্রেন বা অন্যান্য কন্সট্রাকশনের মেশিনপত্র প্রচণ্ড শব্দ করে চলাচল করছে, তার ত্রিসীমানায় কোনো বাঘ কি আসতে পারে কখনো?

কুরেশি ব্যাজার হয়ে বললেন— তা আমি কী করে বলব? বাঘ-ভাল্লুক তো আর আমার সঙ্গে পরামর্শ করে জঙ্গলে ঘুরতে বেরোয় না। তুমি কী জানতে চাইছ সেটা পরিষ্কার করে জিগ্যেস করো তো।

—তাই করব। তবে, তার যে উত্তর আপনি দেবেন সেটা শুধু আমাদের এই ক-জনের মধ্যেই থাকবে। আমার বাবা সাংবাদিক হলেও তিনি তা প্রকাশ করবেন না কারণ তা করলে আমাদেরই দেশের ক্ষতি হবে। আর, কেবলমাত্র আমার কৌতূহল মেটানোর জন্য যদি আপনি জবাব না দেন, তাহলেও কোনো অসুবিধে নেই। আমরা তো আর কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারব যে আমার সন্দেহটা ঠিক না ভুল।

দীপঙ্কর ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন— ব্যাপারটা কী বল তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কুরেশি দীপঙ্করকে পাত্তা না-দিয়ে একটু রূঢ়ভাবেই সাগরকে বললেন— বক্তৃতা না-দিয়ে আসল কথাটা কী তা বলবে?

—হ্যাঁ। আমার ধারণা গুহসাহেব বর্ধমান থেকে আসেননি, এসেছেন দিল্লি থেকে। তিনি এখন খুব সম্ভবত আপনার বাড়িতেই আছেন। আপনারা দিল্লি থেকে ফোর্স আসবার অপেক্ষা করছেন। এলেই, রেড শুরু করবেন। আমার অনুমানটা কি সঠিক?

সাগরের কথা শুনতে শুনতে কুরেশি এমন মুখব্যাদান করলেন যে তাঁর চোয়ালটা প্রায় টেবিলে ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে কাষ্ঠ হেসে বললেন — তোমার এহেন অনুমানের কারণটা জানতে পারি?

—কারণ অনেকগুলো। তারা এইরকম। প্রথম, একজন প্রফেসর, তাঁর যতই ব্যক্তিগত টাকাপয়সা থাক না-কেন, তাঁর রিসার্চের জন্য একটা দামি ফোরস্টার হোটেলে এসে বার বার উঠবেন না। তিনি যা দিয়ে রিসার্চ করছেন বলে বলেছেন, সেটার থেকে যদি প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকত, তাহলে হয়তো এটা মেনে নেওয়া যেতে পারত। একটা বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার সেরকম কোনো ব্যাপার নয়।

—তা কেন? ওই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোনো গুপ্তধন তো থাকতে পারে, তাই না?

—হয়তো পারে। তবে, সেটা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকবার জায়গা না-হয়ে কোনো রাজপ্রাসাদ-টাসাদ হলে সেই সম্ভাবনাটা প্রবলতর হত। এখানে সেরকম কোনো রাজপ্রাসাদ কস্মিনকালেও ছিল বলে ইতিহাসে লেখে না। এর থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে বৌদ্ধবিহার বাজে কথা, গুহসাহেব এখানকার জঙ্গলে অন্য কিছু খুঁজছিলেন আর থাকবার জন্য এই হোটেলটা বেছে নিয়েছিলেন। তার অন্যতম কারণ এখানে যাঁরা এসে ওঠেন তাঁরা কেউ অন্য কারুর ব্যাপারে নাক গলান না। এমনকী বাঙালিরাও, এই যে দাদা আপনিও বাঙালি আমিও বাঙালি, বলে এ ওর ঘাড়ে পড়েন না। আর এটা হতে পারে যে, এই হোটেলটাও তাঁর নজরদারির লিস্টের মধ্যে ছিল। কেন সেটা পরে বলছি। এবার দ্বিতীয় কারণ। ভদ্রলোক তো এখানে ধরা পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পালালেন। কিন্তু, বন্যজন্তুর হাতে মারা যেতে গেলেন কেন?

—এটা কী একটা কথা হল, ডিটেকটিভ সাহেব? উনি কি বন্যজন্তু ডেকে এনে মারা গেছেন?

—অনেকটা তাই। ছেঁড়া শার্টের গল্পটা একটু কাঁচা হয়ে গেছে। এই শীতে উনি কি শার্ট গায়ে জঙ্গলে ঘুরছিলেন? প্রফেসর বসাকের কথায় জানা গেল সে-সকালে তাঁর পরনে ছিল মোটা রংচঙে সোয়েটার। জঙ্গলে রাত্রি বেলা তার ওপরে নিশ্চয়ই কোট, ওভারকোট ইত্যাদি ছিল। সেগুলো গেল কোথায়? পাওয়া গেল শুধু শার্টটা? তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ভদ্রলোক হোটেল থেকে পালালেন বটে কিন্তু ভোগরাইতেই থেকে গেলেন এবং, সেটা পুলিশের মদতে আর পুলিশকে মদত দেওয়ার জন্য।

—পুলিশকে মদত দেওয়ার জন্য? তা কী করে হয়?

—আপনারা গুহসাহেবের শার্ট আর ব্যাগ পেয়েছেন রাত্রি বেলা আর আজকেই ভোর না-হতে হোটেলের বাসিন্দারা কোথাও বেরিয়ে যাওয়া আগেই একগাদা লোকজন সঙ্গে নিয়ে হইচই করতে করতে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এই অস্বাভাবিক ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে আপনার বা পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল হোটেলের সবাইকে জানানো যে গুহসাহেবের মৃত্যু হয়েছে এবং সে-ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত। কিন্তু একথাটা খেয়াল করেননি যে, গুহসাহেব যে আপনাদেরই লোক সেটাও এর থেকে বোঝা যেতে পারে। আরও একটা কথা। যে লোকটির ওপরে গুহসাহেব নজর রাখছিলেন, তাকেও আপনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোনো একজন বিশেষ লোককে আপনারা সন্দেহ করছেন না। করলে, হোটেলসুদ্ধু লোকের ঘুম ভাঙিয়ে হইচই করার দরকার পড়ত না।

—লোকটি কে তাও তুমি বুঝতে পেরেছ না কি?

—বোধ হয় পেরেছি। গুহসাহেবের বার বার এই হোটেলে ওঠা থেকে মনে হয় তিনি ম্যানেজার ভবানীপ্রসাদ রায়। তিনিই একমাত্র কন্সট্যান্ট ফ্যাক্টর।

বিচলিত গলায় কুরেশি বললেন— এসব একদম বাজে কথা। বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করবে না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

মৃদু হেসে সাগর বলল— আপনার সাবধান করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি তো প্রথমেই বলেছি যে আমাদের আলোচনার কথা আর কেউ জানতে পারবে না, আমার বাবা সাংবাদিক হলেও নয়। সে যাকগে। তাহলে একটা কথা স্পষ্ট হল যে গুহসাহেব আপনাদেরই লোক। আর জাল ড. গুহের লুকিয়ে থাকার শ্রেষ্ঠ জায়গা পুলিশের কোয়ার্টাস ছাড়া আর কী হতে পারে?

গভীর ভ্রূকুটি করে কুরেশি বললেন— চিন্ময় গুহ কি খুঁজছিলেন জানো?

—খুব সম্ভবত, একটা রাস্তা, যেটা বহু শতাব্দী আগে লুপ্ত হয়ে গেছে বলে সকলের ধারণা। রাস্তাটা আফগানিস্তান, পাকিস্তান হয়ে হিমালয়ের ভেতর দিয়ে ভোগরাই ছুঁয়ে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে চলে গেছে নেপালে। প্রফেসর বসাক পুরুষপুর বা পেশোয়ারের নাম না করলে সেটা হয়তো আমার পক্ষে ধরাটা শক্ত হত। মনে হয়, স্মাগলাররা এই পথের সন্ধান জানতে পেরেছে আর অতীতের মতোই এই ভোগরাইকে তাদের একটি স্টেশনে পরিণত করেছে। আমার ধারণা এটা ড্রাগ পাচারের রাস্তা, কারণ এর একদিকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান আর অন্যদিকে নেপাল, বিহার, বাংলাদেশ, বর্মা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। আর রাস্তাটা ছাড়া গুহসাহেব খুঁজছিলেন এই চোরাচালান চক্রের পাণ্ডাদের।

—তারা কারা তাও জানো না কি?

—না, সেটা জানি না। তবে গুহসাহেব জানেন। আর, তাদের ধরবার জন্যই উনি বাঘ-ভাল্লুকের গল্প বানিয়ে এখানে থেকে গেছেন। নইলে, সোজা দিল্লি ফিরে যেতেন।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন— আদৌ গল্পটা বানাবার দরকার কী ছিল? স্রেফ গা-ঢাকা দিলেই তো পারতেন।

—আমার ধারণা, এই চক্রের পাণ্ডারা সন্দেহ করছে যে তাদের ওপরে কেউ নজর রাখছে। গুহসাহেবের জঙ্গলে ঘোরাঘুরি যে তাদের সন্দেহ বাড়াচ্ছে সেটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে। গুহসাহেবের মৃত্যুসংবাদের গল্পটা তাদের রিল্যাক্স করতে সাহায্য করবে।

কুরেশির ঘরের একপাশে একটা দরজার পরদা সরিয়ে ভেতরে এলেন একজন মধ্যবয়স্ক, উশকো-খুশকো চুল, স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক। বললেন— আমি ওপাশ থেকে সব শুনেছি। তোমার সব অনুমানই ঠিক, কেবল একটি ছাড়া। আমি দিল্লি থেকে আসিনি।

ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রবলবেগে চকোলেট খেতে খেতে বিজয়গর্বে ঘরে ঢুকলেন দীপঙ্কর। অতসীকে একটা চকোলেট দিয়ে বললেন— তোমার ছেলে একেবারে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়নি। তার কিছু প্রাপ্তিযোগও ঘটেছে। কী পেয়েছে দ্যাখো। একটা নোটবই আর একটা দামি কলম। দুটোর ওপরেই ছোটো ছোটো করে লেখা ‘ইন্টারপোল’।



গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে, মানে ১৯০২ কী ১৯০৩ সালে, আমার দাদামশায় জেলারের চাকরি নিয়ে আসামে গিয়েছিলেন। সে সময় আজকের মতো আসামের এত উন্নতি হয়নি। রাস্তাঘাট বেশি ছিল না। জঙ্গল খুব বেশি ছিল, এমনকী, ছোটো ছোটো শহরের চারদিকেও জঙ্গল ছিল। রেললাইন বেশি ছিল না, এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে হলে হয় ঘোড়ায় চড়ে যেতে হত নইলে গোরুর গাড়িতে।

এইসময় আমার দাদামশায়ের জীবনে অনেক অদ্ভুত আর রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল। অনেক মারাত্মক বিপদের মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত মানুষ ছিলেন, বিশ্বাস করতেন যে তাঁর উপাস্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে সেইসব বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, নইলে উদ্ধারের কোনো আশাই ছিল না। আমরা, মানে তাঁর নাতিরা, যখন দুষ্টুমি করতুম বা কোনো অন্যায় কাজ করতুম, তখন সেইসব গল্প বলে উনি আমাদের শোধরাবার চেষ্টা করতেন। আমরা হাঁ করে সেইসব গল্প শুনতুম, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য কতদূর সফল হত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের তো ভক্তিটক্তি ছিল না। আমরা সেই ঘটনাগুলোর অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা করতুম দাদামশায়কে ক্ষ্যাপানোর জন্য। খুব রাগী মানুষ ছিলেন, ক্ষেপেও যেতেন আমাদের মন্তব্যগুলো শুনে। তবে রাগটা বেশিক্ষণ থাকত না। নাতিদের সাতখুন মাপ হয়ে যেত।

চাকরির প্রথম দিকে একবার দাদামশায়কে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে এক শহর থেকে অন্য এক শহরে যাবার সময় এক ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়তে হয়েছিল। উনি যখন খেয়াঘাটে গিয়ে পৌঁছেছেন, তার একটু আগেই খেয়া ছেড়ে গেছে। ব্রহ্মপুত্র বিশাল নদী। খেয়া পারাপার করতে অনেক সময় লাগে। দাদামশাই আর কী করেন। ভাবলেন একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দেখি। খেয়াঘাটের চারদিকেই ঘন জঙ্গল। দিনের বেলা, বাঘ-ভালুকের ভয় তো নেই। কাজেই দাদামশাই অন্যমনস্কভাবে ঘুরছিলেন। এসে দাঁড়িয়েছেন একটা মস্ত বটগাছের নীচে। বটগাছটা ভরতি একগাদা বাঁদর কিচিরমিচির করছে। পাহাড়ি জায়গা, গাছটার সামনে ছিল একটা পাথরের সমতল চাতাল মতো। শুকনো পাতা মচমচিয়ে দাদামশাই যেই এসে চাতালটার পাশে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ অন্যপাশে ফোঁস করে ফণা তুলে খাড়া হয়ে উঠেছে এক শঙ্খচূড় সাপ। শঙ্খচূড় আমাদের দেশের সবচেয়ে

বিষধর সাপেদের মধ্যে অন্যতম আর এত বড়ো, যে খাড়া হয়ে উঠলে প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু হয়ে উঠতে পারে।

দাদামশাই দেখলেন সমূহ বিপদ। দৌড়ে পালাবেন তার উপায় নেই। শঙ্খচূড়া সাপের সঙ্গে দৌড়ে কখনোই পারা যাবে না। সামনের গাছে উঠে পড়বেন, সেও সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় হল সাপের চোখে চোখ রেখে একটুও না-নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তাহলে সাপ কামড়ায় না। ইতিমধ্যে যদি অন্য লোক এসে পড়ে তাহলে সাপটা চলে যেতে পারে। অতএব, দাদামশায় সেই নিষ্পলক নৃশংস দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে যথাসম্ভব নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কোনো লোক কিন্তু এল না। আর কতক্ষণই বা একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। দাদামশাই বেশ বুঝতে পারছেন যে তাঁর পা অল্প কাঁপতে শুরু করেছে, একটু বাদেই পড়ে যাবেন। এদিকে কিছু না-করতে পেরে সাপটাও ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, একটু নড়লেই সঙ্গেসঙ্গে ছোবলাবে তাঁকে। মনে মনে ভাবছেন, হে ভগবান, এইরকম ভয়ংকর মৃত্যু তোমার ভক্তের কপালে লিখে রেখেছিলে তুমি।

ঠিক এইসময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আগেই বলেছি, বটগাছটা ভরে ছিল একদঙ্গল বাঁদর। তারা এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। দাদামশাই যখন আর পারছেন না, পড়ে যাবার মতো অবস্থা, আর সাপটাও রেগে টং, সেইসময়, হঠাৎ একটা বাঁদর লাফ দিয়ে পড়ল দাদামশায়ের পায়ের কাছে পাথরের চাতালটার ওপরে আর পরমুহূর্তেই চোখের নিমেষে একলাফে উলটোদিকের গাছটার ওপরে উঠে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে চমকে গিয়ে সাপটা চাবুকের মতো প্রচণ্ড জোরে ছোবল মারল বাঁদরটা যেখানে পড়েছিল সেইখানে। কিন্তু, বাঁদরটা তো তখন আর সেখানে নেই। ফলে, সাপটার মুখটা এসে হাতুড়ির মতো আছড়ে পড়ল পাথরের ওপর আর তৎক্ষণাৎ তার মুখটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গেসঙ্গে সাপটা ধড়ফড় করে মরে গেল। দাদামশাই তখন কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ে তাঁর অদৃশ্য রক্ষাকর্তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন আর চোখের জলে প্রণাম করলেন তাঁর উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে।

গল্প শেষ করে দাদামশাই বলতেন, দেখলি তো। বিপদ যতই ভয়ংকর হোক না-কেন, ভক্ত— সে যতই না-কেন নগণ্য হোক, যদি সত্যিকার অন্তর দিয়ে তাঁকে ডাকে, তাহলে সেই ডাকে ভগবান ঠিক সাড়া দেন এবং ভক্তকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

আমরা বলতুম, তাই বলে বাঁদর! দাদু! তোমার প্রার্থনার জন্য তাঁকে কিনা শেষপর্যন্ত বাঁদর হতে হল?

শুনে দাদামশায় রেগেমেগে তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে তাঁর ছেলেরা যে উচ্ছন্নে গেছে সে বিষয়ে নালিশ করতেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো তাদের গল্প বলবেন না সে কোথাও বেশ জোর দিয়ে জানিয়ে দিতেন। সেই প্রতিজ্ঞাটা অবশ্য বেশিদিন টিকত না।

আর একবার দাদামশাই এক শহর থেকে অন্য এক শহরে বদলি হয়েছেন। ততদিনে তাঁর বিয়ে হয়েছে, সংসার বেড়েছে। দিদিমা, তিন মেয়ে আর নিতান্ত শিশু আমাদের মামাকে নিয়ে মালপত্র গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে রওনা দিয়েছেন। একটা গোরুর গাড়ি তো নয়, অনেকগুলো। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, ডাকাতের ভয় আছে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। সেই জন্য সে সময় দলবদ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এই দল যখন চলতে শুরু করত, তখন কতগুলো পূর্বনির্ধারিত জায়গা ছাড়া কোনোমতেই অন্য কোথাও দাঁড়াত না। তা, সে যদি কেউ ভয়ানক অসুস্থ বা মরণাপন্ন হয়ে পড়ে তাহলেও না। অনেকটা আজকের ট্রেনের মতো। তবে, ট্রেন যদি-বা চেন টেনে থামানো যায়, এক্ষেত্রে তাও সম্ভব ছিল না। দু-একজনের জন্য তো সকলকে বিপদে ফেলা যায় না।

যেতে যেতে বিকেল নাগাদ হঠাৎ আমার মামার শরীর বেশ খারাপ হয়ে পড়ল। এত খারাপ যে তখুনি একটু দুধ খাওয়ানো বিশেষ দরকার নইলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। অথচ সঙ্গে একফোঁটাও দুধ নেই। মামা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে দেখে দাদামশাই দিদিমাকে বললেন— আমাকে একটা পাত্র দাও, আমি পা চালিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি কোনো গ্রাম আছে কি না। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমার কোনো বিপদ হবে না। আর, হলে হবে। আমি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না।

দাদামশাই শ্লথগতি গোরুর গাড়ির কনভয় পেছনে ফেলে হনহন করে সামনে এগিয়ে গেলেন। যাচ্ছেন আর ভাবছেন, হে ভগবান, এতটুকু একটা শিশুকে কে এত কষ্ট দিচ্ছ। তার যন্ত্রণা যে চোখে দেখা যাচ্ছে না। ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ, কোথাও গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই, লোকজন তো নেই-ই। দাদামশায়ের সব আশা যখন বিলীয়মান, হঠাৎ একটা স্থানীয় লোক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, তার হাতে একটা পাত্র। লোকটি দাদামশায়কে বলল— দুধ নেবেন, দুধ লাগবে আপনার?

দাদামশাই তো হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগবে বইকি। দাও, আমার এই পাত্রটার মধ্যে ঢেলে দাও।

তাই করল লোকটি। তখন দাদামশায় পকেটে হাত দিয়ে দেখেন পয়সা আনতে ভুলে গেছেন তাড়াহুড়োয়। লোকটিকে বললেন, এই দ্যাখো, আমি তো টাকা আনতে ভুলে গেছি। তুমি আমার পেছনে পেছনে এসো। ওই সামনেই আমার গাড়ি আসছে। ওখানে গিয়েই আমি তোমাকে দাম দিয়ে দেব। বলে পাত্র হাতে হনহন করে উলটোদিকে হাঁটা লাগলেন। গাড়িতে পৌঁছে দিদিমার হাতে পাত্রটা দিয়ে টাকা নিয়ে পেছন ফিরে দেখেন, কেউ নেই।

দাদামশাই বলতেন— এখন তোরাই বল, কে আমাকে দুধ এনে দিয়েছিল? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ হতে পারে? ভক্তের করুণ প্রার্থনায় সাড়া না-দিয়ে পারেননি তিনি।

আমরা বলতুম— আর একজন হতে পারে দাদু। সে ব্যাটা দাগি চোর। জেল ভেঙে দুধ চুরি করে পালাচ্ছিল। ভেবেছিল, তোমাকে বিক্রি করে দু-পয়সা কামাবে। তুমি তো ইউনিফর্ম পরে ছিলে না, তাই প্রথমে তোমাকে চিনতে পারেনি। পরে দেখল, ও বাবা, এ যে জেলারসাহেব। একসময় না একসময় তো এঁর কাছে গিয়ে আবার পড়তেই হবে। এখন যদি পয়সা নিই তাহলে তখন কী আর রক্ষে থাকবে। মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেবেন। তার চেয়ে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শুনে দাদামশাই আমাদের লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন, আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতুম।

অন্য একবার, এক শহরের জেল থেকে আর এক শহরের জেলে একটা অত্যন্ত জরুরি খবর পরদিন ভোর বেলার মধ্যে পৌঁছে দেবার ভার পড়ল দাদামশায়ের ওপর। আদেশটা যখন এল, তখন বিকেল হয়ে গেছে। গাড়িঘোড়া জোগাড় করা তখন আর সম্ভব নয়। জঙ্গলের রাস্তা, বিপদ-আপদের কোনো শেষ নেই। একেবারে একা যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দাদামশাই তখন স্থির করলেন যে সারারাত রানার বা ডাকহরকরার সঙ্গে দৌড়বেন। তাঁর দুর্দান্ত স্বাস্থ্য ছিল, বয়েসও কম। কাজেই, ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু ছিল না। রানার সারারাত দৌড়য় যাতে সে পরদিন ভোররাত্রে অন্য শহরে পৌঁছে যেতে পারে। তার হাতে থাকে লণ্ঠন আর কাঁধে ঝুমঝুমি লাগানো বর্শায় বাঁধা চিঠির থলি। সে যখন দৌড়য়, তখন তার ঝমঝুমির ধাতব ঝুমঝুম আওয়াজ আর লণ্ঠনের আলো বন্য জন্তু-জানোয়ারদের সহজে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কারণ এই দুটো জিনিসই তারা অত্যন্ত অপছন্দ করে। তা ছাড়া, তার আত্মরক্ষার জন্য বর্শাটা তো আছেই। সুতরাং, তার সঙ্গে দৌড়নোর, সুবিধে হল, একজন সঙ্গী তো পাওয়া যাবেই তার ওপর বাঘ-ভাল্লুকেরও ভয়ও কম হবে।

সেইরকমই হল। রানারের সঙ্গে সারারাত দৌড়লেন দাদামশায়। তখন ভোর হয়ে আসছে, শহরটা আর বেশি দূরে নেই, তখন দেখা গেল যে রাস্তাটা সামনে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। শহরটা ছিল একটা নদীর অন্যপারে। মূল রাস্তাটা সেই নদীর ওপরে একটা ব্রিজ পেরিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে আর অন্য একটা সরু কাঁচা রাস্তা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিছুটা গিয়ে পড়েছে একটা খেয়াঘাটে।

দাদামশায় রানারকে বললেন— তুমি তো ব্রিজের রাস্তায় যাবে, তাতে শহরে পৌঁছুতে একটু দেরি হবে। আমি এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছি, খেয়াঘাটে গিয়ে মাঝিকে ঘুম থেকে তুলে নদী পেরিয়ে একবারে শহরের ভেতরে পৌঁছে যাব।



রানার বলল— ও রাস্তায় যাবেন না। শুনেছি এদিকে একটা মানুষখেকো বাঘ বেরিয়েছে। বিপদ হতে পারে।

দাদামশায় বললেন— দুত্তোর মানুষখেকো! ওই তো খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে। বাঘ যদি থাকেও, সে কিছু টের পাওয়ার আগেই একদৌড়ে পৌঁছে যাব। তুমি কিছু ভেব না, আসলে আমার হাতে সময় বড়ো কম। বলে, দাদামশায় কাঁচা রাস্তা দিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন।

খেয়াঘাটের কাছাকাছি আসতেই দাদামশায়ের নজরে পড়ল একটা ঝোপের পাশে একটা বিরাট বাঘ শুয়ে আছে। সে ঘুমোচ্ছিল। দাদামশায়ের পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে আর এক চোখ খুলে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

দাদামশায় দেখলেন বাঘটার সঙ্গে তাঁর যা দূরত্ব তাতে দৌড়ে পার পাওয়া যাবে না। গাছে উঠবেন, তারও উপায় নেই কারণ বেশি উপরে ওঠার আগেই সে লাফ দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলবে। একটিমাত্র উপায় আছে। তা হল, প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে খেয়াঘাটের মাঝির ঘরে ঢুকে পড়া। অতএব, চিৎকার করে মাঝিকে ডাকতে ডাকতে বাঘের সামনে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় লাগালেন দাদামশায়। বাঘটাও খচমচ করে উঠে তাঁকে তাড়া করল।

এমনি কপাল, দাদামশায় দেখলেন খেয়াঘাটের মাঝির ঘরে বিরাট তালা ঝুলছে। কোনো কারণে সে বোধ হয় ছুটি নিয়েছিল সেদিন। এদিকে বাঘটাও প্রায় এসে পড়েছে। উপায়ান্তর না-দেখে ভগবানের নাম করতে করতে নদীর বরফ-ঠান্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দাদামশাই আর সঙ্গেসঙ্গে জ্ঞান হারালেন। তবে অজ্ঞান হবার আগে দেখলেন যে বাঘটা তাঁর পেছনে পেছনে জলে নামছে।

যখন জ্ঞান ফিরল, দাদামশাই দেখলেন যে তিনি একটা গোয়ালঘরে শুয়ে আছেন আর কয়েকটি মেয়ে তাঁর শুশ্রূষা করছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম। সেদিন ছিল ছট পুজো। গোয়ালিনীরা ভোররাত্রে উঠে কলসি নিয়ে গিয়েছিল নদীর ঘাটে জল আনতে। সে যুগে তো প্লাস্টিক ছিল না, কলসিগুলো ছিল কাঁসার। সেই কলসিতে জল ভরতে গিয়ে তারা দেখে, এক বাবু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপ দিল নদীতে আর তার পেছনে একটা বাঘ। দেখেই তো তারা তাদের হাতের মোটা মোটা রুপোর বালা দিয়ে কলসির ওপর ঠংঠং করে মেরে মেরে মহা শোরগোল বাধিয়ে দিল। বাঘ আবার এই শব্দ সহ্য করতে পারে না। কাজেই সে জল থেকে উঠে ল্যাজ তুলে জঙ্গলের ভেতরে ভাগলবা। তখন গোয়ালিনীরা জ্ঞানহীন দাদামশায়কে তুলে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল।

গল্প শেষ করে দাদামশায় বলতেন, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁরই আদেশে বৃন্দাবনের গোপিনীরা গোয়ালিনী সেজে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন।

আমরা বলতুম— একদম বাজে কথা দাদু। সারারাত দৌড়ে নিশ্চয়ই তোমার খিদে আর ঘুম দুটোই খুব পেয়েছিল। অফিসে যাওয়ার আগে গোয়ালাদের বাড়ি দুধ আর মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। যখন ঘুম ভাঙল, দেখলে বেজায় দেরি হয়ে গেছে। তখন এই বাঘের গল্পটা বানালে।

আমাদের কথা শুনে দাদামশায় প্রথমে ভীষণ রেগে যেতেন তারপরেই হেসে ফেলতেন। বলতেন— নাঃ, তোদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

তাঁর এই কথাটা অতন্ত নিরঙ্কুশ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।



আমার ঠাকুরদাদার একটা অদ্ভুত আর বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল। তিনি কারোর মুখ হয়তো ভুলে যেতে পারতেন কিন্তু তার গলা কক্ষনো ভুলতেন না। কাজেই, কারোর মুখ দেখে তাকে চিনতে না পারলেও, গলা শুনে ঠিক চিনে ফেলতেন।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

একবার হাওড়া স্টেশনে নেমে মালপত্র নিয়ে বাইরে এসেছেন। অমনি একদল ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান এসে তাঁকে নিজের নিজের গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানাটানি শুরু করে দিল।

ঠাকুরদাদা বললেন— না, না, তোমাদের গাড়িতে যাব না। ওই তো ইসমাইল আছে, আমার চেনা লোক, আমি ওর গাড়িতে যাব।

বলতেই ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বয়স্ক গাড়োয়ান হাসিমুখে এগিয়ে এসে ঠাকুরদাদার বাক্স-বিছানা তুলে তার গাড়ির দিকে রওনা হল। যেতে যেতে বলল— আপনি আমাকে চেনেন, বাবু? কী করে চিনলেন? আমি তো আপনাকে মনে করতে পারছি না।

ঠাকুরদাদা বললেন— তুমি একসময়ে ফেনি স্টেশনে গাড়োয়ানি করতে না? আমি তখন বেশ কয়েক বার ওখানে গেছি। প্রত্যেকবারই আমি তোমার গাড়ি নিয়েছি।

শুনে ইসমাইলের হাত থেকে ঠাকুরদাদার বাক্সটা ঠক করে মাটিতে পড়েই গেল। লোকটি বলল— বলেন কী বাবু? সে তো আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা! ফেনির কথা আমারই কিছু মনে নেই। আর আপনি আমাকে এখনও মনে রেখেছেন?

ঠাকুরদাদা বললেন— তোমাকে কি আর মনে রেখেছি? তোমার গলার স্বরটা শুধু মনে আছে।

এই ক্ষমতার জন্যে তাঁকে একবার ভীষণ বিপদে পড়তে হয়েছিল।

সেটা ১৯৩০ বা ওইরকম সময়ের কথা। আমার বাবা ঠাকুরদাদাকে নিয়ে এলাহাবাদে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মা আর দাদা। দাদার তখন বছর দুয়েক বয়েস হবে। উদ্দেশ্য ছিল হাওয়া বদল আর তীর্থ করা।

সে যুগে, আজকের মতো সর্বত্র এত হোটেল, টুরিস্ট লজ বা ইয়ুথ হস্টেলের ছড়াছড়ি তো ছিল না। কেউ বেড়াতে গেলে মাসখানের মতো সময় হাতে করে যেতেন, একটা আস্ত বাড়ি বা কয়েকটা ঘরভাড়া করা হত, সঙ্গে যেত বিছানাপত্র, চাল, ডাল, স্পিরিট স্টোভ, থালা-বাটি-গেলাস, গ্রামোফোন, গুটি কয়েক রেকর্ড, কিছু গল্পের বই, পানের বাটা, এমনকী বঁটি পর্যন্ত।

আমার বাবাও সেইরকমভাবে এলাহাবাদে একটা মহল্লার একটি একতলা ছোটো বাড়ি ভাড়া করে একমাসের ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে একটা বারান্দা ছিল। ঠাকুরদাদা রোজ ভোর বেলা আর সন্ধে বেলা সেখানে ইজিচেয়ার পেতে বসে সামনে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতেন। তাঁর ধবধবে সাদা চুল-দাড়ি দেখে পাড়ার লোকেরা ওই পথে যাওয়ার সময় তাঁকে নমস্কার করত, দু-একজন এক-আধটা কথাও বলত। তাঁর আর একটা কাজ ছিল সাধুসন্ন্যাসী ও ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়া। সেইজন্যে থলে ভরতি খুচরো পয়সা তাঁর কোলের ওপর রাখা থাকত।

দিনগুলো বেশ ভালোই কেটেছিল। গোলমাল বাঁধালেন এক সন্ন্যাসী।

সেদিনও সন্ধে বেলা যথারীতি ঠাকুরদাদা বারান্দায় বসে ছিলেন। হঠাৎ এক বিশালাকৃতি জটাজুটধারী সন্ন্যাসী একহাতে কমণ্ডুলু আর অন্যহাতে একটা লম্বা ত্রিশূল নিয়ে বারান্দার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বজ্রনির্ঘোষে হিন্দিতে বললেন— সন্ন্যাসীকে কিছু দান করা হোক।

ঠাকুরদাদা কিছুক্ষণ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন— তুমি সরোজিনীর জামাই না?

বলতেই, সাধুবাবা আঁতকে উঠলেন। প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। ত্রিশূলটা দিয়ে কোনোরকমে সামলে নিয়ে ঠাকুরদাদাকে ভালো করে দেখে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন— আরে, সেনকাকা, আপনি এখানে?

বলে, সাধুবাবা বারান্দায় উঠে এসে ঠাকুরদাদাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। বললেন— ইশ কত বছর বাদে দেখা হল, তা বিশ বছর তো হবেই। আপনাকে শেষ দেখেছি আমার শাশুড়ির শ্রাদ্ধে। আপনার চেহারাটা কিন্তু একই আছে, কেবল আপনার দাড়িগোঁফ একেবারে পেকে গেছে।

এরপর কিছু পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করবার পর ঠাকুরদাদা বললেন— তুমি না ফিলজফি অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করেছিলে? তারপরে এসব কী?

সন্ন্যাসী বললেন— কী আর বলব, সেনকাকা। বিএ পাশ করে কোথাও একটা চাকরি পেলাম না। ব্যাবসা করব, তার মূলধনই বা কোথায়? শেষপর্যন্ত, সপরিবারে না খেয়ে মরবার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন, একজনের পরামর্শে এখানে এসে এই ভেক নিয়েছি।

—তাতে কোনো লাভ হয়েছে?

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। এখন আমার বেশ ভালোই রোজগার হয়। মাসে মাসে বাড়িতে যে টাকা পাঠাই তাতে সংসার চলে যায়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে, বাড়িটার আধখানা পাকা

করে ফেলা গেছে, দুটো গোরুও কেনা হয়েছে। কী আর বলব, আপনাদের আশীর্বাদে এখন আর তেমন কষ্ট নেই।

শুনে ঠাকুরদাদা মহা খুশি হয়ে সন্ন্যাসীর মাথায় হাত রেখে বললেন— দীর্ঘায়ু হও, বাবা। আশীর্বাদ করি তোমার যেন লক্ষ্মী লাভ হয়।

তার পরদিন হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল।

ভোর না-হতেই দেখা গেল পাড়ার মহিলারা গঙ্গায় স্নান করে নতুন কাপড় পরে থালায় করে ফল-মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে ঠাকুরদাদার দিকেই আসছেন। তাঁরা বারান্দায় উঠে এসে ঠাকুরদাদার পায়ের কাছে থালাগুলো রেখে মেঝেতে বসে পড়ে তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। কয়েক জন আবার তাঁর গলায় গাঁদাফুলের মালাও পরিয়ে দিলেন।

ঠাকুরদাদা তো স্তম্ভিত। তিনি যতই বলেন যে তিনি দীর্ঘদিন অবসর নেওয়া সরকারি দপ্তরের কর্মচারী, তাঁর পক্ষে ধর্মোপদেশ দেওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার, কে শোনে কার কথা। পাড়াসুদ্ধ লোক দেখেছে যে এ তল্লাটের সবচেয়ে বড়ো সাধুমহারাজ তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন আর তিনি তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন। এর থেকে এ কথা বুঝতে কারোর আর বাকি নেই যে তিনি একজন ছদ্মবেশী মহাযোগী মহাপুরুষ। হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। তিনি অস্বীকার করলে কী হবে, তাঁর মতো মহাত্মার শ্রীমুখের উপদেশ না-শুনে তাঁরা কিছুতেই নড়বেন না। তাঁদের মতো পাপীতাপীকে তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে।

গোলমাল শুনে বাবা আর মা বাইরে বেরিয়ে এসে শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে, উপদেশ-টুপদেশ পরে হবে বলে, কোনোরকমে ঠাকুরদাদাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সকালটা তো কাটল। সন্ধে বেলা একেবারে তাণ্ডব লেগে গেল। দলে দলে লোক বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খোলকর্তাল বাজিয়ে তারস্বরে নেচে নেচে কীর্তন গাইতে শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে চলল মহাপুরুষের জয়ধ্বনি আর তাঁকে দর্শন দেওয়ার জন্য চিৎকার করে আহ্বান। কান পাতে কার সাধ্যি। গলিতে গাড়িঘোড়া বন্ধ হয়ে গেল। এইরকম চলল প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

খবর পেয়ে বাড়িওয়ালা এসে গিয়েছিলেন। তিনি ব্যাপার দেখে বললেন— বাঁচতে চান তো আজ রাত্রেই পালান। স্টেশনে গিয়ে যে ট্রেন পাবেন তাতেই উঠে পড়বেন, সে ট্রেন কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ যেখানেই যাক না কেন। আপনারা মালপত্র বেঁধে ফেলুন। রাত তিনটের সময়, আমি দুটো ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পেছনের গলিতে আসব। আমার লোকজন মাল গাড়িতে তুলে দেবে। টুঁ শব্দটি না-করে আপনারা চাদর মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসবেন। এভাবে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আজ যা হয়েছে, হয়েছে। কাল ব্যাপার আরও গুরুতর হবে। কেউ শুনবেই না যে আমাদের ওই সাধুটি আপনার মামাতো ভাই-এর জামাই। ভাববে, আপনি ওদের ঠেকানোর জন্য ভাঁওতা দিচ্ছেন। বরং, কাল সকালে আমি সবাইকে বলে দেব যে যোগীমহারাজ যোগবলে আকাশপথে হিমালয়ে ফিরে গেছেন। তাহলে, সবাই সন্তুষ্ট হবে।

বাবার সেবারের ছুটি এইভাবেই শেষ হয়েছিল।



১৯২৪ সালে আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি পাশ করে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকরি নিয়ে আসেন পূর্ব বাংলা থেকে। সে সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার ছিলেন রাজশেখর বসু, যিনি বাঙালি পাঠকের কাছে 'পরশুরাম' নামে পরিচিত।

এই বেঙ্গল কেমিক্যালের চাকরি সূত্রে আমার বাবা অনেক বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কাছে এইসব বড়ো মাপের মানুষদের যে সব গল্প শুনেছি, তার কয়েকটা এখানে বলছি। হয়তো এসব গল্প কারুর কাজে লেগে যেতে পারে।

রাজশেখর বসু

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের শেষ কয়েক জন প্রতিভূর একজন ছিলেন রাজশেখর বসু। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধিটা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের বড়ো। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি বা সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। একদিকে তিনি যেমন লিখেছেন হাসির গল্প, অন্যদিকে তেমনি অনুবাদ করেছেন *রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত* ইত্যাদি মূল সংস্কৃত থেকে। রচনা করেছেন বাংলা অভিধান *চলন্তিকা*। লিখেছেন অসাধারণ সব প্রবন্ধ। বাংলা ভাষাকে দিয়েছেন নতুন নতুন প্রতিশব্দ। আবার ইনিই ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের একজন সার্থক পরিচালক, ভারতবর্ষের বিপণন শিল্পের একজন পথিকৃৎ।

রাজশেখর বসুর একটা বড়ো জিনিস ছিল— সময় জ্ঞান, যা বাঙালিদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। শুনেছি, উনি যখন বকুলবাগানে থাকতেন, তখন ওঁর গতিবিধি দেখে পাড়ার লোক ঘড়ি মেলাত। সেইসঙ্গে ছিল পরিমিতি বোধ। উনি যে গল্প বা প্রবন্ধ লিখতেন, তার শেষে কম্পোজিটারকে বিশদভাবে নির্দেশ দিতেন যাতে তার গল্পটা কম্পোজ করতে এতটুকু অসুবিধে না-হয়।

একবার রাজশেখর বসু নিজের আবিষ্কৃত ফর্মূলায় একটি বেগুনি রঙের কালি তৈরি করেছিলেন। সেই কালি দিয়ে অনেকগুলো চেক সই করেছিলেন। সব কটা চেক ফেরত এল। রাজশেখরবাবু তো স্তম্ভিত; আর রেগেও গেলেন তেমনি। সেই চেকগুলো নিয়ে তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ঘরে চলে গেলেন। ম্যানেজার চেকগুলো দেখে বললেন—

এই চেকগুলো ফেরত পাঠিয়েছি কারণ আমরা রাবার স্ট্যাম্পে সই গ্রাহ্য করিনা। রাজশেখরবাবু তখন তাঁর বেগনি রঙের কালি ভরা কলম বের করে ম্যানেজারের সামনে অনেকগুলো সই করলেন। ম্যানেজার সব দেখে বললেন— আমার কী দোষ? বেগুনি রঙের কালি আর সব কটা সই যদি অবিকল একরকমের হয়, তাহলে সেগুলো রাবার স্ট্যাম্প ভাববো না তো কী করব?

অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন রাজশেখর বসু। নিজে হাসির গল্প লিখতেন কিন্তু তাঁকে কেউ বড়ো একটা হাসতে দেখেনি। তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারত না।

শান্তিনিকেতনে একবার বিরিঞ্চিবাবা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। নিমন্ত্রিত হয়ে রাজশেখরবাবু সেখানে গেছেন। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি। ভীষণ মজার নাটক। সবাই খুব হাসছেন। নাটক যখন শেষ হল, তখন দর্শকদের একজন ইন্দিরাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন— নাটক কেমন দেখলেন?

ইন্দিরাদেবী বললেন— নাটক তো আমি দেখিনি।

প্রশ্নকর্তা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন— নাটক দেখেননি? সে কী কথা?

ইন্দিরাদেবী বললেন— না। আমি আগাগোড়া তাকিয়ে ছিলুম রাজশেখরবাবুর মুখের দিকে। কী অদ্ভুত মানুষ। যেখানে সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে তাঁর মুখে একটা রেখারও পরিবর্তন নেই!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সময়জ্ঞান আর নিয়মানুবর্তীতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অনমনীয়। আমার বাবাকে দেখেছি; তাঁর কাছে পাঁচটা বত্রিশ ছিল ঠিক পাঁচটা বত্রিশ-ই। তার এক মিনিট এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না। শুনেছি, এই স্বভাবটি তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

একবার ভারতবর্ষ তখন অবিভক্ত-ভারতীয় শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণে আচার্য গিয়েছিলেন লাহোরে একটা কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে। সঙ্গে করে আমার বাবাকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আমন্ত্রকদের মধ্যে মস্ত সব নাম-লালাশ্রীরাম, কস্তুরভাই লালভাই ইত্যাদি। কথা ছিল কনফারেন্স পাঁচটায় শুরু হবে এবং গাড়ি আসবে সাড়ে চারটের সময় আচার্যকে হোটেল থেকে নিয়ে যাবার জন্য।

আচার্য বাবাকে বললেন— তুই হোটেলেই থাকবি। কোথাও যাবি না। কনফারেন্স ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না। আমি সাড়ে ছ-টার মধ্যে ফিরে আসব। তারপর আমরা সিন্দুনদীর ধারে বেড়াতে যাব। সাড়ে চারটে বেজে গেল কিন্তু গাড়ি এল না।

অত্যন্ত উদবিগ্ন হয়ে আচার্য বললেন— আমার মনে হয় গাড়িটার নিশ্চয়ই কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে। এদিকে কনফারেন্সে সবাই বসে থাকবেন, তাঁদের সময় নষ্ট হবে। আমি বরং একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে চলে যাচ্ছি। যদি গাড়ি আসে তুই সেটা ফেরত পাঠিয়ে দিস। বলে আচার্য সাদা কালো চৌখুপী খদ্দরের গলাবন্ধ কোট আর ধুতি পরে চলে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলেন। খুশি খুশি মুখ। বাবাকে বললেন— দারুণ ভালো চা খাওয়াল জানিস। আর তার সঙ্গে ভারি চমৎকার চানাচুর। নে এবার চল। আমরা সিন্ধুনদীর ধারে বেড়াতে যাব।

দু-জনে হোটেল থেকে বেরিয়েছেন, দেখেন একের পর এক গাড়ি এসে হোটেলের দরজায় দাঁড়াচ্ছে। আর তাদের ভেতর থেকে নামছেন মস্ত বড়ো শিল্পপতিরা।

আচার্যকে দেখে তাঁরা বললেন— আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল, এবার তাহলে চলুন।

আচার্য মাথা নেড়ে বললেন— উঁহু। আমি তো আর যাব না। আপনারা আমাকে পাঁচটায় সময় দিয়েছিলেন। আমি ঠিক পাঁচটার সময় আপনাদের কনফারেন্স হলে পৌঁছেছি, সেখানে চা আর চানাচুর খেয়েছি। আমার কর্তব্য শেষ। দ্বিতীয় বার আমি আর ওখানে যাব না। আমি এই ছেলেটিকে কথা দিয়েছি যে এখন আমরা সিন্ধুনদীর ধারে বেড়াতে যাব, সে কথার নড়চড় হবে না।

শুনে সবাই স্তম্ভিত। অনেক কাকুতিমিনতি করেও বৃদ্ধ আচার্যকে টলানো গেল না। বাবাকে নিয়ে উনি বেড়াতে চলে গেলেন।

বাবা আচার্যকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন— আপনি চা আর চানাচুর পেলেন কোথায়?

আচার্য যা বলেছিলেন সেটা এইরকম—

উনি ঠিক পাঁচটার সময় কনফারেন্সের জায়গায় পৌঁছেছিলেন। গিয়ে দেখেন, সেখানে তখন কেউ আসেনি। এমনকী কর্মকর্তারাও অনুপস্থিত। কেবল কয়েক জন বাবুর্চি বসে চা বানাচ্ছে। আচার্য গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর খদ্দরের কোট, ধুতি, উশকোখুশকো চুল আর পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দেখে তারা মনে করল উনি ওদেরই কেউ হবেন। তারা তাঁকে চা আর চানাচুর খাওয়াল। আচার্যও সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চলে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজশেখরবাবু শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। সঙ্গে বাবা। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ দু-জনকে পরদিন দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন।

পরদিন বেলা এগারোটার সময় রাজশেখরবাবু বাবাকে বললেন— চলুন। রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া যাক।

বাবা আশ্চর্য হয়ে বললেন— সেকী? এখন তো সবে এগারোটা। এই সময় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়াটা কি উচিত হবে?

রাজশেখর বললেন— চলুন-ই না। গেলেই দেখতে পাবেন কেন এখন যেতে বলছি।

সেইরকমই হল। দু-জনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু লিখছিলেন। দু-জনকে দেখে চমকে উঠলেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট না-হয়ে বরং সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। ওঁদের বসতে বলে অল্প সময়ের জন্য বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। তারপর বেরিয়ে এসে গল্প শুরু করলেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর দুই শ্রোতা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতে শুনতে কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল তা টের পেলেন না। এইসময় ভেতর থেকে খাবার ডাক এল।

রাজশেখরবাবু আর বাবা খেতে বসলেন। রবীন্দ্রনাথ একটা মোড়া পেতে তাঁদের খাওয়া তদারকি করবার জন্য বসলেন ওঁদের সামনে। দেখা গেল অত্যন্ত সাধারণ খাওয়া। মানে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে অন্তত দু-একটা পদ একটু বিশেষ রকমের হয়ে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না।

খাবার দেখে রাজশেখরবাবুর মুখে বোধ হয় একটা অত্যন্ত ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গিয়েছিল। সেটা রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায়নি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন— তুমি হাসছ কেন? তুমি বুঝতে পেরেছ যে আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ করার কথা ভুলে গিয়েছিলুম, তাই না? তবে শোনো আমার দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ কী করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচণ্ড পণ্ডিত, আত্মভোলা দার্শনিক। থাকতেন শান্তিনিকেতনে 'নীচু বাংলা' বলে একটা বাড়িতে। একবার কলকাতা থেকে আসা কয়েক জন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপককে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা যথারীতি দুপুর বেলাতেই এলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের একটা অত্যন্ত দুরূহ দার্শনিক তথ্যের ওপর ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে বললেন— বেলা অনেক হল। এখন আমার স্নানাহারের সময়। তোমরা তাহলে এবার এসো।

গল্প শেষ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন— আমার তো তোমাদের দেখে অন্তত নিমন্ত্রণ করার কথাটা মনে পড়ল। আমার দাদার কিন্তু তাও পড়েনি।

সে যুগে শান্তিনিকেতনের দুপুরের খাওয়ার মতো কোনো দোকান ছিল না। সেই কলকাতার অধ্যাপকদের যে কী দশা হয়েছিল সে কথা আর রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেননি।



জাপানি জানার সুবিধে

আমার বড়ো মেয়ে মউ জাপানি ভাষা শিখেছিল। বেশ ভালোই রপ্ত করেছিল। সেই ভাষায় বক্তৃতা-টক্তৃতা দিয়ে অনেক প্রাইজও পেয়েছিল।

একবার সে কালীঘাটে মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছে এসপ্ল্যানেডে যাবে বলে। ট্রেনে ভীষণ ভিড়। তিলধারণের জায়গা নেই। ঠেলেঠুলে উঠতে হয়েছে। যে কম্পার্টমেন্টে উঠেছে, দেখে তার একপাশে বেশ একটা উত্তেজনা। এক জাপানি মাঝবয়সি ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে সবাইকে কী যেন বোঝাতে চাইছেন কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। ভদ্রলোকের বোধ হয় ধারণা যে তিনি ইংরিজি বলছেন, কিন্তু তা বোঝে কার সাধ্যি। তাঁর সহযাত্রীরা তাঁর সমস্যাটা বোঝবার জন্য তাঁর সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা এমনকী হিন্দিতেও কথা বলে যাচ্ছেন। সেসব আবার তাঁর একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না। এই নিয়ে বেশ একটা গোলমাল বেধে গেছে।

ব্যাপার দেখে মউ গলা বাড়িয়ে জাপানি ভদ্রলোককে বলল— কী হয়েছে আপনার, আমাকে একটু বলবেন?

নিজের মাতৃভাষা শোনামাত্র সেই ভদ্রলোক তো প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কী। মেলার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাছেলে তার মাকে দেখলে যেমন ব্যাকুল হয়ে দৌড়ে আসে, তেমনিভাবে ভিড়টিড় ঠেলে তিনি মউ-এর কাছে চলে এলেন। আসলে, তিনি জানতে চাইছিলেন যে, কোন স্টেশনে নামলে তাঁর পক্ষে ক্যামাক স্ট্রিট আর থিয়েটার রোডের মোড়ে যাওয়া সহজ হবে। সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তিনি মউকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁর স্টেশন না-আসা পর্যন্ত ওর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বললেন। বাকি যাত্রীরা হাঁ করে ওদের আলোচনা শুনলেন। কী বুঝলেন কে জানে।

জাপানি ভদ্রলোক নেমে যেতেই সবাই মউকে ঘিরে ধরলেন। একের পর এক প্রশ্ন, দিদি, আপনি কী ভাষায় কথা বললেন, এটা কি চীনে না জাপানি, আপনি চীনে ভাষা

কোত্থেকে শিখলেন, আপনি কি চীনে গিয়েছিলেন, কী বলছিলেন ওই লোকটি, উনি কি চিনদেশ থেকে আসছেন না ট্যাংরা থেকে... ইত্যাদি-ইত্যাদি।

মউ কোনো জবাব দেওয়ার আগেই, একজন যাত্রী সিটে বসে থাকা একটি অল্পবয়সি ছেলেকে লাগালেন এক ধমক— এই, তুই বসে আছিস যে বড়ো। দেখছিস না যে, দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছেন? উনি চীনেভাষা জানেন, তুই জানিস? ওঠ, ওঁকে বসতে দে।

অন্ধ্রপ্রদেশে গণ্ডগোল

কর্মসূত্রে আমাকে একবার অন্ধ্রপ্রদেশের আদৌনি বলে একটা ছোটো শহরে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার (সেলস) মি. পি কে ঘোষ। আমাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ওই শহরের নামজাদা ব্যবসায়ী মি. বসন্তকুমারের সঙ্গে দেখা করা। বসন্তকুমার শুধু আদৌনিতেই নয়, সারা অন্ধ্রপ্রদেশেই খ্যাতনামা।

খুব ভোরে হায়দরবাদ থেকে গাড়ি নিয়ে বেরুলে বেলা দশটা নাগাদ আদৌনি পৌঁছনো যায়। আমরা সেইরকমই রওনা হয়েছিলুম। হায়দরাবাদ শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তা গিয়েছে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে গ্রাম আর চাষের খেত। কখনো-বা দু-একটি ছোটো ছোটো শহর।

ঝিমঝিম করছে রোদ। মি. ঘোষ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি চুপচাপ বসে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করছি। আদৌনি আসতে যখন আর ঘণ্টাখানেক বাকি, হঠাৎ দেখি আমাদের উলটোদিক থেকে একটা সবুজ রঙের অ্যামবাসাডার গাড়ি প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসছে। আর, শুধু আসছে নয়, মাতালের মতো এঁকেবেঁকে আসছে।

আমি ড্রাইভারকে বললুম— গাড়িটার হাবভাব মোটেই ভালো ঠেকছে না। আপনি আপনার গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে দিন।

ড্রাইভার আমার কথায় সায় দিয়ে সেইরকমই করল। সবুজ গাড়িটা যখন কাছে এসে গেল তখন মনে হল যেন তার ভেতরে একটা ধস্তাধস্তি চলেছে আর তার পেছনের ডানদিকের জানলা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে একটা বন্দুকের নল। ব্যাপার দেখে আমি তাড়াতাড়ি গাড়িটার নম্বরটা টুকে নিলুম।

গাড়িটা আমাদের পাশ দিয়ে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল আর ঠিক তক্ষুনি ছ্যাক করে একটা শব্দ হল। সঙ্গেসঙ্গে দেখি আমাদের গাড়ির সামনের কাচে একটা ছোট্ট ফুটো। একমুহূর্ত পরেই পুরো কাচটা চড়চড় করে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

ব্যাপারটা কী হল? ড্রাইভার বলল যে, অন্য গাড়িটা থেকে কেউ গুলি চালিয়েছে। ঠিক যে আমাদের লক্ষ করেই চালিয়েছে তা বোধ হয় নয়। বন্দুকটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে হয়তো গুলি বেরিয়ে গেছে। আমাদের কপাল ভালো যে কারুর গায়ে লাগেনি সেটা। লাগলে আর দেখতে হত না।

কী আর করা যাবে? আমরা তো কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তার ধারে বড়ো বড়ো পাতার ঝোপ ছিল। সেই পাতা দিয়ে ভাঙা কাচ পরিষ্কার করা হল। তারপর যখন রওনা হতে যাচ্ছি, তখন দেখা গেল এক বিশালাকায় সর্দারজি একটা মান্ধাতার আমলের স্কুটারে চড়ে ঝড়ঝড় করতে করতে আসছেন উলটোদিক থেকে। আমরা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে থামালুম। সমস্ত ঘটনাটা তাঁকে বলা হল।

আমরা বললুম— ঘটনাটা যদি খেলাচ্ছলেও হয়ে থাকে, তবুও সেটা তো ভালো কথা নয়। এরকম নির্জন হাইওয়ের ওপরে কারুর যদি গায়ে গুলি লাগত, তবে তার ফল

অত্যন্ত খারাপ হতে পারত। সেই কারণে, সামনেই যে থানা পাবেন সেখানে এই ব্যাপারটা দয়া করে জানিয়ে দেবেন আর বলে দেবেন যে অমুক নম্বরের গাড়ি এই নম্বরের গাড়িতে গুলি চালিয়েছে। বলে একটা কাগজে নম্বরদুটো লিখে ওঁকে দিয়ে দিলুম।

সর্দারজি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। তারপর প্রবলভাবে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। আমরাও আদৌনির দিকে রওনা হলুম। সেখানে পৌঁছে গাড়িতে নতুন কাচ লাগিয়ে, বসন্তকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সেরে আমরা যখন হায়দরাবাদের দিকে রওনা হলুম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে।

সন্ধের মুখে আমরা একটা ছোটো শহরে এসে পৌঁছলুম। থানার কাছাকাছি আসতেই একদল পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে আমাদের গাড়ি আটকে দিল। ব্যাপারটা কী জানবার জন্য আমরা গাড়ি থেকে নামামাত্র একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে আমাদের আর আমাদের ড্রাইভারকে থানার ভেতরে নিয়ে গেলেন। বললেন— আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল।

আমাদের তো আক্কেল গুড়ুম। সে কী কথা? কী আমাদের অপরাধ?

থানার ইনচার্জ, একজন সাব-ইন্সপেক্টর তাঁর টেবিল অলংকৃত করে বসেছিলেন। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন— আপনারা এই নম্বরের গাড়িতে গুলি চালিয়েছেন। সেইজন্যে আপনাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। একজন সর্দারজি আমাদের এই অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছেন।

আমরা যতই বলি ব্যাপারটা ঠিক উলটো ঘটেছে, কে কার কথা শোনে। তার ওপরে, আমরা কী বলি তিনি ভালো বোঝেন না, আমাদের অবস্থাও তথৈবচ। আমরা কার্ড দেখাতে গেলুম, অফিসারটি বললেন— অমন কার্ড পাঁচ টাকায় এক ডজন ছাপানো যায়। আমরা বললুম— কলকাতা থেকে আসছি কাজের সূত্রে। শুনে তো তিনি হাতকড়া লাগান আর কী। বললেন— কলকাতা থেকে? তবে তো আপনারা নিশ্চয়ই নকশালপন্থী। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন। শিগগির বলুন কাকে এবং কোথায় সেইসব অস্ত্র দিয়ে এসেছেন।

আমি প্রবলভাবে আপত্তি জানালুম। এইরকম তর্কাতর্কির মধ্যে হঠাৎ মি. ঘোষ খেপে গেলেন। হাত-পা ছুড়ে বললেন— দুত্তোর অস্ত্রশস্ত্র। আমরা মি. বসন্তকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিশ্বাস না-হয়, তাঁকে ফোন করে দেখুন।

বসন্তকুমারের নাম শুনে অফিসারটির কানে জল ঢুকল। তিনি টেলিফোন তুলে নম্বর ডায়াল করলেন। কার সঙ্গে কী কথা বললেন তা তো বুঝতে পারলুম না। তবে আমাদের নাম বলতেই টেলিফোনের ভেতর থেকে কতগুলো রক্তজল করা ভয়ংকর গর্জন ভেসে এল। ফোন রেখে দিলেন। তারপর, হেঁ-হেঁ করে হেসে, আমাদের পিঠফিট চাপড়ে স্বয়ং থানা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদর গাড়িতে তুলে দিলেন।

সেবার আমাদের হায়দরাবাদ পৌঁছতে মাঝরাত্তির হয়ে গিয়েছিল।

বে-আইনি ব্যাপার

পাঞ্জাবে রোপাড় বলে একটা জায়গায় এক থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে তখন আমাদের কাজ চলছিল। আমাদের ক্যাম্পে ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট, স্টোরকিপার, মেকানিক সব মিলে প্রায় সাত-আটজন লোক। আমি সেবার কলকাতা থেকে সেখানে গিয়েছিলুম কাজ কতটা এগোল দেখবার জন্যে। তিন-চারদিন ছিলুম।

এরমধ্যে একদিন সকাল বেলায় কাজের সাইটে গিয়েছি, আমাদের এক ছোকরা ইঞ্জিনিয়ার এসে ফিসফিস করে আমাকে বলল— মনোজদা, হরিণের মাংস খাবেন?

বললুম— নিশ্চয়ই খাব। খাইনি তো কোনোদিন। কিন্তু তুমি এমন রহস্যময়ভাবে বলছ কেন? কোনো গণ্ডগোল আছে না কি?

সে বলল— একটু আছে। মানে, এখানে হরিণ মারা আইনত নিষেধ। একটা পোচার একটা হরিণ মেরেছে। স্থানীয় লোকেদের কাছে গেলে যদি তারা পুলিশকে বলেটলে দেয়, সেই ভয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

আমি বললুম— চমৎকার। হরিণের মাংস খেতে গিয়ে শেষে পুলিশের হাতে পড়ব না কি?

—কিচ্ছু হবে না, মনোজদা। আপনি শুধু হ্যাঁ বলে দিন, বাকিটা আমরা ম্যানেজ করে নেব। সবাই কিন্তু লাফাচ্ছে।

কী আর করি। আমিও যে মনে মনে লাফাচ্ছিলুম না তা-নয়। বললাম— যা খুশি করো। আমি কিছু দেখিওনি, শুনিওনি। যদি বিপদ বোঝো, তাহলেই আমাকে ডেকো।

সারা সকাল কাজকর্ম করে দুপুর বেলা যখন আমাদের ক্যাম্প ফিরলুম, তখন আমরা সকলেই বিশ্বগ্রাসী খিদেয় কাতর। দেখি মাংস রান্নার গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। আমাদের রান্না করত ভুবনমোহন পাত্র। সে সার্থকনামা লোক। তার রান্না ছিল সত্যিই ভুবনমোহন। তার ওপর, সেদিন স্পেশাল মাংস। পাত্র একেবারে মনপ্রাণ দিয়ে রান্না করেছিল। তার ফলে গন্ধটা যা বেরিয়েছিল সে আর কী বলব। আমি তো প্রায় অবশ হয়ে পড়লুম। বাকি সকলের অবস্থাও সেইরকমই।

স্নানটান সেরে সবাই মিলে অধীর আগ্রহে বসে আছি কখন খাবার ডাক আসবে, এমন সময় একটি ছেলে এসে বলল— একজন বনবিভাগের লোক আর একজন পুলিশের দারোগা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সর্বনাশ করেছে। এ তো মহা বিপদ! আর ঠিক এই সময়েই? করবার তো কিচ্ছু নেই। বললুম— ওঁদের এখানেই নিয়ে এসো।

সরকারি অফিসার দু-জন ঘরে ঢুকেই কাজের কথা পাড়লেন। বললেন— আমরা খবর পেয়েছি যে আপনাদের ক্যাম্পের একজন লোক একজন পোচারের কাছ থেকে হরিণের মাংস কিনেছে। ব্যাপারটা ভয়ানক বে-আইনি। আমরা তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।



আমি প্রশ্ন করলুম— কে এই কাজ করেছে তার নাম জানেন?

দারোগা বললেন— নাম একটা পেয়েছি বটে কিন্তু তার কোনো মানেই হয় না। এমন বিদঘুটে সব নাম বাঙালিদের। কী যেন দাই পিয়োন হাজার বা ওইরকমের কিছু।

বুঝলুম, আমাদের ইলাক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার দ্বৈপায়ন হাজরা কর্মটি করেছে। সে আমার পাশেই মুখে একেবারে শিশুর সারল্য নিয়ে বসে ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলুম— এ কে রে? চিনিস?

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে দ্বৈপায়ন বলল— না, মনোজদা। দাই পিওন হাজার বলে আমাদের এখানে তো কেউ নেই। আমাদের পাশেই কনশাস কন্স্ট্রাকশন কাজ করছে। তাদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে হয় না?

দারোগা গম্ভীরমুখে বললেন— না, যে নিয়েছে সে আপনাদেরই লোক।

আমি বললুম— আমি তো একে ঠিক চিনতে পারছি না। একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখি। যদি পেয়ে যাই তো সন্ধের মধ্যেই তাকে আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেব।

দুই অফিসার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। বললেন— ঠিক আছে, তাই হবে। আমরা তাহলে এবার চলি।

দ্বৈপায়ন বিনয়ের অবতার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল— সে কি কথা! যাবেন মানে? এখন আমরা খেতে বসেছি, আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে বসতে হবে। আমরা কোনো কথাই শুনব না। আপনারা না-খেয়ে চলে গেলে আমাদের যে অকল্যাণ হবে।

অফিসার দু-জন, না-না, তা হয় না, আপনাদের কম পড়ে যাবে, ইত্যাদি বলতে লাগলেন বটে কিন্তু খুব যে একটা জোরের সঙ্গে তা মনে হল না। দুপুর বেলা, ওঁদেরও নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছিল। তার ওপরে ভুবনমোহনের রান্নার গন্ধে যে ওঁরা অত্যন্ত

কাতর হয়ে পড়ছিলেন তাতে আর আশ্চর্য কী। কাজেই, যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁদের রাজি হতে হল।

আমরা সবাই মিলে হইহই করে খেতে বসলুম। ভুবনমোহন যা রেঁধেছিল সেদিন, জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না। আর দুই অফিসার যা খেলেন তা দেখে তো আমরা তাজ্জব। আমাদের কম পড়ে যাওয়ার কথাটা তখন আর তাঁদের মনে ছিল কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে দু-জনে যখন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ফিরে যাচ্ছেন, আমি বললুম— তাহলে আজ সন্ধে বেলায় দেখা হচ্ছে।

বনবিভাগের অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন— তার আর দরকার হবে না। যে অপরাধের তদন্ত করতে এসেছিলুম, আমরা তো এখন সেই দুষ্কর্মেরই ভাগীদার। কাজেই তদন্তটা এখন নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন।

মিথ্যেবাদী



বিনয় দাশগুপ্ত, আমাদের পাড়ার বিনুদা, একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর ডাক আসে নানা রকমের সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য। এই কারণে তাঁকে মাঝে-মাঝেই বিদেশে উড়ে যেতে হয়। কতবার যে তিনি প্লেনে চড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু হলে কী হবে, প্লেনে চড়তে তাঁর ভীষণ ভয়। যখনই প্লেনে ওঠেন, তাঁর সঙ্গে থাকে এক শিশি ট্র্যানকুইলাইজারের বড়ি। ঝোড়ো আবহাওয়ায় বা এয়ারপকেটে পড়ে প্লেন একটু লম্ফঝম্ফ করলেই তাঁর বুকের ঢিপঢিপানি শুরু হয়ে যায়। তখন চটপট একটা বড়ি মুখে ফেলে দেন। এতে মনটা কিঞ্চিত শান্ত হয়, স্নায়ুর উত্তেজনাও কমে আসে।

একবার বিনুদা কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কক হয়ে কাম্বোডিয়া যাচ্ছিলেন। তাঁর সহযাত্রী ছিল হল্যান্ড থেকে আসা একদল পুরুষ ও মহিলা টুরিস্ট। প্লেনে পেছনের দিকে প্যাসেজের ধারে সিট পেলেন তিনি, জানলার ধারে তাঁর পাশে বসলেন ওই টুরিস্টদলের একজন মহিলা। সেই দলের বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাঝামাঝি জায়গার সিটগুলোতে বসলেন।

সেদিন আকাশ পরিষ্কার, মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। বিনুদা ভাবলেন — যাক, বেশ নিশ্চিন্ত মনে যাওয়া যাবে।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় অন্যরকম।

প্লেন আকাশে ওঠার কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গার সিটগুলোতে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়ে গেল। শোনা গেল, একজন টুরিস্ট বিজাতীয় ভাষায় ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছেন আর বাকি সকলে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড।

ব্যাপার দেখে বিনুদার পাশে বসে থাকা মহিলা উঠে গিয়ে তাঁর দলের বাকি সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, একজন পাইলট বেরিয়ে এসেছেন আর তিনিও আর্তনাদরত ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। চিৎকার আর কিছুতেই থামে না।

কিছুক্ষণ বাদে বিরক্ত মুখে ভদ্রমহিলা ফিরে গেলেন। বিনুদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— কী হয়েছে? ওই লোকটি অমন চিৎকার করলেন কেন?

ভদ্রমহিলা বললেন— কী জানি কী হয়েছে। পাগল-টাগল হয়ে গেছে বোধ হয়। ‘প্লেন ফেরাও, প্লেন ফেরাও’ বলে চিৎকার করছে আর হাত-পা ছুড়ছে। পাইলট এসে বলে গেলেন যে প্লেনের সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই, তাও কিছুতেই শুনছে না। যত সব!

বিনুদা হেসে বললেন— ও কিছু নয়। প্রথম বার প্লেনে চড়লে অনেকে এরকম নার্ভাস হয়ে পড়ে। এই দুটো বড়ি দিচ্ছি, খাইয়ে দিন। দেখবেন, একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবে। বলে পকেট থেকে ট্র্যানকুইলাইজারের শিশিটা বের করলেন।

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন— প্রথম বার প্লেনে? কী বলছেন আপনি? আড্রিয়ান রয়েল ডাচ এয়ারলাইন্সের কর্মচারী, ওর জীবনের অর্ধেকটাই কেটেছে আকাশে। কখনো এরকম করে না। কিন্তু আজ ওর নাকি মনের ভেতরে ডাক এসেছে। যেকোনো কারণেই হোক, ওর ধারণা হয়েছে যে, এই প্লেনটা একটু বাদেই ভেঙে পড়বে, কিছুতেই ব্যাঙ্ককে পৌঁছাবে না। আর সেইজন্যে এমন পাগলামি করছে।

শুনে বিনুদার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। প্রবল ঢোঁক গিলে বললেন— বলেন কী? মনের ভেতরে ডাক এসেছে? প্লেনটা একটু বাদেই ভেঙে পড়বে? বলেই শিশির দুটো বড়ি বের করে মুখের ভেতরে চালান করে দিলেন। তারপর বললেন— এরকম ডাক কি ওই ভদ্রলোকের মাঝে-মাঝেই আসে নাকি?

—মোটেই না। এই প্রথম।

আবার দুটো বড়ি অদৃশ্য হল। বিনুদা চোখ বন্ধ করে সিটের ওপরে এলিয়ে পড়লেন।

তারপর থেকে যতবার আড্রিয়ান চিৎকার করে ওঠেন বা প্লেনটা একটু কেঁপে ওঠে, ততবারই একটা কী দুটো বড়ি বিনুদার মুখের ভেতরে চলে যায়। খাওয়া তো মাথায় উঠল, চা পর্যন্ত খেলেন না।

কিছুক্ষণ বাদে চিৎকারটা একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। বিনুদা আরও দুটো বড়ি খেয়ে মিনমিন করে বললেন— প্লেনটা যেন পড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, না?

ভদ্রমহিলা বললেন— পড়ে যাবে কেন? প্লেনটা নীচে নামছে। ব্যাঙ্কক আসতে তো আর দেরি নেই।

—আপনার তাই মনে হয়? জানলা দিয়ে দেখবেন নীচে কী আছে?

—কী আবার থাকবে! পাহাড় জঙ্গল এইসব।

—পাহাড়? জঙ্গল? কোনোক্রমে কথাদুটো বলে শেষ তিনটে বড়ি মুখের ভেতরে চালান করে দিয়ে বিনুদা একেবারে নেতিয়ে পড়লেন। তাঁর আর তখন হাত-পা নাড়ারও ক্ষমতা নেই। গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ বেরচ্ছে। একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগের অবস্থা।

ব্যাপার দেখে সহযাত্রিণীটি ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি এয়ারহোস্টেসকে ডেকে আনলেন। তিনিও চিন্তিত। বললেন— আমি ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরকে খবর দিচ্ছি, তারা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবে।

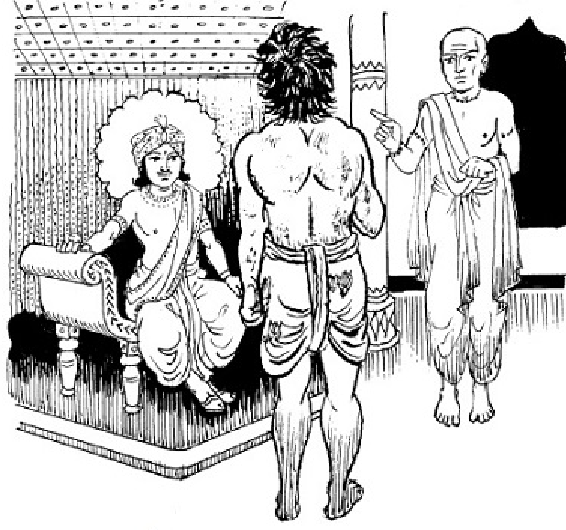
কিছুক্ষণ বাদেই প্লেন একেবারে নির্বিঘ্নে ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরে নামল। যাত্রীরা একে-একে প্লেন থেকে নামতে শুরু করলেন। বিনুদা তাঁর চেয়ারে আচ্ছন্নের মতো পড়েই রইলেন অ্যাম্বুলেন্সের প্রতীক্ষায়।

প্রায় সবাই যখন নেমে গেছে, তখন তাঁর সহযাত্রিণী এক বিশালকায় ভদ্রলোককে রীতিমতো টানতে টানতে তাঁর কাছে গিয়ে এলেন। ক্রুদ্ধ গলায় বললেন— দ্যাখো আড্রিয়ান, তোমার নির্বোধ লম্ফঝম্ফ এই ভদ্রলোকের কী অবস্থা করেছে!

আড্রিয়ান অত্যন্ত লজ্জিত আর বিনীতভাবে বিনুদাকে বললেন— স্যার, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

বিনুদা কথা বলতে পারলেন না। খুব ধীরে-ধীরে ওপরে-নীচে মাথা নাড়লেন।

আড্রিয়ান বললেন— স্যার, আপনি তো জানেন যে আমাদের সকলেরই মনের ভেতরে একটি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা শক্তি লুকিয়ে থাকে। সে কখনো কখনো আমাদের বিপদ সম্পর্কে আগেভাগে সাবধান করে দেয়। একেই বোধ হয় অন্তর্যামী বলে। তা স্যার, আমার অন্তর্যামীটি যে একেবারে ডাহা মিথ্যেবাদী সেটা আমি মোটেই জানতুম না। তাই এরকম ব্যবহার করেছি। আমাকে মার্জনা করে দেবেন।



ইতিহাসের সূচনা

চাণক্য চিন্তিত মুখে বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। কিছুদিন আগে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত থেকে যে খবর এসেছে— সেটাই তাঁর উদবেগের কারণ। পাটলিপুত্র নগরের ওপর তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি আর বৌদ্ধবিহার ও সংঘারাম থেকে ঢক্কার শব্দ শোনা যচ্ছে। চারিদিকে দোতলা বা তিনতলা সুরম্য কাঠের বাড়িগুলোর একতলায় জ্বলে উঠেছে প্রদীপ। নগরপালিকার লোকেরা জ্বলন্ত মশাল হাতে পথের দু-ধারে দীপাধারগুলি জ্বালিয়ে দিতে শুরু করেছে। মালিনীরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ফুল আর মালা বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়েছে। বন্দর আর বিভিন্ন কর্মশালা থেকে কর্মীরা বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে। আদিত্যদেবের সঙ্গে এবার তাদেরও বিশ্রাম নেবার সময় হল।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সুখাসনে বসে তাঁর গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে ঠিক সাহস পাচ্ছিলেন না। শেষপর্যন্ত না-বলে পারলেন না, 'কেন আপনি এত চিন্তা করছেন, গুরুদেব? সেলুকাস সিন্ধু নদ পার হবার তোড়জোড় করছে, করতে দিন। আমার সৈন্যবাহিনী সিন্ধুর এপারে তার ক্ষত্রপদের একের-পর-এক পরাজিত করে নদী পার করে দিয়েছে। সেলুকাসকেও সেই পথেই যেতে হবে, যদি সে পূর্ব তীরে এসে উঠতে পারে।'

চাণক্য ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্রদৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নির্বোধের মতো কথা বোলো না। কতকগুলো সামান্য ম্যাসিডনীয় ক্ষত্রপ আর সেলুকাস এক পদার্থ নয়। সে দস্যু আলেকজান্ডারের সবচেয়ে প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ। সে শয়তানিতে তার প্রভুর চেয়ে কিছু কম যায় না। ভুলে যাচ্ছ কেন যে এই বিদেশি দস্যুরা ভারতীয় নয়? ভারতের ন্যায়যুদ্ধ এদের কাছে হাস্যকর নির্বুদ্ধিতামাত্র। এই ম্যাসিডনীয়দের কাছে যুদ্ধে জেতার জন্য যেকোনো রকমের জঘন্য নীচতার আশ্রয় নেওয়া শুধু নীতি নয়, পরম ধর্ম। পুরুরাজকে বা পারস্যসম্রাট দারায়ুসকে কীভাবে পরাজিত করা হয়েছিল, সে নৃশংসতার কথা তুমি জানো না?'

‘জানি, গুরুদেব। তবে, এও জানি যে যত কূটকৌশলই সেলুকাস করুক না কেন, মগধের সৈন্যবাহিনীর সামনে সে দাঁড়াতে পারবে না। আমি ইতিমধ্যে উত্তরদেশ থেকে একটি অশ্বারোহী আর দক্ষিণাঞ্চল থেকে একটি পদাতিকবাহিনী সীমান্তে পাঠিয়ে দিয়েছি। সম্প্রতি গঙ্গাহৃদি রাজ্য থেকে কেনা পাঁচ-শো রণহস্তীর মধ্যে দু-শোটির একটি দলও পাটলিপুত্র থেকে রওনা হয়ে গেছে। তারা আমাদের ওখানে বর্তমান সৈন্যবাহিনীর শক্তি তো বাড়াবেই আর দেখবেন, তাদের আক্রমণের সামনে সেলুকাসের সৈন্যরা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যাবে।’

‘মূর্খ, মূর্খ! কে তোমাকে বলেছে যে সে তোমার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? শোনো চন্দ্রগুপ্ত, আমি তোমাকে যে রণনীতি শিক্ষা দিয়েছিলাম যে যখনই তুমি শত্রুকে হেয় জ্ঞান করবে, তখনই তোমার সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে— সে কথা তুমি ভুলে গেছ। পুরুর সঙ্গে আলেকজান্ডারের একটিমাত্র যুদ্ধের রণকৌশল পর্যালোচনা করে আর ইউডেমাস বা পেইথনের মতো কতকগুলো অপদার্থ ক্ষত্রপকে যুদ্ধে হারিয়ে তুমি ভাবছ যে ম্যাসিডনীয়দের কূটযুদ্ধের সবকিছু তুমি শিখে ফেলেছ, তাই না? জেনে রাখো যে, আসলে তুমি শেখোনি কিছুই!’

চন্দ্রগুপ্ত মাথা চুলকিয়ে বললেন, ‘সত্যিই আমি কিছুই শিখে উঠতে পারিনি, গুরুদেব। আপনি আমাকে বলে দিন যে, সেলুকাস কী ধরনের শঠতার আশ্রয় নিতে পারে তা জানতে হলে আমাকে কী করতে হবে।’

চাণক্য পিঞ্জরবদ্ধ সিংহের মতো ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পদচারণা করতে করতে বললেন, ‘সেখানেই তো আসল সমস্যা, চন্দ্রগুপ্ত, আর তাই নিয়েই আমার যত উদবেগ। যেকোনো যুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলে বাহুবল অবশ্যই প্রয়োজন; তবে তার চেয়েও বোধ হয় বেশি প্রয়োজন বুদ্ধির। সেলুকাসের প্রতিটি গতিবিধির, প্রতিটি পদক্ষেপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া না-গেলে তার উদ্দেশ্য বা কৌশল কিছুই সঠিকভাবে জানা সম্ভব হবে না। তার জন্যে চাই— একটি পরিশ্রমী, নিয়মানুবর্তী আর বুদ্ধিমান গুপ্তচরবাহিনী, যারা এইসব সংবাদ পাঠাবে বিশদ, দ্ব্যর্থহীন, স্বচ্ছ ভাষায়, ছোটোখাটো কোনো বিবরণ বাদ না-দিয়ে। যুদ্ধে এই গুপ্তচরদের প্রয়োজন সৈন্যবাহিনীর চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশি।’

‘আমাদের গুপ্তচররা কি এই কাজ করতে পারে না, গুরুদেব?’

‘পারে, কিন্তু তারা কোথায়? তোমার সাম্রাজ্য এখন সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত, পূর্বে গঙ্গাহৃদি রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমা থেকে পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত। এর সঙ্গে স্বভাবতই বেড়েছে তোমার শত্রুসংখ্যা। এই ঘরের শত্রুদের ওপর নজর রাখবার জন্যে আমাদের প্রায় সমস্ত গুপ্তচরেরাই ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তারা এই মুহূর্তে কে যে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে তার সমস্ত সংবাদও আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি। পাটলিপুত্র থেকে খবর পাঠিয়ে, তাদের খুঁজে বের করে, পশ্চিম সীমান্তে পাঠানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেলুকাস সে সময় আমাদের দেবে বলে মনে হয় না। ওখানে যে ক-জন আছে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আরও দু-চারজনকে পাঠানো হয়তো যায়, কিন্তু যে বিশালায়তন পরিসরে তাদের কাজ করতে হবে, তার পক্ষে তারা পর্যাপ্ত হবে না।’

‘একটা উপায় করা যেতে পারে কি? ধরুন, ম্যাসিডনীয় বাহিনী পুরোপুরি সংগঠিত হবার আগেই যদি আমরা সিন্ধু পার হয়ে তাদের আক্রমণ করি?’

‘তুমি পিপ্পলিবনের পরাক্রান্ত মৌর্যবংশের সন্তান। তোমার মাথায় এ ধরনের চিন্তা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বৎস, সেটা এখানে বসে গোপনে করতে পারবি কি? ও পক্ষের গুপ্তচরেরা কেউ চুপ করে বসে নেই। তারা ঠিক খবর পেয়ে যাবে আর তোমার আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত হয়ে থাকবে।’

চন্দ্রগুপ্ত হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘পিপ্পলিবনের মৌর্যদের হঠকারী বলে বদনাম আছে ঠিকই; কিন্তু আপনি যখন আমাদের শীর্ষে আছেন, তখন আর চিন্তা কী? হঠকারিতা আর কূটবুদ্ধি একত্র হলে তবেই তো ইতিহাস রচিত হয়, গুরুদেব। তাই না?’

চাণক্যের মুখের রেখাগুলো নরম হয়ে এল। বললেন, ‘ইতিহাস সেদিনই স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে, চন্দ্রগুপ্ত, যেদিন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হাতে আদ্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে নৃশংস বিদেশি লুণ্ঠকশক্তি পথকুক্কুরের মতো আমাদের দেশ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে। যাক গে, আমার সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল। আজ মধ্যরাত্রে আবার এই মন্ত্রণাগারে পরামর্শ করতে বসব। এর মধ্যে কোনো একটা উপায় হয়তো বেরিয়ে আসবে।’

চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম করে বললেন, ‘যথা আজ্ঞা, গুরুদেব।’

পরামর্শ চলছিল, হঠাৎ প্রতিহারিণী ঘরে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

চন্দ্রগুপ্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘কী ব্যাপার? কোনো প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে কি যে এইসময়ে তোমাকে আসতে হল?’

প্রতিহারিণী করজোড়ে সন্ত্রস্ত গলায় বলল, ‘অপরাধ মার্জনা করবেন, সম্রাট। একটি ঘটনা ঘটেছে, সেটা আপনাদের গোচরে আনা প্রয়োজন বলে মনে হল আমার।’

চাণক্য বললেন, ‘এত রাতে কী এমন ঘটনা ঘটল, প্রতিহারিণী?’

‘একটি যুবক সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী, গুরুদেব। তাকে কিছুতেই বিতাড়িত করা যাচ্ছে না। মেরেও না। সে প্রাসাদের সিংহদ্বারের স্তম্ভ আঁকড়ে পড়ে রয়েছে আর অনবরত বলে যাচ্ছে যে তাকে এই মুহূর্তে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, নইলে অত্যন্ত দেরি হয়ে যাবে। সে দ্বাররক্ষীদের প্রহার সহ্য করছে কিন্তু কিছুতেই চলে যাচ্ছে না। তার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে অভুক্ত আর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসছে।’

‘হু, তোমার কথায় বুঝতে পারছি ছেলেটি বলশালী এবং সে ভিক্ষুক নয়। সে কোথা থেকে আসছে কিছু বলেছে?’

‘হ্যাঁ, সে বলছে যে সিন্ধু নদের পূর্ব তীরবর্তী কোনো গ্রাম থেকে আসছে, তবে গ্রামের নামটি আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না, গুরুদেব—’

চাণক্য বাধা দিয়ে সংহত গলায় বললেন, ‘সিন্ধু নদের পূর্ব তীরবর্তী গ্রাম থেকে? তাকে এই মুহূর্তে এখানে নিয়ে এসো। আর সেইসঙ্গে তার জন্যে কিছু খাবারও এনো। প্রতিহারিণী, তুমি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছ ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারছি যে সেই বিদ্যা তোমার মাতৃহৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কাজেই, একটি ক্ষুধার্ত বলশালী ক্লান্ত যুবকের যতটা খাবারের প্রয়োজন বলে তোমার মায়ের মন বলবে ততটাই নিয়ে এসো।’

প্রতিহারিণী আভূমি প্রণত হয়ে স্মিতমুখে বলল, ‘যথা আজ্ঞা, গুরুদেব।’

যুবক সত্যিই স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, গৌরবর্ণ, মাথায় একরাশ উশকোখুশকো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। তার সর্বাঙ্গে ধুলো আর রক্তের দাগ। নগ্ন পায়ে অসংখ্য রক্তাক্ত ক্ষতের চিহ্ন। সে ঘরে ঢুকেই চন্দ্রগুপ্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'আমি এক ভয়ংকর সংবাদ নিয়ে এসেছি সম্রাট। কিছুদিন আগে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়ে এক বিশাল বিদেশি সৈন্যদল সিন্ধু নদের পশ্চিমাঞ্চলে নেমে আসছে। জনশ্রুতি এই যে, রাক্ষস আলেকজান্ডারের সেনাপতি ও উত্তরাধিকারী সেলুকাস এই সৈন্যদল নিয়ে আসছে। তার উদ্দেশ্য সিন্ধু পার হয়ে আপনার সাম্রাজ্য আক্রমণ করা।

চন্দ্রগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। চাণক্য তাকে হাত নেড়ে বাধা দিয়ে বললেন, 'আগে বলো, তুমি কে এবং কোথা থেকে আসছ?'

যুবক চাণক্যকে দেখতে পায়নি। তাঁর গলা শুনে তাঁর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কৌটিল্য। আমার প্রণাম নেবেন।'— বলে সে চাণক্যকে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'আমার নাম কর্ণ। সিন্ধু নদের ধারে করঞ্জ গ্রামে আমার নিবাস। আমি মেষপালক।'

'তুমি যে সৈন্যদলের কথা বললে, তাদের তুমি নিজে দেখেছ? তারা যে সেলুকাসের বাহিনী, তা তুমি জানলে কী করে?'

'পাহাড়ের ওপর ভেড়া চরাতে গিয়ে আমি এই বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটিকে দেখি। সেই দিনই গান্ধার থেকে আসা একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তারা তক্ষশীলায় যাচ্ছিল। তাদের কাছেই সেলুকাসের খবর পাই। আমি সঙ্গেসঙ্গে করঞ্জে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই রাত্রেই পাটলিপুত্রের উদ্দেশে রওনা হই।'

'যে সৈন্যদলটিকে তুমি দেখেছ, তার বিষয়ে কিছু বলো দেখি।'

'এরা সংখ্যায় দুই সহস্রের বেশি হবে না। অশ্ব-শকটের ওপরে স্তূপাকার বস্ত্রাবাস নিয়ে এরা একটি পাহাড়ের পেছনে শিলাময় উপত্যকায় জড়ো করছে, যাতে সিন্ধুর পূর্ব তীর থেকে তাদের দেখা না-যায়। বস্ত্রাবাসগুলির পরিমাণ দেখে মনে হয় যে তাদের সংখ্যা দশ সহস্র মতন হবে। হয়তো, আরও আসবে। ব্যবসায়ীদের কাছে জানতে পেরেছি যে তারা একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীকে গিরিবর্ত্মে ঢুকতে দেখেছে। তবে, তাদের সংখ্যা কত তা বলতে পারেনি। তারা তো টাকা গুনতে অভ্যস্ত কাজেই— তারা আর কী করেই বা বলবে।'

চাণক্য কিছুক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে কর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার পায়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে তোমার গ্রাম থেকে এতটা পথ তুমি দৌড়ে এসেছ। তাই কি?'

'হ্যাঁ, গুরুদেব। সারাদিন দৌড়েছি, রাত্রে কোনো মন্দিরে বা বৌদ্ধবিহারে শুয়ে থেকেছি। তা না-করলে যে ভীষণ দেরি হয়ে যেত।'

'কেন? তোমার কি ধারণা যে মগধের রাজকর্মচারীরা এতই অপদার্থ, যে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ তারা যথাসময়ে সম্রাটের গোচরে আনবে না?'

'না গুরুদেব। আমি খুব ভালো করেই জানি যে সম্রাটের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গেছে।'

চাণক্য ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'তাহলে তাড়াটা কোথায় যে তোমাকে এই দীর্ঘ পথ দৌড়ে আসতে হল?'

'আমি সম্রাটের সৈন্যদলে যোগ দিতে চাই, যদি দেরি হয়ে গিয়ে না-থাকে।'

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে তোমার এত উৎসাহের কারণ কী?'

'যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবু মরবার আগে আমি অন্তত একটা ম্যাসিডনীয়র শিরচ্ছেদ করে তার রক্তে আমার প্রিয়জনদের তর্পণ করে যেতে চাই। তাহলেই আমার আট বছরের প্রতীক্ষা শেষ হয়।'

'কেন? ম্যাসিডনীয়দের ওপর তোমার এত রাগের কারণ? এরা কী ক্ষতি করেছে তোমার?'

চাণক্য চাপা গলায় বললেন, 'তুমি তো জানো বৎস যে, পুরুরাজের পরাজয়ের পর, ম্যাসিডনীয়রা সিন্ধুর পূর্ব তীরে যে অকল্পনীয়পূর্ব নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছিল, আজ সমগ্র ভারত একযোগে সেটা ভোলবার চেষ্টা করছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যত কাব্য, নাটক বা গাথা রচিত হয়েছে, তাদের কোথাও আলেকজান্ডারের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। যে কথা সমস্ত জাতি ভুলতে চাইছে, এই বালককে দিয়ে কেন সেই যন্ত্রণার স্মৃতিকে টেনে আনতে চাইছ?'

কর্ণ বলল, 'গুরুদেব, আর সকলে ভোলবার চেষ্টা করলেও, আমরা করছি না। আমরা যে দেখেছি, প্রথম দিনের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত আলেকজান্ডার পালিয়ে গিয়ে পরদিন ঘুরপথে এসে পুরুরাজের সৈন্যবাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল। সেই অবিশ্বাস্য কাপুরুষতায় হতভম্ব ভারতীয়রা সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। সেই রক্তাক্ত দিনের শেষে ম্যাসিডনীয়রা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সিন্ধুর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে। যারা পালাতে পেরেছিল তারা বেঁচে গিয়েছিল। যারা পারেনি, সেই নিরীহ, নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের ওপরে তারা যে অত্যাচার করেছিল, তা আমরা ভুলতে চাই না। বৃদ্ধবৃদ্ধা ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে, সবল নারী ও পুরুষদের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শুনেছি, তাদের দেশে নাকি ওদের গোরুছাগলের মতো বিক্রি করা হবে। এরা কি মানুষ? পৃথিবীর এই ভয়ংকর অভিশাপগুলোর একটিকেও যদি মারতে পারি— তবেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।'

চাণক্য কর্ণের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বৎস, দুঃখ কোরো না, আমরা কিন্তু তোমাকে সৈন্যদলে নিতে পারি না। তবে, তুমি চাইলে সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করতে পারো। সেই সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।'

'কেন আমি সৈন্যদলে যোগ দিতে পারি না, গুরুদেব?'

'কারণ, আমাদের সৈন্যরা বেতনভোগী যোদ্ধা। যুদ্ধই তাদের জীবিকা, যেমন তোমার পশুপালন। মহাভারতের যুগ থেকে ভারতবর্ষে এই নিয়মই চলে আসছে। তোমাকে যোদ্ধা হতে গেলে তোমাকে প্রথমে শস্ত্রবিদ্যা শিখতে হবে, তারপর কোনো একটি সেনাগোষ্ঠীতে যোগ দিতে হবে যেখানে সৈন্যদের অন্যান্য কর্তব্য আর বস্ত্রাবাসের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। তাতে সময় লাগবে। কিন্তু সে সময় তো নেই। তার পরিবর্তে, আমরা তোমাকে এখনই এমন কাজ দিতে পারি যার মূল্য যুদ্ধ করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়— হয়তো-বা বেশি। শুধু একটাই সমস্যা। আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান, তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণশক্তি খুব ভালো। কিন্তু যে কাজ তোমাকে দিতে যাচ্ছি, সেটা তুমি একা কতটা করে উঠতে পারবে জানি না।'

'আমি একা নই, গুরুদেব। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সহস্রাধিক আবালবৃদ্ধবনিতা। সেলুকাস নামক নরকের কীটটাকে ধ্বংস করতে যেকোনো কাজে তারা সম্রাটকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।'

চাণক্য দীপ্তচোখে কর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চমৎকার। তাহলে, কাল সকালে আমি তোমাকে কী কী করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে দেব। তারপর, অপরাহ্নে তুমি আমাদের দ্রুতগামী রথে ফিরে গিয়ে সিন্ধুর পূর্ব তীরে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে সম্রাটের অভিজ্ঞান নিয়ে গোপনে দেখা করবে। তিনি তোমাকে আরও কিছু উপদেশ দেবেন। নিজের গ্রামে ফিরে যাবে পদব্রজে যাতে কারও মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না-হয়। এখন প্রতিহারিণী তোমার খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। খেয়ে নিয়ে তুমি তার বাসস্থানে গিয়ে রাত্রিযাপন করবে। সবাইকে বলবে যে, তুমি প্রতিহারিণীর দৌহিত্র। কাল ভোর হবার এক দণ্ডের মধ্যে প্রাসাদ দেখবার নাম করে এখানে চলে আসবে। এখন যাও আর প্রতিহারিণীকে একবার এখানে আসতে বলো।'

কর্ণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই চন্দ্রগুপ্ত বললেন, 'এই অনভিজ্ঞ গ্রাম্য যুবকের হাতে এত বড়ো একটা দায়িত্ব দেবেন, গুরুদেব? সে পারবে তো?'

চাণক্য দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এই যুবক তার সমস্ত অন্তর দিয়ে, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার কর্তব্য পালন করবে। পারলে, সে-ই পারবে। জানো চন্দ্রগুপ্ত, প্রজাপুঞ্জ যখন রাজশক্তির পেছনে এসে দাঁড়ায়, তখন বিশ্বের কারও ক্ষমতা নেই যে সেই জাতিকে পদানত করতে পারে। তা সে যতই নৃশংস দানবিক হোক না-কেন।'

প্রতিহারিণী চলে যাওয়ার পর চাণক্য পুনরায় বাতায়নের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশে এখনও উষার আলোর ছোঁয়া লাগেনি, অন্ধকার সামান্য কেটেছে মাত্র। নগরপথ জনহীন, দীপাধারগুলির আগুন নিবে যাওয়ার মুখে। শোন নদী থেকে শীতল কোমল বাতাস বইছে, ক্বচিৎ একটি-দু-টি পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে— একটি নতুন দিনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠছে পাটলিপুত্র।

চাণক্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো চন্দ্রগুপ্ত, আমরা নীচে যাই। আপাতত একটু বিশ্রাম করে নাও। কাল তোমার অনেক কাজ। মগধ আর গঙ্গাহৃদির মিলিত শক্তির কথা শুনে আলেকজান্ডার ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছিল। সেলুকাস তা করবে না, যুদ্ধই করবে এবং তার উপযুক্ত প্রতিফলও সে পাবে। এসো, এইবার স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস রচনার সময় উপস্থিত হয়েছে।'



কানুবাবু আর ভোলাবাবু অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন যদিও দু-জনের স্বভাবে মিল প্রায় ছিল না বললেই চলে। কানুবাবু চটপটে, হাসিখুশি, মজাদার লোক এবং ভোলাবাবু ছিলেন গম্ভীর, শান্ত আর সুযোগ পেলেই যত্রতত্র ঘুমিয়ে পড়তেন। দু-জনেই কলকাতার কাছেই একটা কারখানায় চাকরি করতেন। কানুবাবু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আর ভোলাবাবু অ্যাকাউন্টসে। কানুবাবুর একটা পুরোনো বড়ো ফোর্ড গাড়ি ছিল। দুই বন্ধু সেই গাড়ি নিয়ে ছুটিছাটা হলেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়তেন আর প্রায় প্রত্যেকবার একটা না-একটা অদ্ভুত বা বিপদজনক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতেন। একবার ওঁরা যাচ্ছিলেন আগ্রা থেকে রওনা হয়ে রাজস্থানের সনকপুর বলে একটা শহরে। সেখানে একটা অতি প্রাচীন মন্দির আছে, সেটা দেখাই উদ্দেশ্য ছিল। সনকপুর বিখ্যাত জায়গা কিছু নয়, একটাই শুধু মন্দির। টুরিস্ট বড়ো একটা আসে না এদিকে। দুই বন্ধু ভোর বেলা বেরিয়েছেন, দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা।

আগ্রা থেকে উদয়পুর যাওয়ার বড়ো রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা চলে গেছে সনকপুরের দিকে। বড়ো রাস্তায় যদি বা বাস বা লরি চলে, সনকপুরের রাস্তা একেবারে নির্জন। প্রকৃতি এখানে অদ্ভুত রকমের নিষ্প্রাণ গাছপালা, লোকজন, জন্তুজানোয়ার, কিচ্ছু নেই। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বড়ো বড়ো সাদা পাথরের স্তূপ অথবা ছোটো বড়ো পাথরের চাঁই-এ ঢাকা ছোটো ছোটো পাহাড়। মনে হয় যেন একটা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক সরিসৃপের ফসিল হয়ে যাওয়া কঙ্কালের ভেতরে রাস্তাটা মড়ার মতো পড়ে রয়েছে।

এরকম একটা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো সহজ ব্যাপার নয়। চারদিকের ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ফলে গাড়িচালকের ঘুম পেতে থাকে, সেটি খুবই বিপদজনক। সেই ঘুম ঠেকানোর জন্য কানুবাবু চিৎকার করে বেসুরো গলায়, শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে পথের, গাইতে গাইতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ভোলাবাবু অবশ্য এসব কিছু জানেন না। তিনি পরমানন্দে ঘুমিয়ে যাচ্ছিলেন।

দিব্যি চলছিল গাড়িটা। হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, চলতে চলতে সেই জনহীন প্রান্তরের মাঝখানে দুম করে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর, আপন মনে গড়াতে গড়াতে

গিয়ে সেটা একটা মস্ত পাথরের চাঁই-এর পাশে দাঁড়িয়ে গেল। মোটরগাড়ির কলকব্জা সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান ছিল কানুবাবুর, কাজেই এরকম অবস্থায় গাড়িটাকে আবার চালু করার যত পদ্ধতি আর টোটকা জানা ছিল সেগুলো সব কটাই প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দেখা গেল, গাড়িটার আলো জ্বলছে না, ব্রেক কাজ করছে না, কিছুই হচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার। এরকম কেন যে হল, সেটা কিছুতেই ভেবে বের করতে পারলেন না কানুবাবু। তবে এটা বুঝতে পারলেন যে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে গাড়িটা কখনোই চালু করতে পারবেন না। এখন একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রির দরকার।

এটাই বাকি ছিল। এই তেপান্তরের মধ্যিখানে মিস্ত্রি কোথায় পাওয়া যাবে। কোনো লরি বা বাস পেলে হয়তো কাছেপিঠে কোনো জনবসতি থেকে লোকটাকে নিয়ে আসা যেত, কিন্তু সেসব কোথায়। ম্যাপ দেখে মনে হয় সনকপুর ওখান থেকে অন্তত দশ কিলোমিটার দূরে। হেঁটে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে হাঁ করে সাহায্যের আশায় বসে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

অতএব, বনেট বন্ধ করে গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবার জন্য তৈরি হলেন কানুবাবু। হঠাৎ দেখেন, পাথরের চাঁইটার পেছন থেকে একটা লোক বেরিয়ে আসছে। লোকটির পরনে ঠিক তাঁরই মতো সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। লোকটিকে দেখে কানুবাবুর ভীষণ চেনাচেনা বলে মনে হল। কোথায় যেন দেখছেন, কিন্তু কোথায় যে দেখেছেন সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

লোকটি গুটিগুটি কানুবাবুর কাছে এগিয়ে এল। হাতজোড় করে পরিষ্কার বাংলায় বলল — নমস্কার। আপনার গাড়িতে কি যন্ত্রপাতি কিছু আছে?

অত্যন্ত খুশি আর আশান্বিত হয়ে কানুবাবু বললেন— আপনি বাঙালি? অবশ্য, এরকম বিদেশ বিভুঁয়ে, বিপদের সময় বাঙালি ছাড়া আর কে-ই বা এগিয়ে আসবে। হ্যাঁ, কী বলছিলেন, যন্ত্রপাতি? আছে বইকি। আপনি কি মেকানিক? দেখুন না একবার গাড়িটা। কেন যে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটি কানুবাবুর সংবর্ধনায় আদৌ অভিভূত হয়েছে বলে মনে হল না। মাথা নেড়ে বলল— আপনার জন্যে নয়, আমি চাইছি আমার জন্য।

কানুবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন— আপনার জন্য? তার মানে? আপনারও গাড়ি খারাপ হয়েছে না কি? কোথায় আপনার গাড়ি?

হাত নেড়ে লোকটি বলল— ওইখানে, ওই পাথরের ঢিবিটার আড়ালে। খারাপই হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আমি আবার তাড়াহুড়োতে যন্ত্রপাতিগুলো বাড়িতে ফেলে এসেছি।

—বলেন কী? তা, ওখানে আপনার গাড়ি গেল কী করে? ওখানে যাবার তো কোনো রাস্তাই নেই। চারদিকে পাথর।

—রাস্তা দিয়ে যায়নি।

—রাস্তা দিয়ে যায়নি তো কি আকাশ থেকে পড়ল?

লোকটি মাথা চুলকে বলল— ইয়ে, মানে, হ্যাঁ, তা-ই বলতে পারেন।

কানুবাবু মনে মনে ভাবলেন, এই রে, এ যে দেখছি পাগল। মুখে হাসি টেনে বললেন — বলেন কী, আকাশ থেকে পড়েছে? তা, কী গাড়ি আপনার?

—গাড়ি ঠিক নয়। যান বলতে পারেন।

—যান। তার মানে?

—তার মানে, যাতে চড়ে লোকে এদিক-সেদিক যায়— সেই যান। এই যেমন ধরুন, জলযান।

—জলযান! বটে! তা আপনারটা কী যান? আকাশযান?

লোকটি ম্লান হেসে বলল— প্রায় ঠিকই বলেছেন। আকাশযান নয়, মহাকাশযান।

শুনে কানুবাবু বসে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। ভাবলেন, সর্বনাশ করেছে রে! এ তো পাগল নয়, বদ্ধ পাগল! এখন এই জনহীন মাঠের মধ্যিখানে একে সামলাই কী করে। কোনোরকমে মুখটা ভাবলেশহীন রেখে কানুবাবু বললেন— অ। মহাকাশযান। সেটা খারাপ হয়ে পড়েছে ওই ঢিবিটার পেছনে আর আপনি সেটা আমার এই ঝ্যাঝঝেড়ে ফোর্ড গাড়ির যন্ত্রপাতি দিয়ে সারাবেন?

—সারাতে পারব কিনা জানি না। চেষ্টা করে দেখব।

—আমি কি একবার আপনার মহাকাশযানটা দেখতে পারি?

—পারবেন না। কারণ, আলোর যেসব তরঙ্গ আপনার চোখ ধরতে পারে, তা দিয়ে মহাকাযানটা দেখা সম্ভব নয়।

—তা আপনি দেখছেন কী করে?

আমার দেখবার ক্ষমতা আপনার চেয়ে অনেক গুণ বেশি, কারণ আমার চোখে বর্ণালীর যে পরিসর ধরা পড়ে, তা আপনার মতো সঙ্কীর্ণ নয়, অনেক বড়ো। মানে, বেগুনি থেকে লালের মধ্যে যে কটা রং শুধু সে কটাই আপনি দেখতে পান, আমি দেখতে পাই তাদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যার রং। ফলে, যেমন ধরুন, অন্ধকারে আপনার কিছুই নজরে পড়ে না, আমার পড়ে।

—তাই নাকি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি আর পাঁচটা লোকের মতো সাধারণ মানুষ নন?

লোকটি আবার ম্লান হেসে বলল— আমি অসাধারণ নই, তবে মানুষও নই। আমি গ্রহান্তর থেকে আসছি। আপনাদের ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জের বাইরে এইরকমই অন্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জের একটি তারার একটি গ্রহে আমার বাড়ি। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জকে আপনাদের জ্যোতির্বিদরা নাম দিয়েছেন আলফা-২৭৫। আমি সেখান থেকেই আপনাদের গ্রহে আসছিলুম। মাঝপথে হতভাগা মহাকাশযানটা এমন গোলমাল শুরু করলে যে এখানে নেমে পড়তে বাধ্য হলুম।

কানুবাবুর মনে হল হাত-পা ছুড়ে দৌড় মারেন। কিন্তু এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে পালাবেন কোথায়? তা ছাড়া, উন্মাদ হলেও, লোকটিকে বিপদজনক বলে মনে হল না। তার পাগলামির মধ্যে কোথায় যেন একটা পদ্ধতি আছে। কথাগুলো যা বলছে সেগুলো অবাস্তব কিন্তু উলটোপালটা নয়। একে ক্ষেপানো ঠিক নয়। কখন যে কী মূর্তি ধারণ করবে বলা তো যায় না। তাই, কাষ্ঠ হেসে বললেন— হেঁ হেঁ, আপনি গ্রহান্তর থেকে এলে কী হবে, আপনার চেহারা কিন্তু ঠিক মানুষেরই মতো।

লোকটি মুখ বেঁকিয়ে বলল— দূর মশাই, একি আমার আসল চেহারা নাকি? আপনাদের জন্য আমাকে এই বিকট চেহারা ধারণ করতে হয়েছে।

এইবার একটু চটে গেলেন কানুবাবু। বললেন— বিকট চেহারা! কেন, আপনার চেহারা তো বেশ ভালোই দেখছি।

—আর বলবেন না মশাই। ভালো চেহারাই বটে। আমাকে যখন প্রথম মানুষের চেহারা দেখিয়েছিল, আমারই পিলে চমকে গিয়েছিল, আমাদের কোনো বাচ্চা ছেলেকে দেখালে সে তো নির্ঘাৎ ভিরমি যেত। গোল একটা মুণ্ডু, তার ওপরে বিরিবিরি চুল,দেখবার জন্য ড্যাবাড্যাবা দুটো চোখ, পটপটে কান, লুড়লুড়ে দুটো হাত, আর চলবার জন্যে দুটো ফঙফঙে ঠ্যাং। দেখে হেসে আর বাঁচিনে।

কানুবাবু ভয়ানক রেগে গেলেন। গোমড়া মুখে বললেন— ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা, আপনি এই পৃথিবীতে কী মনে করে।

—আমি এসেছিলুম আপনাদের দলপতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

—দলপতি? সে আবার কে?

—বাঃ, আপনাদের কোনো দলপতি নেই? অন্যান্য সমস্ত গ্রহে অনুন্নত অথচ বুদ্ধিমান প্রাণীদের একজন দলপতি থাকে। আপনাদের সেরকম কেউ নেই। তার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

অনুন্নত অথচ বুদ্ধিমান প্রাণী শুনে কানুবাবু রাগে প্রায় বাক্যহারা হয়ে যাচ্ছিলেন। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললেন— না আমাদের সেরকম কোনো দলপতি নেই। তবে, আপনার দরকারটা কী তা যদি আমাকে বলেন, হয়তো আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি। বলছেন আর মনে মনে ভাবছেন, এই বদ্ধ উন্মাদ লোকটার হাত থেকে উদ্ধার পাই কী করে। একটা গাড়িও ছাই আসছে না এদিকে।

লোকটি বলল— দরকারটা হল, আমি যে সংস্থায় চাকরি করি, তারা আমাকে আপনাদের দলপতির কাছে পাঠিয়েছে একটা প্রস্তাব দিয়ে। প্রস্তাবটি হল, আপনাদের উপগ্রহ, যাকে আপনারা চাঁদ বলে থাকেন, সেখানে আমরা একটা মহাকাশযানে জ্বালানি ভরবার কেন্দ্র খুলতে চাই। আপনাদের সৌরজগতের ঠিক বাইরে দিয়ে আমাদের আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশযানের যাতায়াতের পথ কিনা। মহাজাগতিক সংঘের নিয়মানুযায়ী আপনাদের অনুমতি ছাড়া সে কাজ আমরা করতে পারি না।

কানুবাবু আর সহ্য করতে পারছিলেন না। বললেন— দাদা, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারলুম না। আমাদের জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বা হিউস্টনে নাসার প্রধান হয়তো এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন। ওই আমার গাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে যন্ত্রপাতির বাক্সটা রয়েছে। ওটা নিয়ে যান। আর, আপনার মহাকাশযানটা সারানো হলে, দয়া করে ফেরত দিয়ে যাবেন। ওটা নিয়ে যদি মহাকাশে প্রস্থান করেন, তাহলে আমার গাড়িটা আর সারাতে পারব না।



—ধন্যবাদ, বলে লোকটা বাক্সটা নিয়ে ঢিবির পেছনে যেতে যেতে ফিক করে হেসে বলল — চিন্তা করবেন না। আপনার গাড়ির কিচ্ছু হয়নি।

দাঁত কিড়মিড় করে কানুবাবু মনে মনে বললেন— হ্যাঁ, তুমি তো সব জেনে বসে আছো।

দশ মিনিটের মধ্যে লোকটি বেরিয়ে এল। দন্তবিকাশ করে বলল— ধন্যবাদ। সব ঠিক হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু হয়নি, বুঝলেন।

কানুবাবু বললেন— তা তো বুঝলুম, এখন আমার গাড়ির কী হবে?

—কী আবার হবে? কিচ্ছু হয়নি আপনার গাড়ির। কলকবজা বন্ধ করার রশ্মি চালিয়ে আমিই ওটা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। নইলে এই সাহায্যটা তো পেতুম না, বুঝলেন না? এখন, রশ্মিটা বন্ধ করে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্তে গাড়ি চালু করতে পারেন। বলে পেছনের দরজা খুলে যন্ত্রপাতির বাক্সটা রাখতে গিয়ে ভোলাবাবুকে দেখে বললেন— এ আবার কে? মরে গেছে নাকি?

কানুবাবু বললেন— না ঘুমুচ্ছে।

এই সময়ে কেউ ঘুমোয়? বলে লোকটি ভোলাবাবুর নাকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন — এই যে মশায়, উঠে পড়ুন এবার। যাত্রা করার সময় উপস্থিত।

চমকে ঘুম ভেঙে উঠে ভোলাবাবু লোকটিকে বললেন— ব্যাপারটা কী? তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল নাকি? আমার নাক মুলে দিলি যে? গাধা কোথাকার।

ভোলাবাবুর কথা শুনে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে গাড়ির দরজা বন্ধ করে লোকটি একদৌড়ে পাথরের ঢিবিটার পেছনে চলে গেল।

কানুবাবু গাড়িতে উঠে বললেন— কে রে লোকটা? তুই তো চিনিস দেখছি। আমারও ভীষণ চেনাচেনা লাগছিল, কোথায় যেন দেখেছি। বদ্ধ পাগল একটা।

ভোলাবাবু অবাক হয়ে বললেন— কোন লোকটা?

—এই যে যাকে তুই গাধাটাধা বললি।

এইবার ভোলাবাবু ঘুম ছুটে গেল। বললেন— তোর হয়েছে কী, বলবি? মাথাটাথা খারাপ হল নাকি? আমি তো তোকেই গালাগাল করলুম। আবার কাকে করব?

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো কানুবাবুর মনে হল, আরে লোকটা যে ঠিক তাঁরই মতন দেখতে। তাঁর গায়ের লোম খড়খড় করে খাড়া হয়ে উঠল।

ঠিক তখুনি, পাথরের টিবির পেছনে গোঁ গোঁ করে একটা যন্ত্র চালু হবার শব্দ উঠল। তার পরমুহূর্তেই ধুলোর প্রচণ্ড ঝড় তুলে কী যেন একটা উল্কার মতো আকাশে উঠে গেল। চেষ্টা করেও সেটাকে দেখতে পেলেন না কানুবাবু।



সেবছরটা ছিল বোধ হয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হওয়ার মুখে। ইয়লটা কনফারেন্স হয়ে গেছে, হিটলার তখনও আত্মহত্যা করেননি, অ্যাটম বোমাও ফাটেনি জাপানে। অথচ এরকমই একটা সময়ে, কোথাও কিছু নেই, আমার জীবনে এমন একটা বোমা ফেটেছিল যে আমার একেবারে দফারফা হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

আমি তখন পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে জুনিয়র ওভারসিয়ার। কাজকর্ম তেমন কিছু নেই। দিনের বেশিরভাগ সময়ই যুদ্ধের বিশদ আলোচনা আর চুলচেরা বিশ্লেষণে কাটে। বেশ একটা গনগনে উত্তেজনা। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ বড়োসাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়ল।

আমার তো আত্মারাম খাঁচা! বড়োসাহেব ক্রিস্টফার গ্রে ছিলেন একজন অতিশয় বিপজ্জনক চরিত্র। আমরা তাঁর নামের পেছনে একটা হাউন্ড জুড়ে দিয়েছিলুম। তাঁর ঘরে ডাক পড়া মানে সর্বনাশ।

আমি তো কাঁপতে-কাঁপতে গ্রে সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। সাহেব প্রচণ্ড ভ্রূকুটি করে কী একটা ফাইল দেখছিলেন। আমাকে দেখে মুখ তুলে বললেন— মিস্টার টলাপাট্র, তুমি কি গাড়ি চালাইটে পাড়ো?

গাড়ি। এহেন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তরে মিনমিন করো বললুম— ইয়েস, স্যার।

—নন্ডডুলাল টাহা হইলে ঠিকই বলিয়াছে। কোঠায় শিখিলে?

অফিসে অড্ডা মারতে মারতে একটু চাল মেরেছি কী মারিনি, অমনি সাহেবের কানে কথাটি তুলে দিয়েছে! মনে মনে নন্দদুলালের বাপান্ত করতে করতে বললুম— ইন বারাসাত, স্যার। মাই ম্যাটার্নাল আঙ্কেল হ্যাজ এ কার। হি টট মি, স্যার।

—লাইসেন্স আছে?

—নো, স্যার।

—ডাসন্ট ম্যাটার। টোমাকে একটা কাজ কড়িটে হইবে। খুবই গোপনীয় কাজ। কালই টোমাকে নর্থ বেঙ্গলে যাইটে হইবে। কাজ শেষ কড়িয়া ফিড়িবে। সব ব্যবসটা আমড়া

কড়িয়া ডিব। আর, কাহাড়ও সহিট ইহা লইয়া আলোচনা কড়িবে না।

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। বুঝলুম, যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো কাজ। জাপানিরা এতদূর এসে গেছে না কি? নাঃ, সাধের প্রাণটা শেষপর্যন্ত জাপানিদের হাতেই গেল। যাব না বলে লাভ নেই, রাইফেলের গুঁতো মেরে পাঠাবে। পালালে ঠিক ক্যাঁক করে ধরে এনে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে। কাজেই বশংবদের মতো ঘাড় নেড়ে কম্পিতকক্ষে কাজটা কী সেটা জানবার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলুম।

ব্যাপারটা যখন জানা গেল তখন দেখলুম খুব একটা ভীত হওয়ার মতো কিছু নয়। ফলসাগুড়ি চা-বাগানের থেকে মাইলদশেক দূরে পাণ্ডারবাজার বলে একটা গ্রামের কাছে রংকি বলে একটা পাহাড়ি নদী আছে। তার ওপরে নাকি একটা ব্রিজ আছে। পূর্বরণাঙ্গনে রসদ সরবরাহের জন্য মণিপুর পর্যন্ত একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য ফলসাগুড়ি থেকে একটা রাস্তা বানাচ্ছিল ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী। তারা কোনো একটা মান্ধাতার আমলের ম্যাপ থেকে এই ব্রিজটার কথা জানতে পেরে তার ওপর দিয়ে রাস্তাটা নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল। অথচ আমাদের ডিপার্টমেন্ট এই ব্রিজটার রক্ষণাবেক্ষণ করা তো দূরের কথা, তার অস্তিত্বের কথাই জানত না। এখন, আমার কাজ হল, এই ব্রিজটা আদৌ আছে কি না বা থাকলে সেটা কী ধরনের আর তার কী দশা তার তত্ত্বতালাশ করা।

আমাকে প্রথমে যেতে হবে ফলসাগুড়ি চা-বাগানে। সেখানকার ম্যানেজার জন রিঙ্গার সাহেবকে বলে দেওয়া আছে। তিনি আমাকে একটা গাড়ি দেবেন। সেটা নিয়ে ভোররাত্রে বেরিয়ে আমাকে যেতে হবে পাণ্ডারবাজারে। পথে যদি কোনো ব্রিজ দেখা যায় তো ভালো, নইলে পাণ্ডারবাজারের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে তার খোঁজখবর নিতে হবে। তারপর, রাতের অন্ধকারে ফলসাগুড়িতে ফিরে আসতে হবে।

রিঙ্গার সাহেব ব্যাপারটা জানেন। তিনি তাঁর ড্রাইভারকে পাঠিয়ে খবরটা নিতে পারতেন কিন্তু সে লোকটাকে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। যে কারণে আমাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। গাড়ি চালাতে পারে অথচ বিশ্বাসযোগ্য এরকম কাউকে না কি আর আমাদের ডিপার্টমেন্টে পাওয়া যায়নি।

রিঙ্গার সাহেব যে গাড়িটা দিলেন সেটা ১৯৪০ সালের অস্টিন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, প্রায় একটা ট্যাঙ্কের মতো শক্তপোক্ত বাহন। সে-যুগে পাহাড়ি অঞ্চলে এই গাড়িটাই বেশি ব্যবহৃত হত।

রওনা হওয়ার সময়, রিঙ্গার সাহেব আমকে একটা দু-নলা বন্দুক দিলেন। আমি বন্দুক চালাতে জানি না শুনে বললেন যে তাতে কিছু যায় আসে না, হাতে বন্দুক আছে দেখলে নেটিভরা সম্ভ্রম করবে, ভয় পাবে আর ইচ্ছে থাকলেও কোনো ক্ষতি করতে সাহস পাবে না।

সেটাই হল যত গণ্ডগোলের মূল।

পাণ্ডারবাজার পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাওয়া গেল। রংকি নদীর ধার দিয়ে-দিয়েই রাস্তা। চারদিকে গভীর জঙ্গল, একপাশে রংকি, সব মিলে মনোরম সব দৃশ্য। পথে ব্রিজ-ট্রিজ কিছুই নজরে পড়ল না। বেলা বারোটা নাগাদ পাণ্ডারবাজারে গিয়ে পৌঁছলুম।

পৌঁছনো মাত্র একদল গ্রামের লোক আমার গাড়িটা ঘিরে ফেলল। সবাই মিলে চ্যাঁচাচ্ছে, কী বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাদের যে কোনো একটা ব্যাপারে ভয়ানক ক্ষোভ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষোভটা যে কীসের সেটা বোঝে কার সাধ্যি! আমি তখন বন্দুকটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম।

বন্দুক দেখে ভয় পাওয়া তো দূরস্থান, লোকগুলো অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠল। আমি তো অবাক।

যাই হোক, কিছুক্ষণ বাদে যা জানতে পারলুম, তাতে আমার আক্কেলগুড়ুম।

ঘটনাটা হচ্ছে সম্প্রতি একটা বাঘ ওই অঞ্চলে ভয়ানক অত্যাচার শুরু করেছে। মানুষ এখনও মারতে আরম্ভ করেনি বটে, কিন্তু তার বেশি দেরি নেই। এইতো কিছুদিন আগে একটি রাখাল ছেলে বনের কাছে একপাল মহিষ চরাচ্ছিল। বাঘটা হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘটা অবশ্য বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ মহিষগুলো শিং বাগিয়ে তাকে তাড়া করতেই সে ল্যাজ তুলে পালায়।

গ্রামের মোড়ল বললেন— সেদিন পালিয়েছে বলে যে ভবিষ্যতেও পালাবে, তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষকে যে আক্রমণ করেছে, সেটাই বড়ো কথা। তাই আমরা বনদপ্তরকে চিঠি দিয়েছিলুম যাতে তারা শিকারি পাঠিয়ে বাঘটার একটা ব্যবস্থা করে। আপনিই তো সেই শিকারি?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম— শিকারির কী দরকার? আপনারা তো নিজেরাই ফাঁদটাঁদ পেতে বাঘটাকে ধরে ফেলতে পারেন।

মোড়ল মাথা নেড়ে বললেন— আজ্ঞে না। তা করলে বনদপ্তরের সাহেবরা এসে আমাদের হাঁড়ির হাল করে ছাড়বে। সাহেবরা এদেশে আসবার আগে, আদ্যিকাল থেকে আমাদের বাপঠাকুরদাদারা তাই করে এসেছেন বটে, কিন্তু এখন তা আর করা যায় না। শোনেননি, এক-একটা বাঘ আড়াইশো-তিনশো করে মানুষ মারছে, আর গাঁয়ের লোকেরা মাইলের-পর-মাইল পাহাড়-জঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সাহেব শিকারির পায়ে ধরে তাকে ডেকে আনছে বাঘ মেরে তাদের বাঁচাতে? ভাগ্যিস সাহেবরা আছে, নইলে আমাদের গ্রামের-পর-গ্রাম উজাড় হয়ে কবেই বাঘের পেটে চলে যেত সবাই। কাজেই আমরা কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না। আপনাকেই বাঘ মেরে দিয়ে যেতে হবে।

আমি বললুম— মশায়, আমি শিকারি-টিকারি নই। সাহেবও নই। আমি পি ডব্লিউ ডি-র ওভারসিয়ার, এসেছি একটা ব্রিজের খোঁজে। আমার পক্ষে বাঘ মারা অসম্ভব ব্যাপার। জীবনে কোনোদিন একটা ইঁদুরও মারিনি তো বাঘ! আমি এখন ফিরে যাই। ফলসাগুড়িতে পৌঁছিয়েই একজন নির্ভেজাল সাহেব শিকারি পাঠিয়ে দেব। শুনেছি, রিঙ্গার সাহেব মস্ত শিকারি। গণ্ডা গণ্ডা বাঘ মেরেছেন। তাঁকে বললে, মহা খুশি হয়ে তিনিই হয়তো চলে আসবেন।

মোড়ল পুনরায় মাথা নেড়ে বললেন— তা হবে না। আপনি শিকারি কী শিকারি না, তা আমরা জানি না। আপনি যখন গাড়ি করে এসেছেন, আর হাতে বন্দুক রয়েছে, তখন আপনিই আমাদের সাহেব শিকারি। আপনাকেই বাঘ মারতে হবে।

আমি বললুম— কী মুশকিল! আমার গায়ের রংটা দেখেছেন? আমি কখনো সাহেব হতে পারি? আর, হাতে বন্দুক রয়েছে, তো কী হয়েছে? আমি কোনোদিন বন্দুক

চালাইনি। বন্দুকের কোন দিক দিয়ে গুলি বেরোয়, তাই ভালো করে জানি না। কাজেই আমি এখনই ফিরে যাব।

তখন ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ষণ্ডামতন লোক একটা দা হাতে এগিয়ে এল। চোখ পাকিয়ে বলল— আপনি যদি বাঘ মেরে দিয়ে না-যান, তাহলে আপনার গাড়িতে আমরা আগুন লাগিয়ে দেব আর আপনাকে কুচিকুচি করে কেটে ওই রংকিরা জলে ভাসিয়ে দেব।

আমি কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম— না, না, অত কিছু করবার কোনো দরকার নেই। বাঘ মারতে হবে তো? এ আর এমন কী বেশি কথা?

মনে মনে বললুম— এই আমার কপালে ছিল শেষপর্যন্ত।

আমার কথা শুনে সবাই একসঙ্গে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। বললুম— তা বাঘটা কোথায় আছে? কোথায় মারতে হবে?

মোড়ল বললেন— বাঘ তো আর আমাদের কাছে তার ঠিকানা রেখে যায়নি। তবে সে আসবে। রাত্রি বেলা আমরা গাঁয়ের ভেতরে একটা ছাগল বেঁধে রাখব। তাকে খেতে বাঘ আসবে। আপনি তখন তাকে গুলি করবেন। সব ব্যবস্থা আমরা করে দেব। এখন আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করুন। চাই কী দুপুরে একটু গড়িয়েও নিতে পারেন।

রাত্রি বেলা? বলে কী? আমাকে তো আজ রাত্রের মধ্যেই ফলসাগুড়ি পৌঁছতে হবে। না-হলে চাকরি নট। কিন্তু সে কথা বলি কাকে? এগুলে রামে মারবে, পেছুলে রাবণে মারবে। আপাতত প্রাণটা তো বাঁচাই। আমি আড়চোখে দা-ওয়ালা লোকটার দিকে চেয়ে বললুম— ঠিক আছে, তাই হবে।

দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা মন্দ ছিল না। কিন্তু খাওয়া কী যায়? আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে এমন ধড়ফড় করছিল যে প্রায় কিছুই সেখানে দিয়ে আর নামল না। যাই হোক, ভোজনপর্বটা শেষ হলে মোড়লের দাওয়ায় এসে বসলুম।

মোড়ল একটা ছোকরা ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বললেন— এর নাম রাজু, এ আপনাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করবে। ওর তিনকুলে কেউ নেই, পড়াশুনোয় লবডঙ্কা, দিনরাত জঙ্গলের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়। তাই জঙ্গলের হাড়হদ্দ ওর নখদর্পণে। বাঘ কখন কোন রাস্তায় চলে তা ওর চেয়ে ভালো এ-তল্লাটে কেউ জানে না। আপনার ওই রিঙ্গার সাহেব শিকার করতে এলে রাজুই ওঁকে জঙ্গলে নিয়ে যায়, মাচা বেঁধে দেয়, ঠিক জায়গায় টোপ বেঁধে রাখে। রিঙ্গার সাহেব তো পায়ের শব্দ শুনে বাঘ আসছে না হাতি আসছে তার কিছুই বুঝতে পারেন না। রাজুই ওঁকে সব বলে-টলে দেয়। কোনদিকে বন্দুক তাক করতে হবে, তাও বলে দেয়। কাজেই ও সঙ্গে থাকলে আপনার বিশেষ চিন্তা করবার দরকার নেই।



রাজুকে দেখে আমার কিন্তু চিন্তা বেড়েই গেল। এই কাটা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা রোগা ছেলেটা আমার যে কী কাজে লাগবে আমি তো বুঝে উঠতে পারলুম না। ঠিক তখনি আর-একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে মোড়লমশাই-এর পায়ের কাছে ধড়াস করে পড়ে গেল। আমি আঁতকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

ব্যাপারটা কী? জানা গেল, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। আজ সকালে ছেলেটি শহর থেকে কিনে আনা সবুজ গুঁড়ো সাবান দিয়ে রংকি নদীতে পাথরের ওপর আছড়ে-আছড়ে কাপড় কাচছিল। হঠাৎ বাঘটা হালুম করে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে অবশ্য তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তার কারণ, সাবানের ফেনায় পেছল পাথরের ওপর পড়ে পা পিছলে সেটা হুড়মুড় করে রংকির ভেতরে পড়ে যায়। কোনোরকমে সাঁতরে নদীর অন্য পাড়ে উঠে সে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যায়। তারপরে আর তাকে দেখা যায়নি।

আহত বাঘ এইভাবেই নরখাদকে পরিণত হয়। অতএব, আমি ছেলেটিকে ভবিষ্যতে সাবানের ব্যবহার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করার ব্যাপারে একটা ছোটোখাটো লেকচার দিয়ে ফেললুম। ছেলেটি হাঁ করে শুনল, কী বুঝল তা সে-ই জানে।

মোড়লমশাই বললেন— দেখেছেন তো, কী অবস্থায় আছি আমরা? বলে, নবাগত ছেলেটিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। রাজু তখন আমার পাশে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে ফিকফিক করে হাসতে শুরু করল।

মহা অস্বস্তিকর ব্যাপার। একটু বাদে বললুম— অ্যাই, হাসছিলি কেন রে?

শুনে ছেলেটা হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল— তুমি গনাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলে, তাই না? গনার চেহারাটাই ওরকম, আসলে ও কিন্তু বেজায় ভীতু। ছাগল দেখলে হাঁটু বেঁকে যায় আর দিনের বেলাতেও ভূতের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে।

আমি বেজার হয়ে বললুম— যেরকম দা হাতে তেড়ে এসেছিল, তাতে ভয় পাব না?

রাজু বলল— সে যাকগে। এখন বলোতো তোমার মতো দিশি সাহেব নয়, আসল সাহেবদের দেশে কি মেলা বাঘ? তারা শুনি, মাটিতে দাঁড়িয়ে তেড়ে আসা বাঘকে এক গুলিতে মেরে ফেলে। আমরা যারা চোদ্দোপুরুষ বাঘের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করছি, সেই আমরাই বাঘের সামনে পড়লে নড়তে পারি না। তাবড়-তাবড় সাহসী লোকও বাঘের গর্জন শুনলে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেখানে সাহেবরা এত বড়ো বাঘশিকারি হয় কী করে? ওদের নিশ্চয়ই ছোটোবেলা থেকে বাঘ মেরে-মেরে হাত পাকানো, তাই না?

বললুম— সাহেবদের দেশে বাঘের একটা ন্যাজও দেখতে পাবিনে তুই। ওখানে আছে ছোটো-ছোটো লাল-লাল শেয়াল। সেই একটা শেয়াল মারতে বিশ-পঁচিশজন সাহেব, ষাট-সত্তরটা ডালকুততা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক বাগিয়ে শিঙে ফুঁকতে-ফুঁকতে শিকার করতে যায়। তবে কি না, ওরা হলগে সাহেব। তাই আমাদের দেশে এসে ওরা মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে আর তাই নিয়ে মোটা মোটা বই লেখে। রিঙ্গার সাহেবও লিখেছেন, তবে তোর কথা কোথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। দ্যাখ, বাঘগুলোও তো আসলে নেটিভ, ভীতুর ডিম, তাই সাহেব দেখলে ওরাও নেতিয়ে পড়ে। আমাকে দেখলে তো তা হবে না, বরং হাঁউমাউ করে তেড়ে আসবে।

শুনে ছেলেটা আবার হাসতে শুরু করল। বলল— কোনো ভয় নেই। কী করতে হবে তা আমি সব বলে দেব।

পাণ্ডারবাজার গ্রামটার মাঝখানে একটা বড়ো ফাঁকা জমি, তার চারদিকে কুঁড়েঘর। রংকি নদীর ধার দিয়ে চলা মূল রাস্তা থেকে একটা পথ এসে সেই জমিতে পড়েছে। বিকেল বেলা ওই জমির ওপরে একটা খোঁটা পুঁতে মোড়লমশাই-এর একটা ছাগল বাঁধা হল। তার সামনে একগাদা পাতাসুদ্ধু ডালপালা রাখা হল। ছাগলটা পরমানন্দে শুয়ে শুয়ে সেই পাতা খেতে লাগল। সব ব্যবস্থা করে দিনের আলো থাকতে-থাকতেই যে যার ঘরে চলে গেল।

আমি মোড়লমশাই-এর দাওয়ার ওপরে বন্দুক নিয়ে বসলুম। রাজু একটা বড়োসড়ো দা দিয়ে অনেকগুলো কাঁটাঝোপ কেটে নিয়ে দাওয়ার চারদিকে পেতে দিল যাতে চট করে বাঘ এসে আমার ঘাড়ে না পড়তে পারে। পেছনের একটা দরজা খুলে রাখল যাতে বিপদ বুঝলে টুক করে ভেতরে ঢুকে পাল্লা বন্ধ করে দেওয়া যায়। এইসব কাজ শেষ করে দা হাতে আমার পাশে বসে পড়ল। বলল— সিগারেট খাবে না আর বকরবকর করবে না।

সন্ধে গড়িয়ে নিস্তব্ধ গ্রামের ওপর নিকষ কালো রাত নামল। চারদিকে কোনো শব্দ নেই, মাঝে মাঝে শুধু জঙ্গল থেকে ভেসে আসা কোনো নিশাচর পাখির কর্কশ ডাক শোনা যাচ্ছিল। দু-একটা জন্তু-জানোয়ারের ডাকও শোনা গেল তবে তারা যে কী জন্তু তা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। খানিক বাদে দ্বাদশীর চাঁদ উঠল। তাতে করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারটা কিছুটা কেটে গেল। তখন দেখি, ছাগলটা খাওয়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছে আর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

রাজু আমার কানে ফিসফিস করে বলল— বাঘ চলতে শুরু করেছে।

শুনেই আমার বুক আর পেটের মধ্যে কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠল আর তৎক্ষণাৎ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে হল। কিন্তু রাজু বসে থাকবে আর আমি পালিয়ে যাব, এতে আমার বিবেক সায় দিল না। ভাবলুম, যা হয় হবে। হয় এস্পার নয়তো ওস্পার।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ছাগলটা তারস্বরে ভ্যা ভ্যা করে ডাকতে আরম্ভ করল। সে কী ভয়ংকর ভ্যাভ্যাকার। কান ফেটে যায় আর কী! থামেই না। মোড়লমশাই-এর ছাগল তো, আর তেমনি গলা। কিছুক্ষণ বাদে আমার কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। গ্রামের ভেতর থেকেও কয়েকটা উঃ আঃ শুনতে পেলুম।

তারও কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ দেখি কালো ছায়ার মতন কী একটা গুড়ি মেরে ছাগলটার দিকে এগিয়ে চলেছে। হলদেটে চাঁদের মরা আলোয় সেটা যে কী তা বুঝতে পারলুম না। কোত্থেকে যে তার উদয় হল, তাও বোঝা গেল না। সেটা যখন ছাগলটার বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে, আমি কম্পিত হস্তে বন্দুক তুলে দড়াম করে গুলি চালিয়ে দিলুম।

তৎক্ষণাৎ অনেকগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল। ছাগলটার ভ্যাভ্যাকার বন্ধ হয়ে গেল, কালোছায়াটা আকাশ সমান লাফ দিয়ে উঠে দু-পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গ্রামের ভেতরে চলে গেল আর আমি বন্দুকের ধাক্কায় চিতপাত হয়ে পড়ে গেলুম।

ঘোর যখন কাটল, দেখি রাজু মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে আর গ্রামের ভেতর থেকে একদল লোক উত্তেজিতভাবে লাঠিসোঁটা নিয়ে মশাল-টশাল জ্বেলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হল, তাদের উদ্দেশ্য ওই লাঠিসোঁটাগুলো আমার পিঠেই প্রয়োগ করা।

ইতিমধ্যে মোড়লমশাই বেরিয়ে এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন কয়েক জন বয়স্ক গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে। আমি ততক্ষণে ধুলোটুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। মোড়ল মশাই বললেন— করেছেন কী? আপনাকে বলা হল বাঘ মারতে আর আপনি কালুয়ার ঠাকুমাকেই গুলি করে বসলেন! ভাগ্যিস গুলিটা তালগাছের মগডালে লেগেছিল। তা না-হলে যে কী হত কে জানে! রিঙ্গার সাহেব একবার বাঘ মারতে গিয়ে বনবেড়াল মেরেছিলেন। আপনি তো দেখছি রিঙ্গার সাহেবের চেয়েও ওঁচা। এখন যান, ওদের সামলান।

বয়স্ক গ্রামবাসীদের একজন বললেন— একটা ব্যাপার কিন্তু ভারি আশ্চর্য। কালুয়ার ঠাকুমা তো বাতের ব্যথায় বেঁকে গেছে, ভালো করে হাঁটতেই পারে না। সে যে অমন একটা লাফ মেরে অত জোরে দৌড়তে পারে, সেটা কোনোদিনই কল্পনাই করিনি!

আর একজন বললেন— যা বলেছেন। আর একটা কথা। কালুয়ার ঠাকুমা তো জানতুম বদ্ধ কালা. আমি যখনই আমার সাড়ে পাঁচটাকা ফেরত দিতে বলি, কিছুই শুনতে পায় না। অথচ ওই হতচ্ছাড়া ছাগলের ডাকে নাস্তানাবুদ হয়ে তার মুখ বাঁধবার জন্যে এখানে চলে এল।

এই কথার মধ্যে হঠাৎ জনতার কোলাহল বন্ধ হয়ে গেল। দেখি, সকলে স্তব্ধ হয়ে গ্রামে ঢোকার পথটার দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। আমি, রাজু, মোড়লমশাই আর বাকি সকলে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালুম। দেখা গেল, পথ দিয়ে একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্রামের দিকেই আসছে। এতগুলো লোক যে মশাল জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে তার কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই।

কে যেন আমার কানে কানে বলল— হাঁ করে দেখছেন কী? বাঘটাকে মারবেন তো।

আমি তাড়াতাড়ি আবার কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকটা তুলতেই রাজু হুংকার দিয়ে উঠল— খবরদার! এক্ষুনি বন্দুক নামাও। গুলি চালালে দা দিয়ে তোমার মুণ্ডুটা কেটে ধড় থেকে নামিয়ে দেব।

এরকম ভয়ংকর কথা শুনে আমি তক্ষুনি বন্দুক নামিয়ে নিলুম। রাজু তখন রাখাল ছেলেটা আর কাপড়কাচা ছেলেটাকে চিৎকার করে ডেকে বলল— তোরা কী গাধা না কি রে? পিকপিক কে চিনতে পারলি না? ওটা তো পিকপিক। তোদের সঙ্গে খেলতে এসেছিল!

বলামাত্র তিনজনে তিরবেগে ছুটে বাঘটার কাছে চলে গেল। তারপরে যা শুরু হল। তিনটে ছেলে আর বাঘটা মিলে জড়াজড়ি করে মাটির ওপরে গড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে গ্রামের লোকেরা মাটিতে মশালগুলো পুঁতে লাঠিসোঁটা ছুড়ে ফেলে দৌড়ে গিয়ে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।।

মোড়লমশাইও যাচ্ছিলেন। আমি ওঁর হাত ধরে আটকে জিজ্ঞাসা করলুম— এসব কী হচ্ছে বলুন তো?

মোড়লমশাই বললেন— আরে, ওটাতো আমাদের চেনা বাঘ। ওর জন্মের কয়েক দিন বাদেই ওর মা এক সাহেবের গুলিতে মারা যায়। সে আজ থেকে বছরছয়েক আগেকার ঘটনা। ও তখন খাবারের সন্ধানে আমাদের এই গাঁয়ে এসে ঢোকে। ছোট্ট একটা বেড়ালছানার মতো বাচ্চা। রাজুর তখন বছরদশেক বয়েস। সে ওকে পালতে শুরু করে। ওর তখন গলা দিয়ে পিকপিক করে আওয়াজ বেরুত, তাই ওর নাম রাখা হয়েছিল পিকপিক। ভারি মজার ছিল, সব্বার সঙ্গে খেলে বেড়াত। যখন বছরতিনেকের হল, তখন রাজু ওকে কাঁদতে কাঁদতে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এল। তারপর যে কোথায় চলে গিয়েছিল জানি না। আজ আবার ফিরে এসেছে।

আমি বললুম— ওটা কিন্তু আহত বাঘ। দেখছেন না খোঁড়াচ্ছে? আহত বাঘ কিন্তু ভীষণ মারাত্মক।

—দূর মশাই! মারাত্মক না কচু। আজ সকালে আছাড় খেয়েছিল, তাই একটু খোঁড়াচ্ছে।

—ওটা যে পিকপিকই তা বুঝলেন কী করে? ওর গায়ে কী নাম লেখা আছে? অন্য বাঘও তো হতে পারে।

—শোনো কথা। আপনি তো দেখছি রিঙ্গার সাহেবের চেয়েও... সে যাকগে। আপনার গায়ে কী নাম লেখা আছে না কি? তাহলে আপনার গিন্নি আপনাকে চেনেন কী করে? আমরা বনের মধ্যে থাকি। বাঘ তো দূরের কথা, আমরা প্রত্যেকটা কাঠবিড়ালীকে আলাদা আলাদা করে চিনি। আপনার যেমন নাক-চোখ-মুখ-কান আছে, ওদেরও তাই আছে, বুঝলেন? রাজুর চোখের জোর খুব বেশি তাই এত দূর থেকে পিকপিককে চিনতে পেরেছে। ও আর একটু কাছে এলে আমরাও পারতুম।

আমি বললুম— ভাগ্যিস গুলিটা চালাইনি। চালালে যে কী হত, কে জানে।

মোড়ল বললেন— কিছুই হত না। বড়োজোর, ওই বাদামগাছটার ওপরে ঘুমিয়ে থাকা একটা বাঁদরের ন্যাজ ফুটো হয়ে যেত। তার বেশি কিছু নয়। এখন যাই, আমিও পিকপিককে আদর করে আসি।

মোড়লমশাই চলে গেলেন। হলদে চাঁদের মরা আলোয় ফাঁকা জমির ওপরে আমি আর ছাগলটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।



সকাল বেলা জানলা খুলে যথারীতি মুখ বেঁকালেন ইন্দ্রজিৎবাবু। গত কয়েক দিন ধরেই এই চলেছে। ইন্দ্রজিৎবাবুর উষ্মার কারণ তাঁর জানলার ঠিক সামনে, রাস্তার উলটো দিকে, একটা অতিকায় বিজ্ঞাপন। তাতে আগামী মাসের সাত তারিখে কলকাতার মহানগর রঙ্গমঞ্চে ফাল্গুন মিত্র আর গগন চৌধুরির যুগ্ম সংগীতের ফেনিল সুধা পান করবার জন্যে কলকাতাবাসীদের সাদর আহ্বান জানানো হয়েছে, প্রবেশমূল্য মাত্র দশ হাজার টাকা।

বিজ্ঞাপনটা দেখলেই ইন্দ্রজিৎবাবুর ছেলেবেলায় তাঁর স্কুলের সংস্কৃত ক্লাসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রায়ই পণ্ডিতমশায় বলতেন, 'ব্যাকরণে বলেছে ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ। অর্থাৎ, ফাল্গুন, গগন আর ফেনে একমাত্র বর্বরেরাই মূর্ধন্য ণ বসায়।'

এই বিজ্ঞাপনটায় সেই তিনটে শব্দই বিরাট আকারে উপস্থিত। কাজেই, প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্মা পণ্ডিতমশায়ের কথা যে ইন্দ্রজিৎবাবুর মনে পড়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

পল্লবী এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন— কী দেখছ বাইরে?

ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন— দেখছি না, ভাবছি। আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই বলতেন যে আমাদের বর্বর হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই। আমরা কী এতদিনে বর্বর হয়ে গেছি না আরও একটু বাকি আছে— সে কথাই ভাবছিলাম।

পল্লবী ঠক করে কাপটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন— রিটায়ার করেছ বলে কী আর কোনে কাজ নেই তোমার? সকাল থেকে এইসব হিজিবিজি চিন্তা না-করে, সেই যে সময়সরণি না কোথায় যাবে বলছ কয়েক দিন ধরে, সেখানেই যাও না।

—ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। বিজ্ঞানবিক্ষণ কেন্দ্রে সময়সরণি বলে একটা টাইমমেশিন বসিয়েছে। তাতে চড়ে অতীত থেকে ঘুরে আসা যায়। কলকাতায় এই প্রথম। ভাবছি, ব্যাপারটা কী সেটা একবার দেখা দরকার। তুমিও যাবে না কি?

—কক্ষনো না। আমি এই বর্তমানেই ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি নিয়ে বেশ আছি। তোমাদের ওই অতীতে গিয়ে যদি আটকে যাই আর ফিরে আসতে না-পারি, তখন কী হবে? কোনো দরকার নেই। তোমার যেতে হয়, তুমি যাও। আর, আসার সময় কিছু মিষ্টি কিনে এন। কাল মেয়ে-জামাই আসছে, মনে আছে তো?

—কিন্তু অতীত থেকে তো কিছু আনা যায় না বলে শুনেছি।

—অতীত থেকে তোমাকে কে আনতে বলেছে? বর্তমানেই রাস্তার মোড়ে যে দোকানটা আছে, ওখান থেকে আনলেই হবে। মনে থাকবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে থাকবে।

—কিচ্ছু বলা যায় না। অতীত থেকে ঘুরে এসে আমাদের কথাই মনে থাকবে না হয়তো।

বিজ্ঞানবিক্ষণ কেন্দ্র ইন্দ্রজিৎবাবুর বাড়ির থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে পৌঁছে ইন্দ্রজিৎবাবু দেখলেন কেন্দ্র তখন সবে খুলেছে। লোকজন বেশি নেই। সময়সরণির ঘরে তখনও কোনো দর্শক আসেননি, ইন্দ্রজিৎবাবুই প্রথম।

নীলরঙের কাপড়ের ওপরে ছোটো ছোটো তারা বসানো ইউনিফর্ম পরে একজন মহিলা দর্শকদের আপ্যায়ন করবার জন্য বসে ছিলেন। তিনি ইন্দ্রজিৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন— কোথায় যেতে চান?

ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন— কীরকম খরচ পড়বে তার ওপরে সেটা নির্ভর করছে।

—যদি কাছেপিঠে যেতে চান, মানে ধরুন এক-শো কী দু-শো বছর পেছনে, তবে খরচা সামান্যই পড়বে। যত বেশি দূরে যাবেন, খরচা তাতেই বেড়ে যাবে।

—সবাই কী করেন? ধারেকাছেই যান?

—আবার কী? কেউই খুব একটা পেছনে যেতে চান না। শ-দুয়েক বছরের মধ্যে গেলেই আপনি স্বশরীরে রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ বা ১৫ আগস্টের উৎসব দেখতে পাবেন। আর একটু পেছলে রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা ওয়ায়েন হেস্টিংসকে দেখবেন। তার থেকে একটু বেশি পেছনে গেলে আর তেমন কিছু পাবেন না। এই অঞ্চলটা তো তখন জঙ্গল, কলকাতা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে। সেই সময় এখানে বাঘ-টাঘ ঘুরে বেড়াত। সে সব দেখতে আর কে চায় বলুন?

—যদি আরও পেছনে যাই?

—আরও পেছনে? আপনি কি সৃষ্টির গোড়ায় যেতে চান না কি? বিগ ব্যাং? অতদূর আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না, সেটা গোড়াতেই বলে দিচ্ছি। আমাদের রেঞ্জ অতটা নয়।

—সবচেয়ে বেশি কতদূর যাওয়া যাবে?

—সবচেয়ে দূরে। আমাদের রেঞ্জের সবচেয়ে পেছনে আছে মেসোজোয়িক যুগ। সেখানে যাবেন না কি?

ইন্দ্রজিৎবাবু কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন— মেসোজয়িক যুগ? তখন প্রথম পৃথিবীতে ফুল ফুটেছিল। একদিকে দেখা দিয়েছিল অতিকায় সরীসৃপের দল— ব্রন্টোসরাস, টাইরানোসরাস, ডিপলোডকাস, ট্রাইসেরাটপস, প্টেরোডক্টিল। আবার এই যুগেই তাদের দানবিক অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গিয়েছিল। অন্যদিকে খুব ছোটো ছোটো পোকার আবির্ভাব হয়েছিল। তারা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছিল।

—ঠিক বলেছেন। যাবেন না কি ওই সব দানবাকৃতি সরিসৃপ আর ছোটো ছোটো পোকা দেখতে?

—যাওয়া যাবে? ইন্দ্রজিৎবাবুর গলাটা কেঁপে গেল।

—তা যাবে। তবে ঝামেলা আছে। প্রথমত খরচ খুব বেশি, দ্বিতীয়ত অত দূরের যুগে থাকবার সময় খুব কম, আর তৃতীয়ত আমাদের মনস্তত্ত্ববিদ আপনাকে পরীক্ষা করে আপনি মানসিকভাবে সুস্থ বললে তবেই আপনাকে যেতে দেওয়া হবে।

—সে আবার কী? প্রথম দুটো তো বুঝলুম, শেষ নিয়মটা কেন?

—তার কারণ, জীবনের বিবর্তনে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না-হয়, সেটা আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই। বুঝিয়ে বলি। পৃথিবীর বুকে যখন থেকে প্রাণ এসেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবজগতের পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ একের পর এক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই পরিবর্তগুলো পশুপাখির আলাদা, গাছপালার আলাদা বা কীটপতঙ্গের আলাদা— এরকম নয়। এদের প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে। এই যোগসূত্রটা যদি কোথাও ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিবর্তন চলতে থাকলেও সেটা একটু পালটে যাবে। দু-পাঁচশো বছরে তার ফলটা হয়তো বোঝা যাবে না, কিন্তু পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ বছরে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হবে।

যেমন ধরুন, আজ থেকে এক লক্ষ বছর পেছনে চলে গিয়ে আপনি একটা পাখি মারলেন যেটার সে সময় মরবার কথা নয়। সেটা বেঁচে থাকলে যা হত, এবার তা হবে না। কিছু অন্যরকম হবে। আবার তার প্রভাব পড়বে অন্য প্রাণীদের ওপর। ফলে, আপনি যখন এক লক্ষ বছর পেরিয়ে ফিরে আসবেন বর্তমান সময়ে, তখন দেখবেন আপনার চারপাশে কোথাও না-কোথাও কিছু না-কিছু পালটে গেছে। আপনার আশেপাশে যারা আছে, তারা সেটা বুঝতে পারবে না, কারণ আপনার বিবর্তন আর বাকি সকলের বিবর্তন একরকম হয়নি।

ইন্দ্রজিৎবাবু একটু উদবিগ্ন হয়ে বললেন— সেটা কীরকম হবে?

—সেটা তো সঠিক বলা যায় না। বিবর্তন তো কোনো ধরাবাঁধা পথ দিয়ে চলে না। এটা কীভাবে হয়, তা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। হয়তো, আপনি ফিরে এসে দেখলেন মানুষের একটা কান বড়ো আর একটা কান ছোটো হয়ে গিয়েছে। আপনার একই মাপের দুটো কান দেখে সবাই হাসাহাসি করছে। অথবা দেখলেন যে গোরুর ডাক পালটে গেছে। তারা কোঁকরকোঁ করছে আর মুগরিরা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। তাতে একমাত্র আপনিই আশ্চর্য হচ্ছেন, আর কেউই হচ্ছে না। কাজেই, বিবর্তনের ধারা অপরিবর্তিত রেখে এইসব হাঁসজারু মার্কা গণ্ডগোল এড়ানোর জন্যেই আমাদের এই সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। আপনি যদি বোকা বা পাগল বা একগুঁয়ে হন তখন আপনাকে আমরা যেতে দেব না; কোটি টাকা দিলেও না। আমাদের সব উপদেশ আপনাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে, মানতে হবে। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া চলবে না।

এই যে আপনি মেসোজোয়িক যুগে যেতে চাইছেন, সেখানে গিয়ে একটা বাচ্চা ট্রাইসেরাটপস দেখে হয়তো আপনার খুব পছন্দ হল। ভাবলেন, কী মিষ্টি দেখতে! এটাকে নিয়ে যাই, পুষব। কেউ টের পাবে না, কিচ্ছু হবে না। তা করলে চলবে না। আমাদের সমস্ত উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার মতো স্বভাব আর মনের জোর যদি আপনার থাকে, তাহলেই আপনি যেতে পারবেন।

ইন্দ্রজিৎবাবু একটু চিন্তা করে বললেন— ঠিক আছে। আমি যাব। এই আমার কার্ড। আপনি আমার ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে যা করবার করে ফেলুন। ইতিমধ্যে আপনাদের মনস্তত্ত্ববিদদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যা হবার হয়ে যাক।

সময়সরণি যন্ত্রটা একটা চকচকে ধাতুর তৈরি ছোটো ঘরের মতো। ভেতরে নানারকমের যন্ত্রপাতি, তাতে লাল নীল সবুজ আলো জ্বলছে নিভছে। ঘরের মাঝখানে একটা মস্ত গদিমোড়া চেয়ার, অনেকটা যেমন সেলুনে দেখা যায় তেমনি। ঘরের একপাশে ভেতরে ঢোকার ধাতব দরজা। জানলা-টানলা কিছু নেই।

একজন আপ্যায়ন বিভাগের মহিলার মতোই ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোক ইন্দ্রজিৎবাবুকে নিয়ে এসে চেয়ার বসিয়ে দিলেন। বললেন— যা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনুন। আমরা সময়সরণিকে মেসোজোয়িক যুগের শেষদিকের কোনো এক সময়ে সেট করে দিয়েছি। আপনি এই সবুজ বোতামটা টিপলে চোখের নিমেষে সেখানে পৌঁছে যাবেন। এই হলদে আলোটা জ্বললে বুঝবেন যে আপনি পৌঁছে গেছেন তখন আপনি চেয়ার ছেড়ে উঠবেন আর সঙ্গেসঙ্গে এই দরজাটা খুলে যাবে। আপনি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দরজার তলা থেকে একটা তীব্র নীল আলোর এক মিটার চওড়া পথ সামনের দিকে প্রায় তিরিশ মিটার পর্যন্ত চলে যাবে। এই আলোটা গাছপালা বাড়িঘর সব কিছু ভেদ করে চলে যেতে পারে। আপনি এই আলোর পথ দিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে যাবেন। এই পথের ওপরে থাকলে কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না বা স্পর্শ করতে পারবে না, আর আপনিও এই পথের ওপরে কোনো কঠিন বস্তুর বাধা থাকলেও তা ভেদ করে চলে যেতে পারবেন।

ভুলেও এই পথের বাইরে যাবেন না। গেলে আপনার নিরাপত্তার কোনো দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। আপনি ওখানে থাকবার সময় পাবেন দশ মিনিট। তার মধ্যে আপনাকে সময়সারণিতে ফিরে আসতে হবে। আট মিনিট পার হলে দরজার ওপরে একটা ঘণ্টা বাজবে আর একটা লাল আলো জ্বলে উঠবে যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে ফেরার সময় হয়েছে। সাড়ে দশ মিনিট বাদে নীল আলোর পথটা নিভে যাবে। কাজেই, সে ব্যাপারে খুব সাবধান।

সময়সারণিতে ফিরে চেয়ারে বসে আবার সবুজ বোতামটা টিপবেন। দরজা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। আর, তৎক্ষণাৎ আপনি বর্তমান সময়ে পৌঁছে যাবেন।... সব বুঝতে পেরেছেন তো? কোনো প্রশ্ন আছে?

ইন্দ্রজিৎবাবু মাথা নাড়লেন।

দরজার বাইরে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। এ কী দেখছেন? কোথায় কলকাতা শহর? তার জায়গায় বিশাল বিশাল মহীরুহের গভীর জঙ্গল, তাদের ডালপালায় মাথার ওপরে আকাশ প্রায় দেখাই যায় না। গাছের নীচে এক মানুষ উঁচু নিশ্চিদ্র ঝোপঝাড়। যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকার করে রেখেছে ঘন মেঘের স্তূপ, বৃষ্টি পড়ছে অনবরত। মাঝে মাঝে তীব্র চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের আলো আর কান ফাটানো মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে— সেগুলো শুনলে আনন্দ হয় না, বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। কখনো

কখনো আশেপাশে ধুপ ধুপ করে শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ভীষণ ভারী কিছু চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। তাঁর পায়ের তলায় নীল পথটা আলোর বটে তবে তার ওপর দিয়ে হাঁটা যায়। তিনি দেখলেন যে পথটা সত্যি সত্যিই গাছপালা বা মাটির ঢিবি ভেদ করে চলে গেছে। বৃষ্টি যে পড়ছে তা তাঁর গায়ে লাগছে না। আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে যে আশেপাশে জীবন্ত কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের পক্ষে তাঁর কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে যে তারা সময়সরণি বা ইন্দ্রজিৎবাবুকে দেখতেই পাচ্ছে না। দেখতে পেলে এতক্ষণে সামনে চলে আসত।

বেশ খোশমেজাতেই সামনে এগিয়ে চললেন ইন্দ্রজিৎবাবু আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন— কোথায় বাবা ব্রন্টসরাস, একবার দেখা দে বাবা! আর, টাইরানোসরাস রেক্স ব্যাটাচ্ছলেই বা গেল কোথায়? এত টাকাপয়সা খরচ করে এলুম, তোদের না দেখেই চলে যাব না কি? আয় বাবারা।

হঠাৎ একজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। তাঁর পাশে ঝোপের ভেতরে ফুটে রয়েছে একগুচ্ছ ফুল। প্রায় দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের গাঢ় কমলারঙের ফুল, পাপড়ির ওপরে বেগুনি রঙের ছিটে। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ইন্দ্রজিৎবাবু।

—পৃথিবীর প্রথম ফুল! অসাধারণ! বিড়বিড় করে বললেন ইন্দ্রজিৎবাবু। তোলা তো যাবে না, তাহলে আবার কোথায় কী গণ্ডগোল হয়ে যাবে কে জানে! কিন্তু প্রথম ফুলের সুগন্ধ না-শুঁকে ফিরে যাব? গন্ধ শুঁকতে তা কোনো বাধা নেই। মুখটা না-হয় রুমাল বেঁধে ঢেকে রাখব যাতে কোনো পোকামাকড় নাকে-মুখে ঢুকতে না-পারে।

সেইভাবে মুখ ঢেকে ইন্দ্রজিৎবাবু আলোর রাস্তা থেকে গলা বাড়িয়ে দিলেন ফুলগাছের দিকে। কোথায় সুগন্ধ? একটা বিকট পচা দুর্গন্ধে চমকে মুখ তুলে ইন্দ্রজিৎবাবু দেখলেন যে তাঁর থেকে কুড়ি মিটার দূরে দুটো অতিকায় গাছের ফাঁক দিয়ে প্রায় চারতলা বাড়ির উচ্চতা থেকে একজোড়া নৃশংস ক্রুর চোখ তাঁর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। সে তো ইন্দ্রজিৎবাবুর শরীরটা দেখতে পাচ্ছে না তাই বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করছে যে দেহহীন মুণ্ডুটা খাদ্যবস্তু কি না। তার এবড়ো-খেবড়ো দাঁতওয়ালা প্রকাণ্ড কদাকার মুখের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

টাইরানোসরাস রেক্স! বেশিক্ষণ অবাক হয়ে চিন্তা করবার মতো মগজের ক্ষমতা এর নেই। এক্ষুনি আক্রমণ করবে। ভাবলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথাটা ঢুকিয়ে আনলেন আলোর পথের ভেতরে। ঠিক সেই মুহূর্তে টাইরানোসরাসটার প্রকাণ্ড বিভৎস মুখটা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ফুলগাছটার ওপরে এসে পড়ল। ভয়ংকর আতঙ্কে দিশেহারা ইন্দ্রজিৎবাবু লাফিয়ে উঠে ধপাস করে পড়ে গেলেন। তারপর কোনোরকমে নিজেকে অজ্ঞান হতে না-দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে সময়সরণির দিকে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলেন।

দরজার কাছে এসে পেছন ফিরে দেখলেন সেই চারতলা সমান উঁচু ভয়ংকর প্রাণীটা তার পেছনের পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর তার প্রকাণ্ড ল্যাজটা এপাশে-ওপাশে আছড়াচ্ছে। তার পায়ের নীচে মরে পড়ে আছে একটা রঙিন বড়োসড়ো প্রজাপতি। সে বেচারি বোধ হয় ওই ফুলটার মধু খাওয়ার লোভেই ওখানে এসেছিল।

সময়সরণির চেয়ারে বসে ইন্দ্রজিৎবাবু ভাবলেন, প্রজাপতিটা যে মরল, তাতে কি বিবর্তনে কোনো অদলবদল হবে? প্রজাপতিটাকে তো আমি মারিনি, মেরেছে ওই ব্যাটা

দাঁত-না-মাজা টাইরানোসরাস রেক্স। তবে কি না, প্রজাপতিটার তখন মরবার কথা ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে না-হোক, পরোক্ষভাবে আমিই কিন্তু তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ওই একটা তুচ্ছ প্রজাপতির জন্যে কী আর এমন মহামারি পরিবর্তন হবে?



বিজ্ঞানবিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে ভয়ে ভয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে ইন্দ্রজিৎবাবু মিষ্টির দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। লোকজন, গাড়িঘোড়া, বাড়িঘর, কোথাও কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ল না।

বাড়ি ফিরে মিষ্টির বাক্সটা পল্লবীর হাতে দিলেন ইন্দ্রজিৎবাবু।

পল্লবী জিজ্ঞেস করলেন— সময়সরণিতে গিয়েছিলে না কি? কীরকম অভিজ্ঞতা হল?

ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন— আর বোলো না। সে অতি ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। শুনবে?

—তুমি ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসো। আমি চা নিয়ে আসছি। তা খেতে খেতে শুনব।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ইন্দ্রজিৎবাবু তাঁর ঘরে ঢুকে জানলাটা খুলে দিলেন। সামনে বিশাল বিজ্ঞাপনটার দিকে নজর পড়ল। অমনি ওঁর গান বন্ধ হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর বসে পড়লেন।

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল আগামী মাসের সাত তারিখে কলকাতার মহানগর রঙ্গমঞ্চে ফাল্গুণ মিত্র আর গগণ চৌধুরির যুগ্মসংগীতের ফেণিল সুধা পান করবার জন্যে কলকাতাবাসীদের সাদর আহ্বান জানানো হয়েছে, প্রবেশমূল্য দশ হাজার টাকা।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন পল্লবী। বললেন— বলো, কী অভিজ্ঞতা হল তোমার?

ইন্দ্রজিৎবাবু মাথা নীচু করে বিছানার ওপর বসে ছিলেন। আচ্ছন্নের মতো বললেন—না, সে তেমন বলবার মতো কিছু নয়। আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে কী সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে?

—সংস্কৃত ব্যাকরণ? সংস্কৃত ব্যাকরণ দিয়ে কী করবে?

—কিছু না। দেখব যে ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ সূত্রটা এখনও সেখানে আছে, না আমারই জন্যে আজ তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে

ডাক্তার গুপ্তের বরাত



ডাক্তার শ্রীকান্ত গুপ্ত মুম্বই-এর লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। কলকাতাতেও তাঁর নাম অনেকেই জানেন। বান্দ্রার এক সমৃদ্ধ পাড়ায় তাঁর নার্সিং হোম আর চেম্বার। তাঁকে দেখাতে গেলে এক মাসের আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না।

এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মুম্বই থেকে কলকাতায় ফেরার পথে, প্লেনে। আমি কোম্পানির কাজে পুনেতে গিয়েছিলুম। ফিরছিলুম সেখান থেকে। আমার পাশেই সিট পড়েছিল ডাক্তার গুপ্তের।

আমি তো গোড়াতে বুঝতেই পারিনি যে আমার সহযাত্রীটি একজন অতবড়ো বিখ্যাত ডাক্তার। একেবারে নিরহংকার, সাদাসিধে ভদ্রলোক আর খুব গল্পে। সিটে বসতে না-বসতেই আড্ডা জুড়ে দিলেন। ভাবলুম, ভালোই হল। আড়াই ঘণ্টার পথ, সময়টা ভালোই কাটবে।

ডাক্তার গুপ্তের পরিচয় পাবার পর আমি একটু সংকুচিতই হয়েছিলুম। উনি দেখলুম নির্বিকার। উলটে আমাকেই বললেন— গল্প করার সময় তো পাইনে। তাই এই অবসরগুলো সেই ফাঁক পূরণের কাজে লাগাই। আপনি বিরক্ত হবেন হয়তো।

আমি তো লজ্জায় মরি। তারপর একথা সেকথায় জানতে পারলুম যে ভদ্রলোক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছেন। জিজ্ঞেস করলুম, মুম্বইতে গেলেন কবে? পশ্চিমবাংলা ছাড়লেনই বা কেন?

তখন ডাক্তার গুপ্ত বেশ জমিয়ে সেই কাহিনি শোনালেন আমাকে।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন শ্রীকান্ত। তাঁর বাবা তার বছর দুয়েক আগে মারা যান। তাঁর সামান্য পেনশনে সংসার চলত। তার ফলে যদিও পরীক্ষায় তাঁর ফল অত্যন্ত ভালো হয়েছিল, বিলেতে গিয়ে উচ্চতর শিক্ষার আশা ত্যাগ করে তাঁকে সরকারি চাকরিতে ঢুকে পড়তে হল।

তাঁর প্রথম পোস্টিং হল বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তখন আর তার চেয়ে উচ্চতর কোনো চাকরির সন্ধান করার উপায় বা সামর্থ্য ছিল না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ামাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চাকরিতে যোগ দিলেন।

সেটাই কাল হল। এরপর দশ বছর ধরে বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি বা পুরুলিয়ার এক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অন্য এক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলি হতে লাগলেন। এমনকী কোনো মহকুমা শহরের হাসপাতালেও তাঁর স্থান হল না। তিনি দেখলেন পরীক্ষায় তাঁর চেয়ে অনেক নীচে স্থান পাওয়া তাঁর সহপাঠীরা বদলি হয়ে কলকাতায় চলে গেল অথচ তিনি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন।

এরকম হবার অবশ্য কারণ ছিল।

প্রথমত, তাঁর মামার জোর বলে কিছু ছিল না। এমন কোনো নিকটাত্মীয় ছিলেন না যিনি তাঁর হয়ে সরকারি দপ্তরে তদ্বির করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, কোনো রাজনৈতিক দলে নাম লেখানোর কোনো ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। একাধিক বার তাঁর কাছে টোপ ফেলা হয়েছে বা কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রস্তাব এসেছে, তিনি সাড়া দেননি।

তৃতীয়ত, তাঁর ব্যক্তিত্বটা এরকম নয় যে টেবিল চাপড়ে, চিৎকার করে বা ভয় দেখিয়ে নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করে নেবেন। তাঁর রুচিবোধেও এর সায় ছিল না।

ফলে, যা হবার তাই হল। ডাক্তার শ্রীকান্ত গুপ্ত এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দশ বছর ধরে অনেক চিঠিপত্র লিখলেন, অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন কিন্তু সরকারি দপ্তর অনড় হয়ে রইল।

এই দশ বছরে ডাক্তার গুপ্তের মনে একটা ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে উঠল। তাঁর মনে হতে লাগল, উচ্চতর শিক্ষা তো পরেকার কথা, আপাতত যেটুকু শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তাও আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে ভুলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে তাঁর ভেতরে একটা গভীর নৈরাশ্য দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

এইসময় একমাসের ছুটি নিয়ে ডাক্তার গুপ্ত মুম্বই গেলেন বেড়াতে। সেখানে তাঁর এক দূরসম্পর্কের কাকা থাকতেন। তাঁর বাড়িতেই উঠলেন। সেই ভদ্রলোক থাকতেন ক্যান্ডিভিলি বলে একটা জায়গায়। মুম্বই শহরের কেন্দ্র থেকে ট্রেনে করে সেখানে যেতে লাগে এক ঘণ্টার ওপর।

কাকার কাছে তাঁর দুঃখের কথা বললেন ডাক্তার গুপ্ত। কাকা বললেন, তুই এক কাজ কর। চার্চগেট স্টেশনের কাছে আমার এক বন্ধুর একটা দোকান আছে। তার গুদোমঘরটা কিছুদিন হল খালি পড়ে আছে। বেড়ানো আপাতত বন্ধ রেখে তুই সেখানে নেমপ্লেট ঝুলিয়ে চেম্বার খুলে বোস। বাঙালি ডাক্তার দেখলে রুগিপত্র আসতে পারে। এক মাস চেষ্টা করে দ্যাখ। যদি পসার হয়ে যায় তবে আর ফিরে যাস না, এখানেই থেকে যাস। তখন যত পারিস বেড়াস।

সেইরকমই করা হল। পরের দিনই চেম্বার খোলা হল। ডাক্তার গুপ্তের কাকার বন্ধু শিবেন্দ্র দেশাই অসাধ্যসাধন করলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘরটা পরিষ্কার হয়ে গেল, দরজা জানলায় পর্দা লাগল। একটা ছোটো টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার আর একটা লম্বা টেবিল পর্যন্ত পাতা হয়ে গেল।

সবই হল কিন্তু রুগির সন্ধান মিলল না। ডাক্তার গুপ্ত সকাল আটটায় চেম্বার খোলেন, সারাদিন গালে হাত দিয়ে টেবিলে বসে থাকেন আর সামনে দিনকর শা মার্গ দিয়ে লোকজনের যাতায়াত দেখেন। সবাই সুস্থ সবল, গটমট করে হেঁটে যায়। ডাক্তার গুপ্ত দেখেন আর মনে মনে তাদের পিণ্ডি চটকান। মাঝে মাঝে দলছুট এক-আধজন আসে।

তাদের অনেকক্ষণ ধরে দেখেন। মাথা ধরার রুগি এলে তাকে লম্বা টেবিলের ওপর ফেলে তার আগাপাস্তলা পরীক্ষা করেন। কিছুটা সময় তো কাটে। রাত আটটায় দোকান বন্ধ করেন। কান্ডিভিলি পৌঁছতে রাত দশটা।

এই চলে দিনের পর দিন। মনে মনে হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন ডাক্তার গুপ্ত। তাঁর চেম্বারের ঠিক উলটো দিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে দুটো মুশকো দরওয়ান, ভেতরে সুন্দর ফুলের বাগান। তিনি ওই দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

এমনি করে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেল। সেদিন রাত আটটায় দরজা তালা দিয়ে পেছন ফিরে ডাক্তার গুপ্ত দেখেন সামনের বাড়ির দুই দরোওয়ান লাঠি হাতে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা বলল— মাইজি আপকো বুলাতি হ্যায়।

সর্বনাশ করেছে! মাইজি আবার বুলাতি কেনরে বাবা! ডাক্তার গুপ্ত মনে মনে ভাবলেন, কই আমি তো কোনোরকম বেচাল ব্যবহার করিনি! আমি যে মাঝে মাঝে ওই বাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, তাতেই নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা ক্ষেপে গেছেন। তখন ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে যদি কেটে পুঁতেও রাখেন, কাকপক্ষীও টের পাবে না। কিন্তু, যেতেই হবে। পালাবার কোনো রাস্তাই নেই।

কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন ডাক্তার গুপ্ত। নেমপ্লেটে দেখলেন শেঠ হরিরাম মীরচান্দানীর নাম। শ্রীমতী মীরচান্দানী পর্দানশীন মহিলা। নীচের তলায় পর্দার আড়াল থেকে কথা বললেন। গলা শুনে বোঝা গেল ভদ্রমহিলার অনেক বয়েস।

ভদ্রমহিলা বললেন, তুমি আমার স্বামীকে একবার দেখবে বাবা? গত দশ-এগারো মাস ধরে কী এক অসুখে ভুগছেন। কোনো ডাক্তার সারাতে পারছে না। এখানকার হেন বড়ো স্পেশালিস্ট নেই যাঁকে ডাকা হয়নি। তাঁদের কেউ কিচ্ছু করতে পারেননি। ইদানীং উনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। আমি লক্ষ করেছি কিছুদিন আগে তুমি আমাদের বাড়ির সামনে চেম্বার খুলেছ। তোমার মুখ দেখে আমার কী রকম মনে হয়েছে যে ওঁকে যদি কেউ সুস্থ করে তুলতে পারে তো সে তুমি। আমি আমার স্বামীকে বলেছি যে বাচ্চাকে একবার ডাকি। উনি রাজি হয়েছেন। তুমি ওঁকে একটু দ্যাখো, বাবা।

ভদ্রমহিলার কথা শুনে ডাক্তার গুপ্ত আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বললেন— বড়ো বড়ো স্পেশালিস্টরা যা পারেননি, সে কি আমি পারব? তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই দেখব। আর রুগি পরীক্ষা করবার আগে আমি একবার ওঁর অসুখের ফাইলটা দেখতে চাই।

একটু বাদে একজন লোক ফাইলটা দিয়ে গেল। ফাইল দেখে তো ডাক্তার গুপ্তের চক্ষুস্থির। মুম্বই-এর তাবড় তাবড় ডাক্তাররা হেন অসুখ নেই যা নির্ণয় করেননি। তাদের মধ্যে এমন সব অসুখও আছে যাদের নামই কোনোদিন শোনেননি ডাক্তার গুপ্ত।

কী আর করেন! কম্পিত পদে রুগির ঘরে গেলেন ডাক্তার গুপ্ত। শেঠ হরিরাম মীরচান্দানীর বয়েস ষাটের উপর। কঙ্কালসার শরীর, গাল ভাঙা, চোখগুলো গর্তে বসা, পেটটা কেবল উঁচু হয়ে রয়েছে, বাকি সবটা বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে।



রুগিকে পরীক্ষা করে ডাক্তার গুপ্তের মনে হল রোগটি ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। দশ বছর পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, আর কিছু না-হোক ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলো বিলক্ষণ চেনেন। ম্যালেরিয়া আর আমাশা— এদের যতরকম বিভিন্ন রূপ আর ব্যতিক্রম আছে, তাদের সবগুলোই তাঁর পরিচিত। মুম্বই শহরে এই অসুখটা বড়ো একটা হয় না। কাজেই, এখানকার ডাক্তারদের একে চিনতে অসুবিধে হবারই কথা। বিশেষত বিশেষজ্ঞদের।

ডাক্তার গুপ্তের ব্যাগে তখনও একগাদা কুইনিনের বড়ি পড়ে ছিল। তা থেকে পাঁচদিনের মতো বড়ি বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রেখে পর্দার আড়ালে মিসেস মীরচান্দানীকে সম্বোধন করে বললেন— এই পাঁচ দিনের মতো ওষুধ রেখে গেলুম। কীভাবে খেতে হবে আর পথ্য কী হবে তা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছি। যদি কিছু হয় তো এতেই হবে। নইলে আমার আর কিছু করবার নেই।

দু-দিন পরে ডাক্তার গুপ্ত যথারীতি রাত আটটায় চেম্বারের দরজায় তালা লাগিয়ে পেছন ফিরে দেখেন সেই দুই মুশকো দরওয়ান দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা বলল— মাইজি আপকো আভি বুলাতি হ্যায়।

এবার আবার ‘আভি’! আর রক্ষে নেই। ডাক্তার গুপ্ত ভাবলেন যে বুড়ো নির্ঘাৎ পটল তুলেছে আর তার মানে তাঁর কপালে এখন অনেক দুঃখ। তাঁর হাড় একদিকে আর মাস একদিকে হল বলে।

পুনরায় কাঁপতে কাঁপতে শেঠ মীরচান্দানীর বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন ডাক্তার গুপ্ত। ঢুকে দেখেন অপূর্ব দৃশ্য। শ্রীমতী মীরচান্দানী পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর হাতে একথালা মিষ্টি আর মুখে একগাল হাসি। বললেন— মুখ মিঠা করো বাচ্চা! তুমি অসাধ্যসাধন করেছ। মুম্বইসুদ্ধু ডাক্তার যা করতে পারল না তুমি তাই করেছ। এত মাস

বাদে আমার স্বামীর এই প্রথম সারাদিনে একবারও জ্বর আসেনি। আজ সকাল থেকে ছেলেমানুষের মতো কেবল খাই-খাই করছেন। অথচ ক-দিন আগেও খাবার দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। চলো, ওঁর সঙ্গে দেখা করবে চলো। উনি তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রুগির ঘরে ঢুকে ডাক্তার গুপ্ত দেখেন শেঠ মীরচান্দানী দিব্যি আসনপিঁড়ি হয়ে খাটের ওপর বসে আছেন। ডাক্তারকে দেখে সহাস্যে বললেন— এসো এসো! দ্যাখো আমি ভালো হয়ে গেছি।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন— আপনার ভালো হতে এখনও অনেক দেরি। অনেক নিয়ম মেনে আপনাকে চলতে হবে, তবেই সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। এজন্য যা যা করতে হবে তা আমি লিখে দিয়ে যাব।

—সে তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। এখন তো তোমাকে একটা ভিজিট দিতে হয়। কত দেব তোমাকে?

—আমার ভিজিট চেম্বারে পনেরো টাকা আর বাড়িতে এলে তিরিশ টাকা। আপনি আমাকে ষাট টাকা দেবেন।

ষাট টাকা শুনে শেঠ মীরচান্দানী অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার গুপ্তের দিকে। তারপর বললেন— ডাক্তার, তুমি শুধু মুম্বই-এর সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসকই নও, সবচেয়ে বড়ো ইমানদার লোকও। তুমি যেখানে ষাট হাজার টাকা চাইলেও তা আমি সানন্দে দিতুম, সেখানে তুমি মাত্র ষাট টাকা চাইছ! শোনো বাচ্চা! তোমাকে আমি ষাট টাকাই দেব, নইলে তুমি হয়তো চটে যাবে। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু দেব। আমার স্ত্রী বললেন, তুমি নাকি সারাদিন চুপটি করে বসে থাক, রুগিটুগি আসে না। আমি তোমাকে সেই রুগি দেবো।

ডাক্তার গুপ্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন— রুগি দেবেন? কী করে?

—দ্যাখো, মুম্বই শহরে আর তার আশেপাশে আমার পাঁচটা ফ্যাক্টরি আছে। এ ছাড়া শহরে অনেকগুলো শোরুম আর গোডাউন আছে। আমাদের পে-রোলেই রয়েছে প্রায় ষোলো হাজার লোক। আমি কালই নোটিশ দিয়ে দিচ্ছি যে এখান থেকে যারই অসুখ করবে তাকে তোমার কাছে আসতে হবে। তোমার সার্টিফিকেট ছাড়া কারুর মেডিক্যাল বিল পাশ হবে না বা ছুটি মঞ্জুর হবে না। তুমি তাদের কাছ থেকে যেরকম উপযুক্ত মনে করবে সেরকম ফি নেবে। আর, আমি বলি কী, ফি-টা একটু বাড়াও। যে ডাক্তার যত বেশি দামি তার কদরও তত বেশি।

ডাক্তার গুপ্ত বললেন— এরপর আমাকে আর কোনোদিন পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বলে আমাকে চোখ টিপে বললেন, বুঝলেন তো, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই কখনো ফেলা যায় না। কখনো না কখনো ঠিক কাজে লেগে যায়।

—